গীতা-প্রবচন

॥ বিনোবা ॥

মূল অনুবাদক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

[সর্বশেষ হিন্দী ও মারাঠী সংস্করণ অনুযায়ী
পরিবর্তন ও পরিমার্জন।]

পরিমার্জনায় : বিধুভূষণ দাসগুপ্ত

॥ সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি ॥
কলিকাতা-৭

প্রকাশক :
সম্পাদক : সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

সংস্করণ :

প্রথম : অক্টোবর, ১৯৫৪—৩,৩০০
দ্বিতীয় : জানুয়ারী, ১৯৫৫—৭,৫০০
তৃতীয় : জুলাই, ১৯৫৬—১০,৫০০
চতুর্থ : ডিসেম্বর, ১৯৬০—৫,৫০০
পঞ্চম : অক্টোবর, ১৯৬১—১০,৫০০
ষষ্ঠ : মে, ১৯৬৩—৫,৫০০
সপ্তম : মে, ১৯৭৮—৫,৫০০

মূল্য—৬·৫০

মুদ্রক :
নীরদ চৌধুরী
জাগরণী প্রেস
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-১২

গীতা প্রবচন
॥ विनोबा ॥
मूल्य—6·50
सर्वोदय प्रकाशन समिति
कलकत्ता-7

প্রস্তাবনা

গীতা-প্রবচনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাল্যকালে বাংলার প্রতি আমার মহা আকর্ষণ ছিল। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ ইহাঁরা ছিলেন আমার পঞ্চদেবতা সদৃশ। বাংলায় একবার যাইব এই সাধও অন্তরে ছিল।

১৯১৬ সালে ঘর ছাড়ি, ব্রহ্মের খোঁজে বাহির হইয়া পড়ি। কাশী যাই। সেখান হইতে হিমালয় যাইব এই ছিল মুখ্য আকাঙ্ক্ষা। বাংলা ঘুরিয়া আসার কথাও মনের গভীরে ছিল। কিন্তু দৈবগতিকে দুইটির একটিও ঘটিল না। গেলাম গান্ধীজীর কাছে। সেখানে দেখিলাম হিমালয়ের শান্তি আর বঙ্গদেশ হইতে উৎসারিত ক্রান্তির সংগম। আর মনে মনে বলিলাম, দুই বাসনাই আমার পূর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মের খোঁজ ত আজও চলিতেছে।

ইতিমধ্যে বাংলার উপর বহু বিপত্তি আসিয়াছে। আর আজও তাহার রেশ চলিতেছে। আমার বিশ্বাস বাংলার লোকমানস যদি বেদান্তের সহিত অহিংসার সমন্বয় সাধন করে তবে এই সব বিপত্তি সম্পদে রূপান্তরিত হইবে। গীতা-প্রবচনের অধ্যয়ন হইতে বাংলা এই পথের কিছুটা সন্ধান পাইবে, বাংলার চিন্তায় আকুল আমার মন একথাই বলে। অতএব, শেষ পর্যন্ত এক প্রকৃষ্টতর সেবার উদ্দেশ্যে বাংলায় যাইতেছি—একথা ভাবিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছি। তখনকার বাসনাবশে যদি যাইতাম তবে কে জানে আমার দ্বারা বাংলার সেবা হইত কি অ-সেবা হইত। কিন্তু আজ এইরূপে কেবল শুদ্ধ সেবাই হইবে।

অধিক আর কি বলিব? লেখা-পড়া-জানা লোকমাত্রই গীতা-প্রবচন পড়িবেন, এই আকাঙ্ক্ষা আমি করি। লেখা-পড়া জানেন না এমন লোকের কানেও গীতা-প্রবচন প্রবেশ করা চাই। এখানে 'আমার' বলিতে কিছু নাই। ভগবানের বস্তু ভগবানকে সমর্পণ করিতেছি।

—বিনোবা

অনুক্রমণিকা

প্রকরণের সংখ্যানুযায়ী বিষয়-ক্রম

'গীতা-প্রবচন' সকল-জনোপযোগী পরমার্থের সহজ-সুগম বিচার। 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন' আরও পরের গ্রন্থ। উহাতে ঐ বিষয়ই এক বিশেষ ভূমিকা হইতে আলোচনা করা হইয়াছে।

"গীতা-প্রবচন" সহজ-প্রবাহে বলা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া আত্মসাৎ করা চাই। ইহার বর্ণনশৈলী লৌকিক, শাস্ত্রীয় নয়। পুনরুক্তিও আছে। গায়ক যেমন নূতন চরণ গাহিতে গাহিতে নিজ প্রিয় ধুয়ায় ফিরিয়া আসে এও তেমনি। ইহা কোনদিন মুদ্রিত হইবে একথা মনেই ছিল না। সানে গুরুজীসদৃশ লং হ্যাণ্ডে শর্টহ্যাণ্ড লিখিতে পটু সহৃদয় অনুলেখক যদি না মিলিত তবে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিত। আর তাহার অধিক আমি আশাও করি নাই। এই প্রবচন হইতে যমুনালালজী লাভবান হন। আমি মনে করি আশাতীত কাজ হইয়াছে। আমি ত নিজের আনন্দেই বলিয়া যাইতাম। তাহা হইতে এত বড় ফল মিলিয়াছে। ইহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, এইরূপই বলা উচিত।

হায়দরাবাদ (দঃ), ১৬-৩-১৯৫১

—বিনোবা

প্রথম অধ্যায়

প্রাস্তাবিক আখ্যায়িকা : অর্জুনের বিষাদ

॥ ১ ॥ মহাভারতের মধ্যভাগে

বন্ধুগণ,

আজ হইতে আমি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার আলোচনা আরম্ভ করিব। গীতা ও আমার সম্বন্ধ তর্কের অতীত। আমার দেহ মার দুধে যতটা বর্ধিত হইয়াছে, আমার হৃদয় ও বুদ্ধি গীতার দুধে তাহা অপেক্ষা অধিক পুষ্ট হইয়াছে। সম্বন্ধ যেখানে হৃদয়ের সেখানে তর্কের অবকাশ থাকে না। সেইজন্য তর্কের মধ্যে না গিয়া শ্রদ্ধা ও আচরণ এই দুই পাখায় ভর করিয়া আমি গীতা-গগনে যথা-শক্তি বিচরণ করিয়া থাকি। অধিকাংশ সময়ই আমি গীতার আবহাওয়ায় থাকি। গীতা আমার প্রাণতত্ত্ব। কাহারও সহিত যখন গীতার আলোচনা করি তখন আমি গীতা-সাগরে সাঁতার কাটি, আর যখন একা থাকি তখন ঐ অমৃতসাগরে গভীর ডুব মারিয়া বসিয়া যাই। স্থির হইয়াছে এই গীতা-মাতার কথা প্রতি রবিবার আপনাদের আমি শুনাইব।

গীতার অবতারণা মহাভারতে করা হইয়াছে। গীতা মহাভারতের মধ্যভাগে থাকিয়া এক উচ্চদীপ-স্তম্ভের মত সমস্ত মহাভারতে আলোকপাত করিতেছে। যেমন একদিকে ছয় পর্ব আর অপর দিকে বার পর্ব, তেমন একদিকে সাত অক্ষৌহিণী আর অপর দিকে এগার অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যভাগে গীতার উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের জাতীয় গ্রন্থ। উহাতে বর্ণিত ব্যক্তি আমাদের জীবনে এক-রূপ হইয়া গিয়াছে। রাম, সীতা, ধর্মরাজ, দ্রৌপদী, ভীষ্ম, হনুমান প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রের দ্বারা সর্ব-ভারতীয় জীবন হাজার হাজার বছর হইতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর অপর কোন মহাকাব্যের পাত্রসমূহ লোকজীবনে এমন বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে এরূপ দেখা যায় না। এই দিক হইতে রামায়ণ ও মহাভারত নিঃসন্দেহে অপূর্ব গ্রন্থ। রামায়ণ যদি মধুর নীতিকাব্য হয় তবে মহাভারত হইতেছে

ব্যাপক সমাজশাস্ত্র। ব্যাসদেব এক লক্ষ সংহিতা লিখিয়া অতি নিপুণভাবে অসংখ্য চিত্র, চরিত্র, চারিত্র্য অঙ্কন করিয়াছেন। এক পরমেশ্বর ব্যতীত পূর্ণ নির্দোষ কেহ নয়, তেমনি কেবল দোষযুক্তও এই পৃথিবীতে কেহ নাই, একথা মহাভারতে অতি স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে। ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের দোষ যেমন দেখানো হইয়াছে, তেমনি কর্ণ-দুর্যোধনের গুণরাজির উপরও আলোকপাত করা হইয়াছে—মানবজীবন সাদা ও কালো তন্তুতে বোনা পট একথাই মহাভারত বলিতেছে। অলিপ্ত থাকিয়া ভগবান ব্যাস জগৎরূপ বিরাট সংসারের আলো-অন্ধকারময় চিত্র দেখাইতেছেন। ব্যাসদেবের এই নিরতিশয় অলিপ্ত উদাত্ত গ্রন্থন-কৌশলহেতু মহাভারত গ্রন্থ যেন এক অতি বৃহৎ স্বর্ণ খনিতে পরিণত হইয়াছে। খুঁজিয়া যত খুশি সোনা আহরণ করা যায়।

ব্যাসদেব এত বড় মহাভারত লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের তরফে কি কিছু বলার ছিল? নিজের কোন বিশেষ-বার্তা তিনি কোথাও দিয়াছেন কি? কোথাও ব্যাসদেব সমাধিস্থ হইয়াছেন কি? মহাভারতে স্থানে স্থানে তত্ত্বজ্ঞান ও উপদেশের বনানী রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল তত্ত্বজ্ঞান, উপদেশ ও গ্রন্থের সারভূত রহস্যও কি তিনি কোথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? হাঁ, নিশ্চয়ই করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারতের নবনীত মন্থন করিয়া ব্যাসদেব ভগবদ্‌গীতায় রাখিয়া দিয়াছেন। গীতা ব্যাসদেবের মুখ্য শিক্ষা ও তাঁহার চিন্তার সার সঞ্চয়। এই পটভূমিকায় 'মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস' এই বিভূতি সার্থক সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে গীতা উপনিষদের মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। গীতা উপনিষদেরও উপনিষদ। সকল উপনিষদ দোহন করিয়া গীতারূপী এই দুগ্ধ ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া পৃথিবীকে দিয়াছেন। জীবন বিকাশের পক্ষে আবশ্যক প্রায় সমস্ত ভাবধারা গীতায় স্থান পাইয়াছে। অতএব গীতাকে সিদ্ধপুরুষেরা যে ধর্মজ্ঞানের অভিধান বলিয়াছেন তাহা ঠিকই হইয়াছে। গীতা আকারে ছোট, তবু গীতা হিন্দুধর্মের মুখ্য গ্রন্থ।

গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাণী একথা সকলেই জানে। এই মহান্ শিক্ষার শ্রোতা ভক্ত অর্জুন। এই শিক্ষায় তিনি এমনই সমরস হইয়াছিলেন যে তিনিও

'কৃষ্ণ' সংজ্ঞা পাইলেন। ভগবান ও ভক্তের হৃদ্‌গত ভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া ব্যাসদেবও এমন একরস হইলেন যে লোকে তাঁহাকেও 'কৃষ্ণ' আখ্যা দিয়াছে। বক্তা কৃষ্ণ, শ্রোতা কৃষ্ণ, রচয়িতা কৃষ্ণ—এইভাবে তিনে মিলিয়া যেন এক অদ্বৈতের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনজনই যেন সমাধিমগ্ন। গীতা অধ্যয়নকারীর মধ্যে এইরূপই একাগ্রতা থাকা চাই।

॥ ২ ॥ পটভূমির সহিত অর্জুনের সম্বন্ধ

কেহ কেহ মনে করেন গীতার আরম্ভ দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে প্রত্যক্ষ উপদেশের আরম্ভ হইয়াছে। অতএব সেখান হইতে আরম্ভ ধরিলে ক্ষতি কি? কোন ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন, "অক্ষরের মধ্যে অ-কারকে ভগবান ঈশ্বরীয় বিভূতি বলেছেন। এদিকে **'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'**-এর আরম্ভে সহজভাবেই অকার এসে গেছে। সুতরাং সেখান থেকেই আরম্ভ ধরা উচিত।" এই যুক্তি ছাড়িয়া দিলেও, এখান হইতে আরম্ভ ধরিয়া লওয়াই অনেক দিক হইতে উচিত মনে হয়। তবুও ইহার পূর্ববর্তী প্রস্তাবনা ভাগের গুরুত্বও কম নয়। অর্জুন কোন্ ভূমিকায় অবস্থিত, কোন্ কথা প্রতিপাদনের জন্য গীতার সৃষ্টি তাহা এই প্রাস্তাবিক কথা-ভাগ ছাড়া ভাল বুঝা যায় না।

কেহ কেহ বলেন যে, অর্জুনের ক্লৈব্য দূর করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য গীতা কথিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে গীতা কেবল কর্ম-যোগের কথাই বলে না, যুদ্ধযোগও প্রতিপাদন করে। কিন্তু একথা যে ভুল একটু বিচার করিলেই তাহা আমাদের কাছে ধরা পড়িবে। আঠার অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। একথা কি বলিতে হইবে যে সমস্ত গীতা শুনাইয়া অর্জুনকে ঐ সেনার যোগ্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল? বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন অর্জুন। সেনাবাহিনী বিভ্রান্ত হয় নাই। তাহারা কি অর্জুন অপেক্ষা অধিক যোগ্য ছিল? একথা কল্পনাতেও স্থান দেওয়া যায় না। অর্জুন যে যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছিলেন তা ভয়ের কারণে নয়। শত শত যুদ্ধের বিজয়ী মহাবীর ছিলেন তিনি। উত্তর গো-গ্রহণের সময়

তিনি একা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সদাবিজয়ী ও সকল মানুষের মধ্যে একমাত্র খাঁটি মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বীরবৃত্তি ছিল তাঁহার প্রতি রোমকূপে। অর্জুনকে উত্তেজিত করার জন্য ক্লৈব্যের আরোপ স্বয়ং কৃষ্ণও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই শর ব্যর্থ হইল বলিয়া অপর বিষয় অবলম্বন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। সুতরাং কেবলমাত্র ক্লৈব্য নিরসনের ন্যায় সহজ উদ্দেশ্য যে গীতার নয়, ইহা সুনিশ্চিত।

অপর কেহ কেহ বলেন যে অর্জুনের অহিংসাবৃত্তি দূর করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য গীতা কথিত হইয়াছিল। আমার মতে একথাও ঠিক নয়। ইহা বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য প্রথমে অর্জুনের পটভূমিকা কি ছিল তাহা আমাদের দেখিতে হইবে। ইহার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংযোগসূত্র হইতে খুব সহায়তা পাওয়া যাইবে।

অর্জুন যে রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা কৃত-নিশ্চয় হইয়া, কর্তব্য ভাব হইতে। ক্ষাত্রবৃত্তি ছিল তাঁহার স্বভাব-ধর্মে। যুদ্ধ এড়াইবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু তবুও তাহা এড়ানো যায় নাই। সর্বনিম্ন দাবির প্রস্তাব ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ব্যক্তির মধ্যস্থতা উভয়ই বিফল হইয়াছিল। এ অবস্থায় দেশ-বিদেশের রাজ-রাজড়াদের একত্র করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে রাজী করাইয়া তিনি রণাঙ্গনে দণ্ডায়মান এবং বীর-বৃত্তির যোগ্য উৎসাহে বলিতেছেন, "উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ সংস্থাপন করুন। যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে তাদের চেহারা তো একবার দেখে নি।" শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন এবং অর্জুন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন। তিনি কি দেখিলেন? উভয় দিকে নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বিরাট সমাবেশ। তিনি দেখিলেন ঠাকুরদা, বাবা, ছেলে, নাতি চারি পুরুষ আত্মীয়-স্বজন মারা কিম্বা মরার অন্তিম প্রতিজ্ঞায় সমবেত হইয়াছে। এরূপ যে হইবে একথা ইহার পূর্বে তিনি অনুমান করেন নাই তাহা নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রভাব কিছুটা পৃথক হইয়া থাকে। ঐ সব স্বজনদের দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তিনি খুব খারাপ বোধ করিতে থাকেন। এ যাবৎ অনেক যুদ্ধে অসংখ্য বীর তিনি

সংহার করিয়াছেন। তখন তাঁহার খারাপ লাগে নাই, তাঁহার হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে নাই, শরীর কাঁপে নাই, চোখে জল আসে নাই। তবে এখন কেন এরূপ হইল? অশোকের মত তাঁহার মনে কি তবে অহিংসা বৃত্তির উদয় হইয়াছিল? না, উহা ছিল কেবল স্বজনাসক্তি। এই সময়ও যদি গুরু বন্ধু-বান্ধব সামনে না থাকিত তবে শত্রুর মুণ্ড তিনি হেলায় পাত করিতেন। কিন্তু আসক্তিজনিত মোহ তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা গ্রাস করিয়াছিল, এবং সেই জন্যই তাঁহার মনে তত্ত্বজ্ঞানের কথা উদয় হইয়াছিল। কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ মোহগ্রস্ত হইলেও খোলাখুলিভাবে কিছুতেই কর্তব্যচ্যুতি সহ্য করিতে পারে না। সে উহাকে কোনও সদ্‌ যুক্তির আবরণে ঢাকে। অর্জুনের তাহাই হইয়াছিল। এখন তিনি মিছামিছি ইহাই প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন যে যুদ্ধই আসলে একটা পাপ। যুদ্ধে কুলক্ষয় হয়, ধর্ম লোপ পায়, স্বৈরাচার দেখা দেয়, ব্যভিচারবাদের প্রসার হয়, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সমাজে নানাবিধ সঙ্কট উপস্থিত হয়। এরূপ বহু যুক্তি দিয়া তিনি কৃষ্ণকে বুঝাইতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আমার মনে পড়িতেছে। এক বিচারপতি ছিলেন। তিনি শত শত অপরাধীকে ফাঁসির সাজা দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন তাহারই ছেলেকে খুনের অভিযোগে তাঁহার সামনে হাজির করা হইল। প্রমাণ হইল সে খুন করিয়াছে। নিজপুত্রকে ফাঁসির সাজা দেওয়ার পালা উপস্থিত হইল। কিন্তু ন্যায়াধীশ তাহা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। তিনি বুদ্ধির কসরৎ আরম্ভ করিলেন, "ফাঁসির সাজা অমানুষিক। এরূপ সাজা দেওয়া মানুষের শোভা পায় না। এতে মানুষের সংশোধনের আশা নষ্ট হয়ে যায়। হত্যাকারী উত্তেজনা-বশে খুন করে ফেলেছে। কিন্তু খুনের নেশা যখন কেটে গেছে তখন তাকে নির্বিকারচিত্তে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে মারা মনুষ্যত্বের দিক থেকে সমাজের পক্ষে বড়ই লজ্জা ও কলঙ্কের কথা," ইত্যাদি যুক্তি এই ন্যায়াধীশ উপস্থিত করিলেন। নিজের পুত্র যদি সামনে না আসিত তবে বিনা দ্বিধায় ন্যায়াধীশ জীবনভর ফাঁসি দিয়া চলিতেন। কিন্তু নিজপুত্রের মমতাবশে ন্যায়াধীশ ঐরূপ বলিতেছিলেন। উহা তাঁহার অন্তরের কথা ছিল না। ছিল আসক্তিজনিত উক্তি। 'এ আমার ছেলে' এই মমতা হইতে এই বাক্যজালের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অর্জুনের দশাও এই ন্যায়াধীশের মত হইয়াছিল। তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ভুল ছিল না। বিগত মহাযুদ্ধের পরিণাম যে ঠিক এইরূপই হইয়াছিল জগৎ তাহা দেখিয়াছে। কিন্তু বিচার্য বিষয় হইল এই যে উহা অর্জুনের জীবন দর্শন ছিল না। উহা ছিল তাহার প্রজ্ঞাবাদ (জ্ঞানের কথা)। কৃষ্ণ সে কথা জানিতেন। তাই তিনি উহার প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত না করিয়া সোজা তাঁহার মোহ-নাশের উপায় দেখিলেন। অর্জুন যদি সত্যই অহিংসাবাদী হইতেন তবে অবান্তর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তাঁহাকে যিনিই যত বলুন না কেন, মূল কথার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার সমাধান হইত না। সমগ্র গীতার কোথাও এই প্রশ্নের উত্তর নাই, অথচ অর্জুনের সমাধান হইয়াছে। এই সকলের ভাবার্থ এই যে অর্জুনের মনে অহিংসাবৃত্তি ছিল না, যুদ্ধেই ছিল তাঁহার প্রবৃত্তি। যুদ্ধ তাঁহার পক্ষে স্বভাব-প্রাপ্ত ও অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। মোহবশে তিনি তাহা এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। আর মুখ্যত এই মোহের উপরেই গীতার গদাঘাত।

॥ ৩ ॥ গীতার প্রয়োজন ঃ স্বধর্মবিরোধী মোহের নিরসন

অর্জুন কেবল অহিংসার কথাই নয়, সন্ন্যাসেরও কথা পর্যন্ত বলিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এই রক্ত-লাঞ্ছিত ক্ষাত্রধর্ম অপেক্ষা সন্ন্যাসই ভাল। কিন্তু উহা কি অর্জুনের স্বধর্ম ছিল? উহা কি তাঁহার বৃত্তি ছিল? সন্ন্যাসের বেশ তিনি সহজেই ধারণ করিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ বৃত্তি আসিত কিরূপে? সন্ন্যাসের নামে তিনি যদি বনে যাইয়া থাকিতেন ত সেখানে তিনি হরিণ মারিতে আরম্ভ করিতেন। তাই ভগবান স্পষ্ট বলিলেন, "অর্জুন, যুদ্ধ করব না, একথা যে বলছ তা তোমার ভুল। এ পর্যন্ত তোমার যে স্বভাব গড়ে উঠেছে তা তোমাকে যুদ্ধ না করিয়ে ছাড়বে না।"

অর্জুনের কাছে স্বধর্ম বিগুণ মনে হইতেছিল। কিন্তু স্বধর্ম যতই বিগুণ হউক না কেন, উহাকে আশ্রয় করিয়াই মানুষের নিজ বিকাশ সাধন করিতে হয়। এখানে আত্মম্ভরিতার কোন অবকাশ নাই। ইহা বিকাশেরই সূত্র। বড়

বলিয়া স্বধর্ম গ্রহণ করা যায় না, আবার ছোট বলিয়া বর্জনও করা যায় না। ইহা বড়ও নয়, ছোটও নয়। ইহা আমাদের পরিমাপের অনুরূপ। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ' এই গীতা-বচনে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীস্টধর্ম ইত্যাদি নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ ধর্ম পৃথক। আমার সামনে এই যে দুইশত লোক রহিয়াছেন তাঁহাদের দুইশত ধর্ম রহিয়াছে। আমার দশ বছর আগে যে ধর্ম ছিল, তাহা আজ নাই। আজিকার ধর্মও দশ বছর পরে থাকিবে না। চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যেমন যেমন বৃত্তি বদলাইতে থাকে, তেমন তেমন পূর্বকার ধর্ম খসিয়া পড়িতে থাকে ও নূতন ধর্ম লাভ হইতে থাকে। জেদ করিয়া কোন কিছুই করা ঠিক নয়।

অপরের ধর্ম যদি শ্রেষ্ঠও মনে হয়, উহা গ্রহণে আমার কল্যাণ নাই। সূর্যের আলো আমার প্রিয়। ঐ আলোর দ্বারা আমি বৃদ্ধিলাভ করিতেছি; সূর্য আমার বন্দনীয়ও বটে। কিন্তু সেই হেতু যদি ভূতলে না থাকিয়া আমি তাহার কাছে যাইতে চাই তবে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইব। উপরন্তু পৃথিবীতে থাকা যদি বিগুণও হয়, সূর্যের তুলনায় পৃথিবী যদি একান্ত তুচ্ছও হয়, যদি তার নিজের কোন আলো নাও থাকে, তবুও যতদিন সূর্যের তেজ সহ্য করার শক্তি আমাতে না জন্মে ততদিন সূর্য হইতে দূরে পৃথিবীতে থাকিয়াই আমাকে আমার নিজ বিকাশ করিয়া লইতে হইবে। মাছকে যদি কেউ বলে, "জল থেকে দুধ দামী, চল দুধে থাকবে।" মাছ তাহাতে রাজী হইবে কি? মাছ জলেই বাঁচিতে পারে, দুধে মরিয়া যইবে।

অপরের ধর্ম সহজ মনে হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে নাই। অনেক স্থলে ঐ সুলভতা ধোঁকা মাত্র। সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদিকে ঠিক ভাবে প্রতিপালন করিতে না পারিয়া কেহ যদি অতিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত তাহা ভড়ং হইবে, বোঝাস্বরূপ হইবে। সুযোগ পাইলেই তাহার বাসনাসমূহ প্রবল হইয়া উঠিবে। সংসারের বোঝা বহন করিতে অশক্ত বলিয়া যে বনে যায় সে প্রথমে কুটীর বাঁধিবে। পরে উহার রক্ষার জন্য বেড়া দিবে। অবস্থা হইবে এই যে, এইরূপ করিতে করিতে সেখানেও সে পরিপূর্ণ সংসার খাড়া করিয়া ফেলিবে। বৈরাগ্যবৃত্তির উদয় হইলে সন্ন্যাসে কঠিনতা কোথায়? সন্ন্যাস সহজ একথা বলার মত স্মৃতি-বচন

ত রহিয়াছেই। কিন্তু আসল কথা হইতেছে বৃত্তি। যাহার যেরূপ বৃত্তি বস্তুতপক্ষে তাহার ধর্মও তদ্রূপ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, সরল-কঠিন—প্রশ্ন ইহা নয়, হওয়া চাই খাঁটি বিকাশ, সত্যিকারের পরিবর্তন।

কিন্তু কিছু ভাবুক লোক বলিয়া থাকে, "যুদ্ধধর্ম হতে সন্ন্যাস যদি সব সময়েই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ হয় তবে ভগবান অর্জুনকে খাঁটি সন্ন্যাসী বানালেন না কেন? তাঁর পক্ষে কি তা অসম্ভব ছিল?" তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অর্জুনের পুরুষার্থ থাকিত কি? পরমেশ্বর স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেকে নিজের জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে। ইহার মধ্যেই মাধুর্য। শিশু নিজ হাতে ছবি আঁকিতে আনন্দ পায়। কেহ তাহাকে হাত ধরিয়া আঁকায় তাহা তাহার ভাল লাগে না। ছাত্রের অঙ্ক যদি শিক্ষক বরাবর কষিয়া দেন, তবে বুদ্ধির বিকাশ হইবে কি ভাবে? মা-বাবা ও গুরুর কাজ হইতেছে কেবল পথ দেখানো। পরমেশ্বর ভিতর হইতে আমাদের বোধ দিয়া থাকেন। তার বেশী তিনি কিছুই করেন না। কুমারের মত ঠুকিয়া-পিটিয়া অথবা থাবড়াইয়া যদি প্রত্যেকের হাঁড়ি গড়েন তবে তাহার মূল্য কি? আর আমরা ত মাটির হাঁড়ি নই। আমরা চিন্ময়।

এই সব বিশ্লেষণ হইতে একথা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া থাকিবে যে স্বধর্মের অন্তরায়-রূপ মোহের নিরাকরণের জন্যই গীতার জন্ম। অর্জুন ধর্ম-সংমূঢ় হইয়াছিলেন। স্বধর্মের বিষয়ে তাঁহার মনে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে উহা দেখাইয়া দেওয়ার পর অর্জুন নিজেই তাহা স্বীকার করেন। ঐ মোহ, ঐ মমত্ব, ঐ আসক্তি দূর করাই গীতার মুখ্য কাজ। আদ্যন্ত গীতা শোনানোর পরে ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অর্জুন, তোমার মোহ দূর হল?" আর অর্জুন বলিতেছেন, "হ্যাঁ ভগবান, মোহ দূর হয়েছে। আমার মধ্যে স্বধর্মের বোধ হয়েছে"। এইভাবে গীতার উপক্রম ও উপসংহার মিলাইয়া দেখিলে মোহ নিরসনই যে গীতার উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কেবল গীতারই নয় সারা মহাভারতেরও ইহাই উদ্দেশ্য। মহাভারতের প্রারম্ভেই ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, লোকহৃদয়ের মোহাবরণ দূর করার নিমিত্তই আমি এই ইতিহাস-প্রদীপ জ্বালাইতেছি।

॥ ৪ ॥ ঋজু-বুদ্ধির অধিকারী

পরবর্তী সমগ্র গীতা বোঝার পক্ষে অর্জুনের এই পটভূমিকা আমাদের খুব কাজে আসিবে। তজ্জন্য আমরা ইহার নিকট ঋণী। তাহা ছাড়াও আর এক উপকার ইহা করিয়াছে। অর্জুনের এই ভূমিকা হইতে তাঁহার মনের একান্ত ঋজুতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অর্জুন' শব্দের অর্থই 'ঋজু' কিংবা 'সরল স্বভাবের'। তাঁহার মনে যে সব বিকার অথবা বিচার উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিনি খোলামনে ভগবানের কাছে ধরিয়াছিলেন। তিনি কিছুই গোপন করেন নাই; আর শেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি পূর্ব হইতেই কৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। কৃষ্ণকে সারথি করিয়া যখন তিনি নিজ ঘোড়ার লাগাম তাঁহার হাতে দিয়াছিলেন, তখনই তিনি নিজ মনোবৃত্তিরও লাগাম তাঁহার হাতে সমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আসুন আমরাও তাহাই করি। অর্জুনের নিকট কৃষ্ণ ছিলেন। কৃষ্ণকে আমরা কোথায় পাইব?—একথা যেন আমরা না বলি। কৃষ্ণ নামধারী কোন ব্যক্তি আছেন, এইরূপ ঐতিহাসিক বা ব্যর্থ তর্কে যেন আমরা না পড়ি। অন্তর্যামীরূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে কৃষ্ণ বিরাজমান। তিনি নিকট হইতেও নিকটতম। আসুন, আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ছল-চাতুরী তাঁহার সামনে ধরি, আর তাঁহাকে বলি, "ভগবান, আমি তোমার শরণ নিলাম। তুমি আমার অনন্য গুরু, তুমি আমাকে উপযুক্ত পথ দেখাও। যে পথ তুমি দেখাবে সে পথেই আমি চলব।" এইরূপ করিলে সেই পার্থসারথি আমাদেরও সারথ্য করিবেন। নিজ শ্রীমুখে তিনি আমাদের গীতা শুনাইবেন আর আমাদের বিজয় লাভ করাইবেন।

রবিবার, ২১ ২-১৯৩২

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

অল্প কথায় সব উপদেশ : আত্মজ্ঞান ও সমত্ববুদ্ধি

॥ ৫ ॥ গীতার পরিভাষা

বন্ধুগণ,

প্রথম অধ্যায়ে আমরা অর্জুনের বিষাদ-যোগ দেখিয়াছি। যখন অর্জুনের মত ঋজুতা ও হরিশরণতা আসে তখন বিষাদও যোগে পরিণত হয়। ইহাকে হৃদয়-মন্থন বলে। সঙ্কলকার গীতার ভূমিকাকে অর্জুন-বিষাদ-যোগ রূপ বিশেষ নাম দিয়াছেন। আমি উহাকে বিষাদ-যোগ রূপ সাধারণ নাম দিতেছি। কারণ গীতার পক্ষে অর্জুন এক নিমিত্ত মাত্র। পন্ঢরপুরের পাণ্ডুরঙ্গ* কেবল পুণ্ডলীকের জন্য অবতার হন নাই। তিনি ছিলেন নিমিত্ত মাত্র। আমাদের মত জড়জীবের উদ্ধারের জন্য হাজারেরও বেশী বৎসর ধরিয়া তিনি দণ্ডায়মান আছেন। সেইরূপ গীতার কৃপা অর্জুনের নিমিত্ত হইলেও তাহা আমাদের সকলের জন্যও বটে। তাই গীতার প্রথম অধ্যায়কে বিষাদ-যোগ এই সাধারণ নাম দেওয়াই শোভন হইবে। এই গীতাবৃক্ষ এখান হইতে বাড়িতে বাড়িতে শেষ অধ্যায়ে 'প্রসাদযোগ'রূপ ফল ধারণ করিবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইলে এই কারাবাসকালে আমরাও সেই পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইব।

---

*পাণ্ডুরঙ্গ দক্ষিণ ভারতে অবতাররূপে পূজিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অবতীর্ণ বলিয়া কথিত। পাণ্ডুরঙ্গের উপর শংকরাচার্যের একটি স্তব আছে। পাণ্ডুরঙ্গ বিঠ্ঠল বা বিঠোবা নামেও পরিচিত। পন্ঢরপুর বা পুণ্ডরিকপুর বোম্বাই রাজ্যের একটি জেলা। পাণ্ডুরঙ্গের মন্দির ভীমা নদীর উপর অবস্থিত। মাতাপিতার সেবায় রত পুণ্ডলীক বিঠ্ঠলকে দাঁড়াইয়া থাকার জন্য ইট (মারাঠী—বীট্) আগাইয়া দিয়াছিলেন। আজও তিনি সেই ইটের উপর দণ্ডায়মান।

গীতার শিক্ষার শুরু দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে। আর আরম্ভেই ভগবান জীবনের মহাসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। এর তাৎপর্য এই যে, যে সব মুখ্য তত্ত্বের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে, আরম্ভেই যদি তাহা অন্তরে গাঁথিয়া যায় তবে পরবর্তী পথ সুগম হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের "সাংখ্যবুদ্ধি" শব্দের অর্থ আমার মতে জীবনের মূলীভূত সিদ্ধান্ত। এই সকল মূল সিদ্ধান্ত এখন আমাদের বিচার করিতে হইবে। তাহার পূর্বে এই সাংখ্য শব্দের প্রসঙ্গে গীতার পারিভাষিক শব্দের অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া ভাল।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় শব্দসমূহকে গীতা নূতন অর্থে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। পুরাতন শব্দসমূহে নূতন অর্থের কলম বসানো বিচার-ক্রান্তির অহিংস প্রক্রিয়া। ব্যাসদেব এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত। তাই গীতার শব্দসমূহে ব্যাপক অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহা চিরসতেজ রহিয়া গিয়াছে। এবং সেইজন্য চিন্তনশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রয়োজন ও উপলব্ধি অনুসারে সে সবের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। নিজ নিজ দৃষ্টি হইতে ঐ সকল অর্থই ঠিক হইতে পারে। আর আমি মনে করি, উহাদের সহিত বিরোধের কথা না ভাবিয়া স্বতন্ত্র অর্থও আমরা করিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে উপনিষদে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক সময়ে দেব, দানব ও মানব এই তিন দল উপদেশের জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গিয়াছিল। প্রজাপতি সকলকে 'দ' অক্ষরটি দেন। দেবেরা বলিল, "দেবতা আমরা কামী, বিষয়-ভোগে আমাদের আসক্তি জন্মেছে। তাই ব্রহ্মা 'দ' অক্ষর দ্বারা দমন করার শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন।" দানবেরা বলিল, "আমরা দানবেরা বড় ক্রোধী ও দয়াহীন হয়ে গেছি। 'দ' অক্ষর দ্বারা 'দয়া কর' এই শিক্ষা প্রজাপতি আমাদের দিয়েছেন।" মানবেরা বলিল, "মানব আমরা লোভী, সঞ্চয়ের জন্য পাগল হয়েছি। 'দ' অক্ষর দ্বারা 'দান কর' এই শিক্ষা প্রজাপতি আমাদের দিয়েছেন।" প্রজাপতি বলিলেন, সকলের অর্থই ঠিক। কারণ সকলেই আপন আপন অনুভূতি হইতে নিজেদের অর্থ পাইয়াছে। গীতার পরিভাষার অর্থ করার সময় উপনিষদের এই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

॥ ৬ ॥ জীবন-সিদ্ধান্ত—(১) দেহদ্বারা স্বধর্মাচরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবনের এই তিন মহাসিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে—(১) আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতা, (২) দেহের ক্ষুদ্রতা, এবং (৩) স্বধর্মের অবাধ্যতা*। উহার মধ্যে স্বধর্মের সিদ্ধান্ত কর্তব্যনির্দেশ এবং অপর দুইটি জানার বিষয়। পূর্ব অধ্যায়ে স্বধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। প্রাকৃতিক নিয়মে এই স্বধর্ম আমরা পাইয়া থাকি। স্বধর্ম খুঁজিয়া লইতে হয় না। এরূপ নয় যে হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িয়া আমরা ভূতলে অবস্থান করিতেছি। আমাদের জন্ম হইবার পূর্বেও এই সমাজ ছিল, মাতা-পিতা ছিলেন, পাড়া-প্রতিবেশী ছিলেন। এইরূপ এক প্রবাহে আমাদের জন্ম। যে মা-বাবার ঘরে আমাদের জন্ম তাঁহাদের সেবা করার ধর্ম জন্ম-সূত্রেই আমরা পাইয়া থাকি। আর যে সমাজে জন্মিয়াছি তার সেবা করার ধর্মও ঐভাবেই আমাদের কাছে আসিয়া গিয়াছে। সত্যি কথা এই যে আমাদের জন্মের সঙ্গেই আমাদের স্বধর্মেরও জন্ম হইয়া থাকে। উপরন্তু ইহাও বলা যাইতে পারে যে, আমাদের জন্মের পূর্ব হইতেই উহা আমাদের জন্য স্থির হইয়া থাকে। কারণ উহাই আমাদের জন্মের হেতু। উহা সম্পন্ন করার জন্যই আমাদের জন্ম। পত্নীর সহিত স্বধর্মের তুলনা করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, পত্নীর সম্বন্ধ যেমন অচ্ছেদ্য স্বধর্মও তেমনি অচ্ছেদ্য। এই উপমাও আমার কাছে গৌণ মনে হয়। আমি স্বধর্মের তুলনা করি মায়ের সহিত। আমার মা কে হইবেন সে নির্বাচন আমার অপেক্ষায় ছিল না। আগে হইতেই তাহা নির্দিষ্ট ছিল। তিনি যেমনই হউন না কেন তাহা এখন আমার বদলাইবার উপায় নাই; স্বধর্ম সম্বন্ধেও সেই কথা। স্বধর্ম ছাড়া এ জগতে অন্য কোন আশ্রয় আমাদের নাই। স্বধর্মকে অস্বীকার করা 'স্ব'-কে অস্বীকার করার মতই আত্মঘাতী। স্বধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়াই আমরা অগ্রসর হইতে পারি। অতএব এই স্বধর্মের আশ্রয় কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ইহা জীবনের একটি মূল সিদ্ধান্ত।

---

*অবাধ্যতা = অনিবার্যতা

স্বধর্ম আমাদের নিকট এতই সহজপ্রাপ্ত যে উহার আচরণ অনায়াসসাধ্য হওয়া চাই। কিন্তু নানা প্রকারের মোহের দরুন তাহা হয় না, অথবা অতি কষ্টে হইলেও তাহাতে নানারূপ দোষ মিশিয়া যায়। স্বধর্মের পথে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মোহের বাহ্যরূপ অনেক। উহার সীমাসংখ্যা নাই। কিন্তু তবুও বিচার-বিশ্লেষণ করিলে ঐ সকলের মূলে একটিই বস্তু দেখা যায়—তাহা হইতেছে সঙ্কীর্ণ ও অসার দেহবুদ্ধি। আমি ও আমার শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি ও বস্তু, বস্, এই পর্যন্তই আমার ব্যাপ্তি, প্রসারের সীমা। যাহারা এই গণ্ডির বাহিরে তাহারা সকলে আমার পর, অথবা শত্রু। ভেদের এই প্রাচীর দেহ-বুদ্ধি খাড়া করিয়া দেয়। আর মজার ব্যাপার এই 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া যাহাদের গণ্য করা হয় এই বুদ্ধি তাহাদের শরীরটাই কেবল দেখে। দেহ-বুদ্ধির এই দ্বিবিধ প্যাঁচে পড়িয়া আমরা নানারকমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা বা বেষ্টনীর সৃষ্টি করিতে থাকি। প্রায় সকলের সম্বন্ধেই একথা খাটে। কাহারও ডোবা ছোট, কাহারও বা বড়, এই মাত্র তফাৎ। কিন্তু আসলে তাহা ডোবা-ই—গণ্ডি। উহার গভীরতা এই শরীরের চামড়ার গভীরতারই সমান। কেহ সৃষ্টি করে আত্মীয়স্বজনের গণ্ডি, কেহ বা দেশাভিমানের। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণেতর নামক এক ডোবা বা গণ্ডি, মুসলমান-অমুসলমান নামক আর এক ডোবা বা গণ্ডি, এরূপ দুই-একটি নহে অসংখ্য ডোবা—গণ্ডি রহিয়াছে। যেদিকে তাকান ডোবা আর ডোবা! আমাদের এই জেলেও রাজনৈতিক কয়েদী ও অন্যবিধ কয়েদী—এইরূপ গণ্ডি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া যেন আমাদের জীবন চলেই না। কিন্তু ইহার পরিণাম কি? পরিণাম একই। হীন বিকারের জীবাণুর বৃদ্ধি আর স্বধর্মরূপী স্বাস্থ্যের নাশ।

॥ ৭ ॥ জীবন-সিদ্ধান্ত—(২) দেহাতীত আত্মার জ্ঞান

এই অবস্থায় কেবল স্বধর্মনিষ্ঠা পর্যাপ্ত নহে। তাহার জন্য অপর দুইটি সিদ্ধান্ত জাগ্রত রাখা চাই। এক—আমি এই মরণশীল দেহ নই, দেহ উপরের তুচ্ছ খোসামাত্র। দুই—আমি মৃত্যুহীন অখণ্ড ব্যাপক আত্মা। এই দুইয়ে মিলিয়া পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের সৃষ্টি হয়।

এই তত্ত্বজ্ঞান গীতার দৃষ্টিতে এতই আবশ্যক মনে হইয়াছে যে, গীতা উহার আবাহন করিয়াছে প্রথমে, আর স্বধর্মের অবতারণা করিয়াছে পরে। কেহ কেহ বলেন, "প্রারম্ভেই এই সব তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক শ্লোকের অবতারণা কেন ?" কিন্তু আমি মনে করি, গীতায় যদি এমন কোন শ্লোক থাকে যাহা মোটেই স্থানান্তরিত করা যায় না তবে তাহা হইতেছে এই শ্লোক কয়টি।

এতটা তত্ত্বজ্ঞান মনে অঙ্কিত হইয়া গেলে স্বধর্ম আদৌ কঠিন মনে হইবে না। তাহাই নহে, স্বধর্মের বাহিরে অন্য কিছু করাই কঠিন মনে হইবে। আত্মার অখণ্ডতা ও দেহের ক্ষুদ্রতার কথা বোঝা কঠিন নহে। কারণ এ দুইটি সত্য বস্তু। কিন্তু তবুও উহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। উহা মনের মধ্যে বার বার মন্থন করিতে হইবে। এই চর্মের গুরুত্ব কমাইয়া আমাদের আত্মার গুরুত্ব দেওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

পলে পলে এই দেহ বদলাইতেছে। বাল্যকাল, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা —এই চক্রের অভিজ্ঞতা কাহার না আছে ? আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে সাত বৎসরে শরীর একেবারে বদলাইয়া যায়, পুরাতন রক্তের একবিন্দুও আর অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের পূর্বজগণ মনে করিতেন যে বার বৎসরে পুরাতন শরীর মরিয়া যায়। তাই প্রায়শ্চিত্তের, তপশ্চর্যার, অধ্যয়ন আদির অবধি বার-বার বৎসরের ছিল। বহু বৎসরের ছাড়াছাড়ির পর ছেলের সহিত মায়ের মিলন হইয়াছে ; মা ছেলেকে চিনিতে পারেন নাই এরূপ গল্প আমরা শুনিতে পাই। যে দেহ এইভাবে প্রতিক্ষণ বদলাইতেছে, প্রতিক্ষণ মরিতেছে, তাহাই কি তোমার স্বরূপ ? দিন-রাত যেখানে মলমূত্রের নালা বহিয়া চলিয়াছে, আর তোমার মত সমর্থ সেবক তাহা ধৌত করিতে থাকা সত্ত্বেও যাহার অপরিচ্ছন্নতার ব্রত ভঙ্গ হয় না, তুমি কি তাই ? সে অপরিচ্ছন্ন, তুমি তাহার পরিচ্ছন্নতা-বিধানকারী ; সে রোগী, তুমি তাহার শুশ্রূষাকারী ; সে সাড়ে তিন হাত পরিমিত, তুমি ত্রিভুবন-বিহারী, সে নিত্যপরিবর্তনশীল, তুমি তাহার পরিবর্তনের সাক্ষী, সে মরণশীল, আর তুমি তাহার মৃত্যুর ব্যবস্থাকারী। তোমার ও তাহার পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তুমি এমন ছোট হইয়া কিরূপে থাক ? দেহ বলে—দেহের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ তাহারাই আমার

আর এই দেহের মৃত্যুতে এত শোকই বা কেন করা? ভগবান জিজ্ঞাসা করেন, "আরে, দেহের নাশ কি একটা শোকের ব্যাপার?"

দেহ ত কাপড়ের মত। পুরাতন ছিঁড়িয়া যায়, তাই নূতন ধারণ করিতে হয়। যদি একই শরীর আত্মাকে সর্বদার জন্য আঁকড়াইয়া থাকিত তবে আত্মার অধোগতি হইত। সমস্ত বিকাশ বন্ধ হইয়া যাইত। আনন্দ অদৃশ্য হইত, আর জ্ঞানপ্রভা ম্লান হইয়া যাইত। অতএব দেহের বিনাশ শোকের বিষয় নয়। হাঁ, যদি আত্মার বিনাশ হইত তবে তাহা অবশ্যই শোকের কারণ হইত, কিন্তু আত্মা ত অবিনাশী—যেন অখণ্ড প্রবাহিত ঝরনা। অনেক কলেবর উহাতে আসে এবং যায়। সুতরাং দেহ-সম্বন্ধের পাকে পড়িয়া শোক করা এবং ইহা আমার, উহা অন্যের, এইরূপ ভেদবিভেদ করা একান্তই অনুচিত। মনে কর, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যেন সুন্দর বোনা একখানি চাদর। ছোট শিশু হাতে কাঁচি লইয়া যেমন চাদর টুকরা করিয়া ফেলে, তেমনি এই দেহরূপ কাঁচি দ্বারা যদি এই বিশ্বাত্মাকে টুকরা করা হয় ত তাহা কতই না ছেলেমানুষি হইবে—কতই না হিংসা হইবে!

যে ভারতভূমিতে ব্রহ্মবিদ্যার জন্ম হইয়াছে সেখানে এরূপ অগণিত ছোট-বড় দল, সম্প্রদায় ও জাতি দেখা যায় ইহা সত্যসত্যই নিতান্ত দুঃখের কথা। আর তা ছাড়া আমাদের মনে মৃত্যুভয় এমন ভাবে বাসা বাঁধিয়াছে যে, তাহা আর কোথাও বড় দেখা যায় না। ইহা দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই যে আবার পরাধীনতার অন্যতম কারণ তাহাও ভুলিলে চলিবে না।

'মৃত্যু' শব্দটাই আমাদের কাছে অসহ্য। মৃত্যুর কথাই অমঙ্গলজনক মনে হয়। বড় দুঃখে জ্ঞানদেব বলিয়াছেন:

অগা মর হা বোল ন সাহবী।
আণি মেলিয়া ভরী রডতী॥

কেহ মরিলে বাড়ীতে কান্নার মহা রোল পড়িয়া যায়। তাহা যেন এক কর্তব্য! ব্যাপার এতটা গড়াইয়াছে যে কাঁদার জন্য লোক ভাড়া করার কথা পর্যন্ত শুনা যায়। মৃত্যু আসন্ন। তবু রোগীকে সে কথা বলা হয় না। রোগী বাঁচিবে না, একথা ডাক্তার ঘোষণা করিলেও মিথ্যা আশ্বাস

দেওয়া হয়। ডাক্তার নিজেও স্পষ্ট করিয়া বলে না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুখে ঔষধ ঢালিতে থাকে। তার পরিবর্তে যদি সত্য কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া ঈশ্বর-স্মরণের দিকে তাহার মন ঘোরানো যায় তবে কতই না ভাল হয়! কিন্তু লোকের ভয় ঐ ধাক্কায় ভাণ্ড যদি আগেই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কি এই ভাণ্ড ভাঙিতে পারে? আর যে ভাণ্ড দুই ঘণ্টা পরে ভাঙিবেই তাহা যদি কিছুক্ষণ পূর্বে ভাঙ্গিয়া যায় ত তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? ইহার অর্থ এই নয় যে আমরা কঠোর ও প্রেমহীন হইয়া যাইব। দেহাসক্তি প্রেম নয় বরং দেহাসক্তি দূর না হইলে যথার্থ প্রেমের উদয় হয় না।

দেহাসক্তি চলিয়া গেলে দেহ সেবার সাধন মনে হইবে আর তখন দেহ তাহার যোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। কিন্তু আজ ত দেহ-পূজাকেই আমরা সাধ্য মনে করিতেছি। স্বধর্মাচরণ যে সাধ্য সেকথা ভুলিয়াই গিয়াছি। স্বধর্মাচরণের জন্যই দেহ ধারণ করা, উহাকে পান-আহার দেওয়া। কেবল রসনাতৃপ্তির জন্য উহার দরকার নাই। চামচ দিয়া হালুয়া পরিবেশন কর বা ডাল-ভাত, তাহাতে চামচের কোন সুখ-দুঃখ নাই। জিহ্বার অবস্থাও তেমনি হওয়া চাই—রসবোধ থাকিবে, সুখ-দুঃখ নয়। শরীরের খাজনা শরীরকে মিটাইয়া দেওয়া হইল। ইহাই পর্যাপ্ত। সুতাকাটার জন্য চরখায় তেল দিতে হয়। তেমনি শরীর হইতে কাজ আদায় করিতে হয় বলিয়া তাহাতে কয়লা দিতে হয়। এই ভাবে যদি আমরা দেহের ব্যবহার করি তবে মূলত ক্ষুদ্র হইলেও উহার মূল্য বাড়িয়া যাইতে পারে এবং উহার প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে পারে।

কিন্তু আমরা দেহকে সাধনরূপে ব্যবহার না করিয়া দেহের মধ্যে ডুবিয়া থাকি। আত্মাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি। তাহার ফলে, মূলেই যে দেহ নগণ্য তাহা আরও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। তাই সাধুপুরুষেরা দৃঢ়ভাবে বলেন, “দেহ আণি দেহসম্বন্ধেঁ নিন্দাবীঁ। ইতরেঁ বন্দাবীঁ শ্বান-স্কুরেঁ।” —ওরে, দেহের ও দেহের সহিত যাহার সম্বন্ধ, দিনরাত তাহার পূজা তুই করিস না। অপরকে চিনিতে শেখ। এইভাবে সাধুপুরুষেরা আমাদিগকে

আত্মপ্রসারের শিক্ষা দিয়া থাকেন। আপন আত্ম-ইষ্ট-মিত্র ব্যতীত অপরের কাছে নিজ আত্মা এতটুকুও আমরা লইয়া যাই কি? "জীবে জীবের সমাবেশ, আত্মায় আত্মার মিলন" এইরূপ আমরা করি কি? নিজ আত্ম-হংসকে এই পিঞ্জরের বাহিরে হাওয়া খাওয়াই কি? যাকে নিজ গণ্ডি বলিয়া জানি সেই গণ্ডি ভেদ করিয়া আগামী কাল নূতন দশজন বন্ধু বানাইব একথা কখনও মনে হয় কি? আজ পনর, কাল পঞ্চাশ হইবে? আর এভাবে বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত বিশ্বই আমার ও আমি সমস্ত বিশ্বের এই অনুভব করিতে থাকিব, এরূপ মনে হয় কি? জেল হইতে আমরা আত্মীয়স্বজনকে পত্র দিই, ইহাতে বিশ্বেবত্ব কোথায়? জেল হইতে বাহির হইয়া কোন নূতন বন্ধুকে—রাজনৈতিক কয়েদী নহে—চোর কয়েদী-বন্ধুকে পত্র লিখিবেন কি?

আমাদের আত্মা ব্যাপক হওয়ার জন্য ছটফট করে। সমস্ত জগতকে সে কোল দিতে চায়, কিন্তু আমরা তাহাকে কামরায় বদ্ধ করিয়া রাখি। আত্মাকে আমরা কয়েদী বানাইয়া রাখিয়াছি। আত্মার কথা মনেও হয় না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেহের সেবাতেই আমরা মত্ত থাকি। এই দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইল কি দুর্বল হইল ইহাই অনুক্ষণের চিন্তা। সংসারে যেন আর কোন আনন্দই নাই। ভোগের ও স্বাদের আনন্দ তো পশুরাও উপভোগ করিয়া থাকে। এখন ত্যাগ ও স্বাদভঙ্গের আনন্দের খোঁজ করিবে কি করিবে না? নিজে ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও পরিবেশিত ভাতের থালা আর কোন ক্ষুধাতুরকে দেওয়ার আনন্দ যে কি তাহা অনুভব কর! সেই স্বাদ একবার চাখিয়া দেখ। মা যখন ছেলের জন্য কষ্টভোগ করেন তখন তিনি এই সুখের কিছু আস্বাদ পান। মানুষ নিজের বলিয়া যে সংকীর্ণ গণ্ডি সৃষ্টি করে, অগোচরে সেখানেও আত্মবিকাশের মাধুর্য আস্বাদের বাসনা তাহার থাকে; কারণ তখন দেহবদ্ধ আত্মা ক্ষণিকের জন্য হইলেও গণ্ডির বাহিরে আসে, কিন্তু এই বাহিরে আসার স্বরূপ কী? কারাপ্রাচীরের মধ্যে কয়েদী যেমন কাজের বাহানায় কামরার বাহিরে ঘেরা জায়গায় আসে তেমন। কিন্তু আত্মার কাজ এতটুকুতে চলে না। আত্মার চাই মুক্তানন্দ।

সারাংশ, (১) অধর্ম পরধর্মের বাঁকা রাস্তা ছাড়িয়া সাধকের সহজ সরল রাস্তা ধরা চাই। স্বধর্মের আঁচল কখনও ছাড়িতে নাই। (২) দেহ ক্ষণভঙ্গুর একথা উপলব্ধি করিয়া স্বধর্ম পালনের জন্য উহার ব্যবহার করা চাই, আর প্রয়োজন হইলে স্বধর্মের জন্যই উহার শেষ করা চাই। (৩) আত্মার অখণ্ডতা ও ব্যাপকতার বোধ সর্বদা জাগ্রত রাখিয়া মন হইতে আত্ম-পর ভেদভাব দূর করা চাই। জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত ভগবান আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। **নরদেহাচেনি সাধনেঁ, সচ্চিদানন্দ পদবী ঘেণেঁ**—যে মানুষ এইরূপ আচরণ করিবে, সে একদিন-না একদিন নিঃসন্দেহে এই নরদেহরূপ সাধন দ্বারা সচ্চিদানন্দপদ লাভ করিবে।

॥ ৮ ॥ দুইয়ের যোগসাধনের উপায়ঃ ফলত্যাগ

ভগবান জীবনের সিদ্ধান্তসমূহের নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কেবল সিদ্ধান্ত নির্দেশ করিলে কাজ পূর্ণ হয় না। গীতায় বর্ণিত এই সব সিদ্ধান্ত ত উপনিষদ ও স্মৃতিসমূহে পূর্ব হইতেই ছিল। গীতা সেই সব পুনরায় উপস্থিত করিয়াছে,—এখানে গীতার অপূর্বতা নহে। গীতার অপূর্বতা সকল সিদ্ধান্ত কি ভাবে আচরণ করা যায় তাহার মধ্যে। এই মহাপ্রশ্নের সমাধানের মধ্যেই গীতার নৈপুণ্য।

জীবনের সিদ্ধান্তসমূহকে আচরণ করার কলা বা উপায়কে 'যোগ' বলে। সাংখ্যের অর্থ 'সিদ্ধান্ত' বা 'শাস্ত্র'। আর 'যোগ' মানে ব্যবহারে আনার কৌশল বা কলা। তাই ত জ্ঞানদেব সাক্ষ্য দিতেছেন। **যোগিয়াঁ সাধলী জীবন-কলা**। যোগীদের জীবনে জীবন-কলা মূর্তিমান হইয়াছে। গীতা সাংখ্য ও যোগ, শাস্ত্র ও কলা এই দুইয়ে পরিপূর্ণ। শাস্ত্র ও কলার মিলনে জীবন-সৌন্দর্য বিকশিত হয়। নিছক শাস্ত্র হাওয়ায় ভাসে। সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞান থাকিতে পারে কিন্তু কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত ব্যক্ত করার কলা যদি না সাধিয়া থাক ত নাদব্রহ্ম ঝংকৃত হইবে না। তাই ভগবান সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যবহার করার কৌশলও দেখাইয়াছেন। ভাল, সে কৌশল কিরূপ? দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আত্মার অমরত্ব ও অখণ্ডতার উপর নজর রাখিয়া স্বধর্মাচরণের ঐ কলা কি প্রকার?

লোকে দ্বিবিধ ভাবনা হইতে কর্ম করে। এক—আপন কর্মের ফল আমি অবশ্য ভোগ করিব। ইহাতে আমার অধিকার। ইহার বিপরীত আর এক ভাব এই, ফল ভোগ করিতেই যদি না পাইলাম তবে কর্ম করিতে যাইব কেন ? গীতা এই দুইটি ছাড়া তৃতীয় এক ভাব বা বৃত্তির কথা বলিয়াছে। গীতা বলে, কর্ম অবশ্যই করিবে, কিন্তু ফলে তোমার অধিকার একথা মনে করিও না। যে কর্ম করে ফলে অবশ্যই তাহার অধিকার আছে ; কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় সেই অধিকার ছাড়িয়া দাও। রজোগুণ বলে, "নিতে হয় ত ফল-সমেত নেব।'' আর তমোগুণ বলে, "ছাড়তে হয় ত কর্ম-সমেত ছাড়ব।" এই দুইটি একে অন্যের সহোদর। এই দুইয়ের উর্ধ্বে উঠিয়া তুমি শুদ্ধ সত্ত্বগুণী হও। কর্ম কর, কিন্তু ফল ত্যাগ কর। ফলের আশা ছাড়িয়া কর্ম কর। পূর্বে এবং পরে ফলের আশা রাখিও না।

ফলের আশা করিও না—একথার সঙ্গে সঙ্গে গীতা একথাও বলে যে, কর্ম উত্তমরূপে ও দক্ষতা সহকারে করিতে হইবে। সকাম পুরুষের কর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম পুরুষের কর্ম অধিক উত্তম হওয়া চাই। আর এই প্রত্যাশা উচিতও বটে ; কারণ সকাম পুরুষ ফলাসক্ত। তাই ফলের স্বপ্নচিন্তায় তাহার সময় ও শক্তি অল্পাধিক অবশ্যই ব্যয় হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ফলেচ্ছারহিত লোকের প্রতিমুহূর্ত এবং সমগ্র শক্তি কর্মেই নিয়োজিত থাকে। নদীর ছুটি নাই, হাওয়ার বিরাম নাই, সূর্য অনুক্ষণ জ্বলিতেছে। তেমনি নিষ্কাম কর্মী নিরন্তর সেবাকর্ম ছাড়া আর কিছু জানে না। অতএব এরূপ নিরন্তর কর্মরত পুরুষের কর্ম যদি উৎকৃষ্ট না হয় তবে হইবে কাহার ? তাহা ছাড়া চিত্তের সমতা এক বড় নিপুণ গুণ। নিষ্কাম পুরুষের তাহা পৈতৃক সম্পত্তি। যে কোন হস্তশিল্প লক্ষ্য করুন। শিল্পকর্মের সহিত চিত্তের সমত্বের সংযোগ যদি হইয়া যায় তবে পরিষ্কার দেখা যাইবে যে সে কর্ম আরও অধিক সুন্দর হইয়াছে। তাহা ছাড়া সকাম ও নিষ্কাম পুরুষের কর্ম-দৃষ্টিতে যে পার্থক্য থাকে তাহাও নিষ্কাম পুরুষের কর্মের পক্ষে অধিকতর অনুকূল। সকাম পুরুষ কর্মের দিকে স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখে। "আমার কাজ, আর আমারই ফল"—এই দৃষ্টির দরুন যদি কর্ম হইতে তাহার

মনঃসংযোগ কতকটা সরিয়া যায় তবে তাহাতে সে কোন নৈতিক দোষও দেখিতে পায় না। খুব দেখে ত দেখে ব্যবহারিক দোষ মাত্র। কিন্তু নিষ্কাম পুরুষের নিজ কর্ম সম্বন্ধে নৈতিক কর্তব্যবুদ্ধি থাকে। তাই নিজ কার্যে ত্রুটির লেশমাত্র যাহাতে না থাকে সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই কারণেও তাহার কার্য অধিকতর নির্দোষ হইবে। যেদিক হইতেই দেখুন, ফলত্যাগ যে একান্ত নিপুণ ও প্রশংসনীয় উপায় তাহা প্রমাণ হয়। অতএব ফলত্যাগকেই যোগ বা জীবনযাপনের কলা বলা উচিত হইবে।

নিষ্কাম কর্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কাজের নিজেরই যে আনন্দ রহিয়াছে সে আনন্দ উহার ফলে নাই। নিজ কর্ম করিতে করিতে এক প্রকারের তন্ময়তা জন্মে। তাহা আনন্দেরই এক ধারা। চিত্রকরকে বলুন, "ছবি আঁকতে হবে না, যতটা পয়সা চাই নিয়ে নাও।" এ কথায় সে কান দিবে না। কৃষককে বলুন, "ক্ষেতে যেয়ো না, গাই চরাতে হবে না, সেচ দিয়ে কাজ নেই, ফসল যতটা চাও দেব।" যদি সে প্রকৃত কৃষক হয় তবে সেকথা তাহার ভাল লাগিবে না। চাষী ভোরে উঠিয়া ক্ষেতে যায়। সূর্যনারায়ণ তাহার অভ্যর্থনা করে, পাখী তাহার জন্য তান ধরে। গাই-বাছুর তাহার আশপাশে ঘিরিয়া থাকে। সে প্রেমভরে তাহাদের পিঠে হাত বুলায়। যে ফসল সে বুনিয়াছে অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখে। এই সকল কাজে এক প্রকারের সাত্ত্বিক আনন্দ আছে। এই আনন্দই ঐ কার্যের মুখ্য ও খাঁটি ফল। সে তুলনায় উহার বাহ্য ফল নিতান্তই তুচ্ছ।

গীতা যখন মানুষের দৃষ্টি হইতে কর্মফল সরাইয়া দেয় তখন গীতা ঐ উপায়ে তাহার কর্মতন্ময়তা শতগুণ বাড়াইয়া দেয়। ফল-নিরপেক্ষ লোকের কর্মবিষয়ক তন্ময়তা সমাধির তুল্য। এই হেতু তাহার আনন্দ অন্য আনন্দ হইতে শতগুণ বেশী। এই দিক হইতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, নিষ্কাম কর্ম নিজেই এক মহান্ ফল। জ্ঞানদেব ঠিকই বলিয়াছেন, "বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে, ফলে আবার কি ফল ধরিবে?" এই দেহরূপ বৃক্ষে নিষ্কাম স্বধর্মাচরণরূপ সুন্দর ফল ধরার পরে এখন আর অন্য ফলের অপেক্ষা কেন? কৃষক ক্ষেতে গম বোনে, গম বেচিয়া জোয়ারের

রুটি কেন খায় ? সুস্বাদু কলা সে ফলায়, তাহা বেচিয়া সে লঙ্কা খায় কেন ? ওরে ভাই, কলা-ই খাও না ? কিন্তু লোকের সেকথা রোচে না। কলা খাওয়ার ভাগ্য থাকিতেও লঙ্কার জন্য পাগল হয়। গীতা বলে, "তুমি একাজ করিও না। কর্মই খাও, কর্মই পান করো, আর-কর্মই হজম করো।" কর্ম করাতেই সব কিছু আসিয়া যায়। খেলার আনন্দে শিশু খেলে। তাহা হইতে আপনা আপনি সে ব্যায়ামের ফল পাইয়া থাকে। কিন্তু সেই ফলের দিকে তাহার নজর থাকে না। তাহার সকল আনন্দ ঐ খেলাতেই থাকে।

॥ ৯ ॥ ফল ত্যাগের দুইটি উদাহরণ

সাধু লোকেরা নিজ-নিজ জীবন দ্বারা একথা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তুকারামের ভক্তিভাব দেখিয়া শিবাজী মহারাজের মনে তাহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। একবার তিনি তুকারামের বাড়ী পাল্‌কি পাঠাইয়া তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন, ইহাতে তুকারাম অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, 'এই কি আমার ভক্তির ফল ? এই জন্যই কি আমার ভক্তি ?' তাহার মনে হইল মান সম্মানের এই ফল তাহার হাতে দিয়া ভগবান তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন : "হে পাণ্ডুরঙ্গ ! আমার অন্তরের কথা জেনেও তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ। ভগবান, তোমার এই অভ্যাস ভাল নয়। কুঁচের দানা দিয়ে তুমি আমায় ভোলাতে চাও। ভাবছ এসব দিয়ে এ আপদটাকে দূর করে দেব। কিন্তু আমিও ভুলবার পাত্র নই। আমি তোমার পা শক্ত করে ধরে বসে থাকব।"

ভক্তিই ভক্তের স্বধর্ম। আর ভক্তিতে রকম রকম ফলের শাখা অঙ্কুরিত হইতে না দেওয়া তাহার জীবন-কলা।

ফলত্যাগের ইহা অপেক্ষাও উচ্চ আদর্শ পুণ্ডলীকের চরিত্র আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। পুণ্ডলীক মা-বাবার সেবা করিতেছেন। তাহার সেবায় তুষ্ট হইয়া পাণ্ডুরঙ্গ তাহাকে দর্শন দিতে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু পুণ্ডলীক তাঁহার দর্শনের লোভে পড়িলেন না। সেবা কার্যেই রত রহিলেন। আপন পিতা-মাতার সেবা-ই তাঁহার কাছে প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি ছিল। কোন পুত্র

যদি পিতা-মাতার সুখবিধানের জন্য অপরকে লুণ্ঠন করে অথবা কোন দেশ-সেবক যদি অপর দেশকে দ্রোহ করিয়া নিজ দেশের উন্নতি করিতে চায় ত এই দুই জনের এই কাজকে ভক্তি বলা যাইবে না—উহা আসক্তি মাত্র। পুণ্ডলীকের সেবা এইরূপ আসক্তি যুক্ত ছিল না। তিনি ভাবিলেন, পরমাত্মা আমার সম্মুখে যে মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছেন, উহাই কি তাঁহার একমাত্র রূপ? এইরূপে দেখা দেওয়ার পূর্বে সৃষ্টি কি প্রেতবৎ ছিল? ভগবান কে তিনি বলিলেন, "হে ভগবান, তুমি স্বয়ং আমাকে দর্শন দিতে এসেছ, তা আমি জানি। কিন্তু আমি 'ও' সিদ্ধান্তবাদী। এক তুমিই ভগবান একথা আমি মানি না। আমার কাছে তুমিও ভগবান, মা-বাবাও ভগবান। তাঁদের সেবায় নিযুক্ত আছি বলে তোমার দিকে মন দিতে পারছি না। তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো।" এই বলিয়া তিনি ভগবানকে অপেক্ষা করিবার জন্য একখানা ইট বাড়াইয়া দিলেন এবং স্বীয় কার্যে মন নিবিষ্ট করিলেন। তুকারাম এই প্রসঙ্গে বড়ই কৌতুকপূর্ণ পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন:

"তুই কেমন পাগল প্রেমী, তুই বিঠ্ঠলকে দাঁড় করিয়ে রাখলি? তুই কেমন বেয়াদব, তুই বিঠ্ঠলকে ইট্ বাড়িয়ে দিলি?"

পুণ্ডলীক আচরিত এই 'ও'-সিদ্ধান্ত ফলত্যাগ যুক্তির অঙ্গ। ফলত্যাগী পুরুষের কর্মসমাধি যেমন গভীর, তাহার বৃত্তিও তেমন ব্যাপক, উদার ও সমভাবাপন্ন। তাই সে নানারূপ তত্ত্বজ্ঞানের ঝামেলায় পড়ে না এবং নিজের সিদ্ধান্তও ছাড়ে না। **নান্যদস্তীতিবাদিনঃ**—ইহা ছাড়া অন্য কিছুই নাই—এরূপ তর্কে সে পড়ে না। এ-ও ঠিক আর ও-ও ঠিক। কিন্তু আমার পক্ষে ত এ-ই ঠিক। এইরূপই তাহার বিনম্র দৃঢ় বৃত্তি।

এক গৃহস্থ কোন এক সময়ে এক সাধুর কাছে গেল ও জিজ্ঞাসা করিল, "মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ঘরসংসার ছাড়া কি দরকার?" সাধু বলিলেন, 'না ত, দেখ, জনকের মত ব্যক্তিও যখন রাজমহলে থেকে মোক্ষ লাভ করে গেছেন, তখন তোমার পক্ষে ঘর ছাড়ার আবশ্যকতা কোথায়?' পরে অপর একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামীজী, গৃহত্যাগ না করলেও মোক্ষ লাভ হতে পারে কি?" সাধু বলিলেন, "কে বলেছে? ঘর দোর না ছেড়ে অমনি যদি মোক্ষ মিলত তাহলে শুকের ন্যায় যাঁরা ঘর ছেড়ে ছিলেন তাঁরা কি মূর্খ

ছিলেন ?" পরে সেই দুইজনে দেখা হইলে মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। একজন বলিল, "সাধু ঘর সংসার ছাড়তে বলেছেন।" অপরে বলিল, "না, সাধু বলেছেন ঘর-দোর ছাড়ার দরকার নেই।" তাহারা উভয়ে তখন সাধুর কাছে গেল। সাধু বলিলেন, "দুজনের কথাই ঠিক। যার যেমন মতি তার তেমন গতি। যার যেমন প্রশ্ন, তার তেমন উত্তর। ঘর ছাড়া দরকার এ যেমন সত্য, আর ঘর ছাড়া নিষ্প্রয়োজন, এ-ও তেমন সত্য," ইহাকেই বলে 'ও'-সিদ্ধান্ত।

পুণ্ডলীকের উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে ফলত্যাগের সীমা কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে। তুকারামকে ভগবান যে প্রলোভনে ভুলাইতে চাহিয়াছিলেন, পুণ্ডলীকের কাছে উপস্থিত লোভ তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু সে তাহাতে মোহিত হইল না। যদি হইত ত ফাঁসিয়া যাইত। সাধন একবার নিশ্চিত হইয়া গেলে শেষ পর্যন্ত তাহাতে লাগিয়া থাকা চাই। মাঝ পথে ভগবৎ-দর্শনরূপ বাধা উপস্থিত হইলেও সাধন ছাড়িতে নাই। দেহ যতক্ষণ আছে সাধনার জন্যই আছে। ভগবানের দর্শন ত হাতেই আছে উহা আর যাইতেছে কোথায় ?

সর্বাত্মকপণ মাঝেঁ হিরোনি নেভো কোণ ?
মনীঁ ভক্তিচী আবডী।

"আমার সর্বাত্মভাব কে কেড়ে নিতে পারে ? আমার মন তোমার ভক্তিরসে রঞ্জিত হয়ে গেছে।" এইরূপ ভক্তিলাভ করার জন্যই আমাদের জন্ম। 'মা তে সংগোঽস্ত্বকর্মণি'।—এই গীতা-বচনের অর্থ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে অকর্মের অর্থাৎ অন্তিম কর্মমুক্তির তথা মোক্ষের বাসনা পর্যন্ত ত্যাগ করা চাই। বাসনা হইতে মুক্তিই তো মোক্ষ। বাসনার কাছ হইতে মোক্ষের কি পাওয়ার আছে ? ফলত্যাগ যখন এই স্তরে পৌঁছিয়া যায়, তখন জীবন কলায় যেন পূর্ণিমায় উদয় হয়।

॥ ১০ ॥ আদর্শ গুরু মূর্তি

শাস্ত্রের কথাও বলা হইল, কলার কথাও বলা হইল। কিন্তু ইহাতেই সম্পূর্ণ চিত্র দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় না। শাস্ত্র নির্গুণ। কলা সগুণ।

কিন্তু সগুণও আকার ছাড়া ব্যক্ত হয় না। কেবল নির্গুণ যেমন শূন্যে থাকে, নিরাকার সগুণের অবস্থাও সেইরূপ হইতে পারে। উপায় হইতেছে, যে গুণীতে গুণ মূর্ত্তিমান হইয়াছে তাহার দর্শন। তাই ত অর্জুন বলিতেছেন, "হে ভগবান, আপনি মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। সে সকল সিদ্ধান্ত কিরূপে আচরণ করিতে হয় সেই কলার সন্ধানও দিয়েছেন, তবুও এর সুস্পষ্ট চিত্র আমার কাছে ধরা পড়ছে না। অতএব এখন আমাকে এর উদাহরণ দিন। যাঁর বুদ্ধিতে সাংখ্যনিষ্ঠা স্থির হয়েছে এবং ফলত্যাগরূপ যোগ যাঁর প্রতি রোমকূপে পরিব্যাপ্ত, এরূপ পুরুষের লক্ষণ বলুন। যাঁদের স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়, ফলত্যাগের পূর্ণতা যাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, কর্ম-সমাধিতে যাঁরা মগ্ন এবং যাঁরা মহামেরুসদৃশ দৃঢ়নিশ্চয়ী, তাঁরা কি ভাবে বলেন, কি ভাবে বসেন, কি ভাবে চলেন সে সব আমাকে বলুন। তাঁদের আকৃতি কিরূপ? তাঁদের চেনার উপায় কি? ভগবান, সে সব বলুন।"

তাই ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তিম আঠারটি শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের গম্ভীর ও উদাত্ত চিত্র আঁকিয়াছেন; যেন এই শ্লোকমালায় গীতার আঠার অধ্যায়ের সার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ গীতার আদর্শ-মূর্ত্তি। এই শব্দটিও গীতার নিজস্ব। পরে পঞ্চম অধ্যায়ে জীবন্মুক্তের, দ্বাদশে ভক্তের, চতুর্দশে গুণাতীতের এবং অষ্টাদশে জ্ঞাননিষ্ঠের এরূপ বর্ণনাই রহিয়াছে। কিন্তু এই সব অপেক্ষা স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা অধিক বিশদ ও সুস্পষ্ট। ইহাতে সিদ্ধ-লক্ষণের সহিত সাধক-লক্ষণও বলা হইয়াছে। সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহী স্ত্রী-পুরুষ সান্ধ্য-প্রার্থনায় এই সব শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে, যদি তাহা পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইত তবে কতই না আনন্দের হইত! কিন্তু আগে তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করা চাই। তখন আপনাআপনি তাহা বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবে। নিত্যপঠনীয় বিষয় যন্ত্রবৎ হইলে তাহা চিত্তে রেখাপাত ত করেই না, উল্টা লয় পায়। কিন্তু এই দোষ নিত্য পাঠের নয়, মনন না করার। নিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-মনন ও নিত্য-আত্মনিরীক্ষণ দরকার।

স্থিতপ্রজ্ঞ বলিতে স্থিরবুদ্ধি লোক বুঝায়। নামেই তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু সংযম ব্যতীত বুদ্ধি স্থির হইবে কিরূপে ? তাই স্থিতপ্রজ্ঞকে সংযম-মূর্তি বলা হইয়াছে। বুদ্ধি হইবে আত্মনিষ্ঠ আর অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়-সমূহ হইবে বুদ্ধির অধীন। ইহাই সংযমের অর্থ। স্থিতপ্রজ্ঞ ইন্দ্রিয়সকলকে লাগামে আবদ্ধ করিয়া কর্মযোগে জুড়িয়া দেন। ইন্দ্রিয়রূপী বলদ দ্বারা তিনি নিষ্কাম স্বধর্মাচরণের ক্ষেত সুন্দররূপে আবাদ করিয়া লন। নিজের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তিনি পরমার্থের জন্য ব্যয় করেন।

এই ইন্দ্রিয়-সংযম সহজ ব্যাপার নয়। ইন্দ্রিয় হইতে মোটেই কাজ না লওয়া একদিক হইতে সহজ হইতে পারে। মৌন, নিরাহারাদি ব্যাপার তত কঠিন নয়। ইহার বিপরীত, ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরঙ্কুশ ছাড়িয়া দেওয়া, সে ত যে-কেহই পারে। কিন্তু কচ্ছপ যেমন ভয়ের ক্ষেত্রে নিজের সমস্ত অঙ্গ ভিতরে গুটাইয়া লয় এবং নিরাপদ স্থানে উহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করে, তেমনি বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে গুটাইয়া লওয়া ও পরমার্থের কাজে উহাদের সমুচিত ব্যবহার করা—এই প্রকার সংযম কঠিন। এজন্য মহান্ প্রযত্ন আবশ্যক, জ্ঞানও থাকা চাই। তাহা হইলেও সব সময় যে উহা উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবে তাহাও নয়! তবে কি আমরা আশা ছাড়িয়া দিব ? না, সাধকের কখনও নিরাশ হইতে নাই। সাধক নিজের সকল উপায় কর্মে নিয়োগ করিবে। তাহা অপর্যাপ্ত হইলে ভক্তি জুড়িয়া দিবে। এই মহামূল্যবান নির্দেশ ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে দিয়াছেন, দিয়াছেন অবশ্য গুটিকয়েক শব্দে। কিন্তু অনেক বক্তৃতার চাইতে তাহা অধিক মূল্যবান। কারণ ভক্তির যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন সেখানেই তাহা উপস্থিত করা হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণসমূহের বিস্তৃত বিবরণ আজ এখানে দেওয়ার নহে। কিন্তু আমাদের সকল সাধনায় ভক্তির নিজস্ব স্থানের কথা পাছে আমরা ভুলিয়া যাই তাই তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল। পূর্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ এ জগতে কে হইয়াছিলেন তাহা এক ভগবানই জানেন। কিন্তু সেবাপরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞের দৃষ্টান্ত পুণ্ডলীকের মূর্তি সর্বদা আমার চোখের সম্মুখে ভাসে, আর সেকথা আমি আপনাদের বলিলামও।

এখানে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ পূর্ণ হইল। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ও শেষ হইল।

(নির্গুণ) সাংখ্য-বুদ্ধি + (সগুণ) যোগ-বুদ্ধি+(সাকার) স্থিতপ্রজ্ঞ
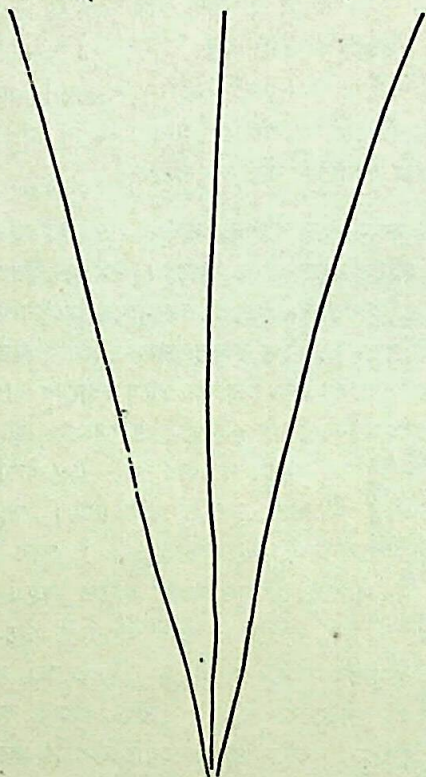
মিলিয়া

সম্পূর্ণ জীবনশাস্ত্র

ব্রহ্মনির্বাণ তথা মোক্ষ ছাড়া ইহার পরিণাম আর কি হইতে পারে?

রবিবার, ২৮-২ ১৯৩২

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

॥ ১১ ॥ ফলত্যাগী অনন্ত ফল পায়

বন্ধুগণ,

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সম্পূর্ণ জীবনশাস্ত্রের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছি। তৃতীয় অধ্যায়ে এই জীবনশাস্ত্রের স্পষ্টীকরণ করা হইয়াছে। প্রথমে আমরা তত্ত্বসমূহের বিচার করিয়াছি। এখন বিস্তৃত বিবরণে যাইতেছি। পূর্ব অধ্যায়ে কর্মযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কর্মযোগে ফলত্যাগই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মযোগে ফলত্যাগ ত রহিয়াছে কিন্তু ফললাভ হয় কি-না ইহাই প্রশ্ন। তৃতীয় অধ্যায় বলে, কর্মফল ত্যাগ করিলে কর্মযোগী অনন্তগুণ ফল পায়।

এখানে আমার লক্ষ্মীর কাহিনী মনে পড়িতেছে। তাঁহার স্বয়ম্বর ছিল। সমস্ত দেব-দানব বড় আশা লইয়া আসিয়াছিল। লক্ষ্মী তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা তখনও বলেন নাই। সভামণ্ডপে আসিয়া তিনি বলিলেন, "যে আমাকে চায় না তাকেই আমি মাল্যদান করব।" উপস্থিত সকলে আশালোলুপ ছিল। তবুও লক্ষ্মী নিস্পৃহ বর খুঁজিতে লাগিলেন। শেষনাগের উপর শান্তভাবে শায়িত বিষ্ণুর মূর্তির উপর তাঁহার নজর পড়িল। তাঁহার গলায় মালা দিয়া আজ পর্যন্ত তিনি তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন। **ন মাগে তয়াচী রমা হোয় দাসী**। 'যে চায় না, রমা তারই দাসী হয়।' বিশেষত্ব এখানেই।

সাধারণ লোকে আপন ফলের চারিদিকে বেড়া টানে। অনন্ত লভ্য ফল সে এভাবে হারায়। সাংসারিক লোক অপার কর্ম করিয়া অল্প ফল পায় আর কর্মযোগী সামান্য মাত্র করিয়া অনন্তগুণ পায়। এই পার্থক্য হয় কেবল এক ভাবনার জন্য। টলষ্টয় এক জায়গায় বলিয়াছেন, "লোকে যীশুখ্রীষ্টের আত্মত্যাগের প্রশংসা করে। কিন্তু এই যে সাংসারিক জীব এরা প্রত্যহ কত যে রক্ত শুকোয়, কত যে কঠোর শ্রম করে, দু'ছুটো গাধার বোঝা পিঠে নিয়ে সংসারী জীব চক্কর কাটছে। যীশুখ্রীষ্টের চাইতে

তাদের কষ্ট কতই না বেশী! আর কতই না তাদের দুর্গতি! এর অর্ধেক কষ্টও যদি তারা ভগবানের জন্য করে তবে সত্যসত্যই তারা যীশু থেকে বড় হয়ে যাবে।"

সংসারী মানুষের তপস্যা যথার্থই বড়। কিন্তু সে তপস্যা করে ক্ষুদ্র ফলের জন্য। যেমন ভাব তেমন লাভ। নিজ বস্তুর যে মূল্য আমরা ধরি তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্য জগতের লোক দেয় না। সুদামা চিঁড়া লইয়া ভগবানের কাছে গেলেন। মুষ্টিপ্রমাণ চিঁড়া। তাহার দাম খুব সম্ভব এক আধলাও ছিল না। কিন্তু সুদামার কাছে তাহা ছিল অমূল্য। কেন না তাহাতে ভক্তিভাব ভরা ছিল। তাহা ছিল অভিমন্ত্রিত। তাহার কণায় কণায় ভাব ভরা ছিল। হইল-ই বা জিনিস ক্ষুদ্র, ভাবনায় উহার মূল্য, উহার সামর্থ্য বাড়িয়া যায়। নোটের ওজন আর কতটুকু? উহা জ্বালাইলে এক অঁাজলা জলও গরম হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতে যে মুদ্রা অঙ্কিত থাকে সেই অনুযায়ী উহার মূল্য নির্ধারিত হয়।

কর্মযোগের ইহাই বিশেষত্ব। কর্মকে নোটই মনে করুন। ভাবনারূপ মুদ্রণেই উহার মূল্য, কর্মরূপ কাগজের মূল্য কিছু নয়। প্রকারান্তরে মূর্তিপূজার রহস্যের কথাই আমি এখানে বলিতেছি। মূর্তিপূজার কল্পনায় অশেষ সৌন্দর্য নিহিত। কাহার সাধ্য এই মূর্তি ভাঙে-চুরে। প্রথমে এই মূর্তি এক টুকরা পাথরই ছিল। তাহাতে আমি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলাম, নিজের ভাবনা আরোপ করিলাম। এই ভাবনাকে কেহ ভাঙিতে-চুরিতে পারে কি? পাথর ভাঙা-চুরা যায়। ভাবনা ভাঙা যায় না। মূর্তি হইতে আমি যখন নিজ ভাবনা সরাইয়া লইব, কেবল তখনই তাহা পাথরে পর্যবসিত হইবে, আর তখনই কেবল তাহা টুকরা করা যাইবে।

কর্ম মানে পাথর বা কাগজের টুকরা। আমার মা ছোট্ট একটু কাগজের টুকরায় অঁাকা-বাঁকা দুই চারিটি ছত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। আর অপর কেহ আজে বাজে কথা লিখিয়া পঞ্চাশ লাইনের এক দীর্ঘপত্র পাঠাইল। ওজন কোনটির অধিক? মায়ের ঐ চার লাইনে যে ভাব রহিয়াছে, তাহা অমূল্য, পবিত্র। আর ঐ আজে বাজে দীর্ঘপত্র তাহার

তুলনায় কিছুই নয়। কর্মে আর্দ্রতা থাকা চাই। ভাব থাকা চাই। আমরা মজুরের কাজের হিসাব পয়সায় করি। বলি, "এত পয়সা হয়েছে, নাও।" কিন্তু দক্ষিণার বেলায় তাহা হয় না। দক্ষিণা আর্দ্র হৃদয়ে দিতে হয়। দক্ষিণার বেলায় কত দেওয়া হইল তাহা প্রশ্ন নয়। দক্ষিণা ভাবরসে সিক্ত কিনা, গুরুত্ব সেখানেই। মনুস্মৃতিতে একটি খুব মজার কথা আছে। এক শিষ্য বার বৎসর গুরু গৃহে থাকিয়া পশু হইতে মানুষ হইয়াছিল। এখন সে গুরু দক্ষিণা কি দেয়? তখনকার দিনে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ প্রথমেই কিছু লওয়া হইত না। বার বৎসরের শিক্ষা শেষে যাহা দেওয়ার হইত দিত। মনু বলিয়াছেন, "দাও গুরুকে দু' একটি ফুল, এক-আধখানা পাখা, একজোড়া খড়ম বা জলভরা একটি মাটির কলসী।" ইহাকে পরিহাস মনে করিবেন না। যাহা দেয় তাহা শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ মনে করা চাই। ফুলের ওজন আর কত? কিন্তু ভক্তিভাবনায় উহার ওজন একটা পৃথিবীর সমান হইয়া দাঁড়ায়।

রুক্মিণী নেঁ এক্যা তুলসীদলানে গিরিধর প্রভু তুলিলা—

রুক্মিণী একটি তুলসী পাতা দ্বারা গিরিধারী প্রভুকে ওজন করিলেন। সত্যভামার মন-ভর গহনায় সে কাজ হইল না। কিন্তু রুক্মিণী মাতা ভাবভক্তিভরা একটি তুলসী পত্র পাল্লায় নিক্ষেপ করিলেন ত সর্ব কর্ম নিষ্পন্ন হইয়া গেল। সে তুলসী পত্র অভিমন্ত্রিত ছিল। তখন আর তাহা সাধারণ পাতা ছিল না। কর্মযোগীর কর্মও তদ্রূপ।

মনে করুন, দুই ব্যক্তি গঙ্গাস্নানে গিয়াছে। তাহাদের একজন বলে, লোকে গঙ্গার মহিমার কথা বলে। উহাতে আছে কি? দুইভাগ হাইড্রোজেন—এক ভাগ অক্সিজেন। এই দুই গ্যাস মিলাও হয়ে গেল গঙ্গা। বেশী আর উহাতে কি আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে ভগবান বিষ্ণুর পদকমল হইতে ইহা বাহির হইয়াছে, শঙ্করের জটাজুটে ইহা বাস করিয়াছে। হাজার হাজার ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি ইহার তীরে তপস্যা করিয়াছে, অনন্ত পুণ্যকর্ম ইহার সান্নিধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। এমনি পবিত্র এই গঙ্গামাতা।" এইভাবে অভিভূত হইয়া সে স্নান করে। অক্সিজেন হাইড্রোজেন মান্যকারী লোকও স্নান করে। দেহশুদ্ধিরূপ ফল উভয়েই

পায়। কিন্তু ভক্ত দেহশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধির ফলও লাভ করে। গঙ্গাস্নানে গরুরও দেহশুদ্ধি হয়। গায়ের ময়লা দূর হয়। কিন্তু মনের ময়লা যাইবে কিরূপে? একের লাভ হইল দেহশুদ্ধিরূপ তুচ্ছ ফল। অপরে তদতিরিক্ত চিত্তশুদ্ধি রূপ অমূল্য ফলও লাভ করিল!

স্নানের পরে যে ব্যক্তি সূর্য-নমস্কার করে ব্যায়ামের ফল ত সে পায়ই। কিন্তু সে স্বাস্থ্যের জন্য নমস্কার করে না, করে উপাসনার জন্য। তাহাতে স্বাস্থ্যলাভ ত হয়ই, অধিকন্তু বুদ্ধির প্রভাও উজ্জ্বলতর হয়। স্বাস্থ্যের সাথে সাথে সূর্যনারায়ণের নিকট হইতে প্রেরণা এবং প্রতিভাও সে লাভ করে।

কর্ম একই। কিন্তু ভাবনাভেদহেতু উহাতে পার্থক্য হইয়া থাকে। পরমার্থী মানুষের কর্ম আত্মার বিকাশকারী, সংসারী মানুষের কর্ম আত্মার বন্ধনকারী। কর্মযোগী যদি কৃষক হয় তবে স্বধর্ম মনে করিয়া চাষবাস করিবে। তাহাতে তাহার উদর-পূর্তি ত হইবেই, কিন্তু পেটে খাইতে পাইবে বলিয়াই যে সে কাজ করে তাহা নয়। চাষ-আবাদ করিতে পারিবে বলিয়া আহারকে সে সাধন জ্ঞান করে। স্বধর্ম তাহার সাধ্য আর আহার সাধন। কিন্তু অপর কোন কৃষকের কাছে উদর-পূর্তি করা সাধ্য, আর কৃষিকর্মরূপ স্বধর্ম তাহার সাধন। এইরূপই ইহা একে অপরের বিপরীত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া মজা করিয়া বলা হইয়াছে—অন্য লোক যখন জাগ্রত থাকে, কর্মযোগী তখন নিদ্রা যায়। অন্য লোক যখন নিদ্রা যায়, কর্মযোগী তখন জাগ্রত থাকে। আমরা জাগিয়া থাকি পেটের অন্ন আহরণের জন্য। আর এক মুহূর্ত বিনা কাজে না যায় তাহার জন্য কর্মযোগী জাগিয়া থাকে। না খাইলে নয় তাই সে খায়। না দিলে চলে না তাই সে উদরগহ্বরে খাদ্য নিক্ষেপ করে। সংসারী লোকের আহারে আনন্দ, যোগীদের আহারে নিরানন্দ। তাই সে রসনা তৃপ্তির জন্য আহার করে না। সংযমে চলে। একের যখন রাত্রি, অপরের তখন দিন। একের দিন অপরের রাত্রি। অর্থাৎ একের কাছে যাহা দুঃখ অপরের কাছে তাহা আনন্দ। আর একের কাছে যাহা

আনন্দ অপরের কাছে তাহা দুঃখ। সংসারী ও কর্মযোগী উভয়ে একই কর্ম করে। কিন্তু কর্মযোগী ফলাসক্তি ছাড়িয়া কর্মের আনন্দে বিভোর, ইহাই মুখ্য কথা। সংসারীর মতই যোগীও খায় দায় ঘুমায়, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাহার ভাবনা পৃথক। তাই গীতায় আরও ষোলটি অধ্যায় সামনে পড়িয়া থাকিলেও প্রারম্ভেই স্থিতপ্রজ্ঞের সংযম মূর্তি উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

সংসারী মানুষ ও কর্মযোগী এই দুইয়ের কর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে। ধরুন, কর্মযোগী গো-পালনের কাজ করিতেছে। কোন্ দৃষ্টিতে তাহা সে করিবে? গো সেবা করিলে সমাজ প্রচুর দুধ পাইবে। গাইকে উপলক্ষ্য করিয়া মনুষ্যেতর পশুজগতের সহিত তাহার প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, এই ভাবনা হইতে সে সেবা করিবে। বেতন পাইবে বলিয়া নয়। বেতন ত সে পাইবেই, কিন্তু প্রকৃত আনন্দ এই দিব্য ভাবনাতে।

কর্মযোগীর কর্ম তাহাকে বিশ্বের সহিত সমরস করিয়া দেয়। তুলসীতে জল না দিয়া খাইব না। এইভাবে বনস্পতি জগতের সহিত প্রেমসম্বন্ধ সৃষ্টি করা হয়। তুলসীকে অনাহারে রাখিয়া আমি খাই কি করিয়া? এইরূপে গো-জাতির সহিত একরূপতা, বনস্পতির সহিত একরূপতা সাধিতে সাধিতে সমস্ত বিশ্বের সহিত আমাদের একরূপতা অনুভব করিতে হইবে। মহাভারতযুদ্ধে সন্ধ্যা হইতেই সকলে সায়ং-সন্ধ্যা ইত্যাদি করিতে যাইত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথের ঘোড়া খুলিতেন, জল খাওয়াইতেন, গা দলাই-মলাই করিয়া দিতেন, শরীর হইতে শল্য তুলিয়া ফেলিতেন। সে সেবায় ভগবানের কতই না আনন্দ। উহার বর্ণনায় কবির ক্লান্তি নাই। নিজ পীতাম্বরে দানা-ভূষি লইয়া ঘোড়াকে দিতেছেন এইরূপ পার্থসারথির চিত্র চোখের সম্মুখে দাঁড় করান আর কর্মযোগের আনন্দের কল্পনা করুন। প্রত্যেক কর্ম যেন আধ্যাত্মিক, উচ্চতর পরমার্থিক কর্ম। খাদি কর্মের কথা ধরুন। কাঁধে খাদির গাঁইট লইয়া ফেরি করিতে বিরক্ত লাগে কি? লাগে না। কেননা আধ-পেট খাইতে পায় না দেশের এরূপ কোটি কোটি ভাই-বোনদের এক মুঠো অন্ন দিতেছি' এই ভাবনায় সে তন্ময় থাকে।

তাহার ঐ গজপ্রমাণ খাদি বিক্রয়রূপ কার্য দ্বারা সে সমস্ত দরিদ্রনারায়ণের সহিত যুক্ত হইয়া যায়।

॥ ১২ ॥ কর্মযোগের বিবিধ প্রয়োজন

নিষ্কাম কর্মযোগের সামর্থ্য অদ্ভুত। এইরূপ কর্ম হইতে ব্যক্তি ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। স্বধর্মপরায়ণ কর্মযোগীর ভরণ-পোষণ ত নির্বাহ হয়ই, অধিকন্তু নিরন্তর কর্মরত থাকে বলিয়া তাহার শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে। ফলে, যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজের জীবনযাত্রা সুন্দররূপে চলে। বেশী পয়সা পাওয়া যাইবে বলিয়া কর্ম-যোগী চাষী আফিং বা তামাকের চাষ করে না। স্বভাবতঃই সকল কর্ম সে সমাজের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া করে। স্বধর্মরূপ কর্ম সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। আমি যে ব্যবসায় করি তাহা সমাজের হিতার্থে—যে ব্যাপারী এরূপ মনে করে সে বিদেশী কাপড় বিক্রয় করিবে না। তাহার ব্যবসায় সমাজোপকারক হইবে। আপন ভুলিয়া আশপাশের সমাজের সহিত সমরস হইতে প্রযত্নশীল কর্মযোগী সমাজে যে জন্মে সে সমাজে সুব্যবস্থা, সমৃদ্ধি ও প্রসন্নতা বিরাজ করে।

কর্মযোগীর কর্মহেতু তাহার শরীর-যাত্রা নির্বাহ হয়, তাহার দেহ ও বুদ্ধি সতেজ থাকে। সমাজেরও তাহাতে কল্যাণ হয়। এই সকল ফল ছাড়া চিত্তশুদ্ধিরূপ মহান ফল তাহার লাভ হয়। বলা হইয়াছে, 'কর্মণা শুদ্ধিঃ।' কর্ম চিত্তশুদ্ধির সাধন। কিন্তু সর্বসাধারণ যে কর্ম করে ইহা তাহা নহে। কর্মযোগী যে অভিমন্ত্রিত কর্ম করে তাহা দ্বারাই তাহার চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। মহাভারতে তুলাধার বৈশ্যের কথা আছে। জাজলি নামক এক ব্রাহ্মণ তুলাধারের কাছে জ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য যায়। তাহাকে দেখিয়া তুলাধার বলে, "ভাই, এ পাল্লার দাঁড়ি সব সময় সোজা রাখতে হয়।" এই বাহ্য কর্ম করিতে করিতে তুলাধারের মনও সরল হইয়া গিয়াছিল। শিশু আসে, জোয়ান আসে দাঁড়ি একরূপই থাকে। উঁচুনিচু হয় না। কর্মের প্রভাব মনের উপর পড়ে। কর্মযোগীর কর্ম একরূপ জপ। উহা হইতে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয়। আর তখন সেই নির্মলচিত্তে জ্ঞানের প্রতিবিম্ব পড়ে। নিজের বিভিন্ন কর্ম হইতে কর্মযোগী অন্তিমে

জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। পাল্লার দাঁড়ি হইতে তুলাধার সমবৃত্তি লাভ করিয়াছিল। সেনা নাপিত চুল কাটিত। অন্যের মাথার ময়লা দূর করিতে করিতে সেনা নাপিতের জ্ঞানের উদয় হইল—"অন্যের মাথার ময়লা দূর করি। কিন্তু নিজ মাথার, নিজ বুদ্ধির ময়লা দূর করি কি ?" ঐ কর্ম হইতে তাহার মনে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয়। ক্ষেত্রের আগাছা তুলিতে তুলিতে কর্মযোগীর মনে বাসনা-বিকার-রূপ আগাছা তোলার বুদ্ধি জাগে। মাটি দলিয়া গোরা কুমার সমাজকে পাকা হাঁড়ি দিত। এই ক্রিয়া হইতে আপন জীবন-হাঁড়ি পাকা করিয়া লওয়ার সঙ্কেত সে পায়। থাবড় দিয়া মটকা কাঁচা কি পাকা পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি সাধুদেরও পরীক্ষক হইয়া যান। কর্মযোগী যেকর্ম করে সেই কর্মের ভাষা হইতে সে সাধুদের পরীক্ষক বনিয়া যায়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, কর্মযোগী যে-যে কর্ম করে সেই-সেই কর্মের ভাষা হইতেই সে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। কর্ম ত নয় উহা তাহাদের অধ্যাত্মশালা। তাহাদের সেই কর্ম উপাসনাময়, সেবাময়। বাহ্যত ব্যবহারিক হইলেও মূলত উহা আধ্যাত্মিক।

কর্মযোগীর কর্ম হইতে আর এক উত্তম ফল লাভ হয়—তাহা হইতেছে সমাজের সামনে এক আদর্শ স্থাপন। সমাজে এই পার্থক্য ত আছেই কেহ জন্মে আগে, কেহ জন্মে পরে। আগে যে জন্মে তাহার কর্তব্য পরে যে জন্মে তাহার সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হওয়া। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে, মা-বাবা ছেলেমেয়ের কাছে, নেতা অনুযায়ীর কাছে, গুরু শিষ্যের কাছে নিজ আচরণ দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। ইহা তাহাদের কর্তব্য। কর্মযোগী ছাড়া আর কে এইরূপ উদাহরণ উপস্থিত করিতে পারে ?

কর্মযোগী সতত কর্মে রত থাকে কেননা কর্মেই সে আনন্দ লাভ করে। ইহাতে সমাজে দম্ভ বাড়িতে পারে না। কর্মযোগী স্বয়ং-তৃপ্ত থাকে। তবু কর্ম না করিয়া সে থাকিতে পারে না। তুকারাম বলেন, "ভজনে ভগবান মিলেছে বলে কি ভজন ছাড়ব? ভজন ত এখন আমার সহজ ধর্ম হয়ে গেছে।"

আঁধী হোতা সন্ত সঙ্গ। তুকা ঝালা পাণ্ডুরঙ্গ।
ত্যাচেঁ ভজন রাহীনা। মূলস্বভাব জাঈনা

"প্রথমে ছিল সাধুসঙ্গ, তার সাহায্যে তুকারাম হয়েছেন পাণ্ডুরঙ্গ, কিন্তু তাঁর ভজনের তার এখনও ছেঁড়েনি, মূল স্বভাব বদলায় না।"

কর্মের সিঁড়ি আরোহণ করিয়া শিখরে পেঁাছিয়া গেলেও কর্মযোগী কর্ম ছাড়ে না, ছাড়িতে পারে না। তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ ঐ সব কর্মে একেবারে অভ্যস্ত হইয়া যায়। এইরূপে সে স্বধর্ম-কর্মরূপ সেবার সিঁড়ির গুরুত্ব সমাজের কাছে উপস্থাপিত করিতে থাকে।

সমাজ হইতে কপটতা দূর করাই এক মস্ত কাজ। ছল কপটে সমাজ ডোবে। জ্ঞানী যদি চুপ করিয়া বসিয়া যায়, তবে তাহার দেখা-দেখি অপরেও হাতের উপর হাত রাখিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া যাইবে। জ্ঞানী নিত্যতৃপ্ত বলিয়া অন্তরের সুখে লীন হইয়া শান্ত থাকিবে, কিন্তু অন্যে মনে মনে দুঃখী হইয়াও কর্মহীন হইবে। একে [illegible]রে তৃপ্ত বলিয়া শান্ত, অপরে মনের মধ্যে হাহাকার লইয়াও নিশ্চেষ্ট। এই [illegible]বস্থা ভয়ানক। ইহাতে দম্ভ ও কপটতা বৃদ্ধি পায়। তাই সাধুপুরুষমাত্রই [illegible] শিখরে পৌঁছিয়াও সাধনার আঁচল বড় সতর্কতার সহিত ধরিয়া রাখেন, আ[illegible] মরণ আপন কর্ম করিতে থাকেন। শিশুর পুতুল খেলায় মা রস গ্রহণ করেন— যদিও তিনি জানেন ইহা কৃত্রিম। খেলায় যোগ দিয়া তিনি তাহাদের রুচি জন্মান। মা যোগ না দিলে শিশুরা তাহাতে মজা পায় না। কর্মযোগী তৃপ্ত হইয়া কর্ম ত্যাগ করিলে অন্যে তৃপ্ত না হইয়াও কর্মত্যাগ করিবে; কিন্তু মনে মনে থাকিবে উপবাসী ও অসুখী।

অতএব কর্মযোগী সাধারণ লোকের মতই কর্ম করিয়া যায়। সে নিজেকে কোন বিশেষ মানুষ বলিয়া মনে করে না। অন্যের অপেক্ষা অনন্তগুণ বাহিরের পরিশ্রম সে করে। অমুক কর্ম পারমার্থিক এরূপ মার্কা মারার তাহার দরকার নাই। কর্মের বিজ্ঞাপন দেওয়ারও প্রয়োজন নাই। উত্তম ব্রহ্মচারী হও ত নিজের কাজে অপরের অপেক্ষা শতগুণ উৎসাহ প্রদর্শন কর। আহার কম মিলিলেও তিনগুণ কাজ হইতে দাও।

তোমার দ্বারা সমাজের অধিক সেবা হউক। তোমার ব্রহ্মচর্য তোমার কাজে ফুটিয়া উঠুক। চন্দনের সুবাস ছড়াইয়া পড়ুক।

সারাংশ, কর্মযোগী ফলের বাসনা ছাড়িলে অনন্ত ফল পাইবে। তাহার শরীর-যাত্রা নির্বাহ হইবে। শরীর ও বুদ্ধি উভয়ই সতেজ থাকিবে। যে সমাজে সে বিচরণ করিবে সে সমাজ সুখী হইবে, চিত্তশুদ্ধি হইয়া তাহার জ্ঞানলাভ হইবে এবং সমাজের ছলচাতুরী ও ভণ্ডামি দূর হইয়া জীবনে পবিত্র আদর্শ দেখা দিবে। কর্মযোগের এইরূপই অনুভবসিদ্ধ মহিমা।

॥ ১৩ ॥ কর্মযোগ-ব্রতের অন্তরায়

কর্মযোগী অন্যের তুলনায় উৎকৃষ্ট রীতিতে কর্ম করিবে। কেননা কর্মই তাহার উপাসনা। কর্মই তাহার পূজা-বিধান। আমি ভগবানের পূজা করিলাম। পূজার নৈবেদ্য প্রসাদরূপে পাইলাম। কিন্তু ঐ নৈবেদ্য কি ঐ পূজারই ফল ? যে নৈবেদ্যের জন্য পূজা করিবে প্রসাদের অংশ ত সে অচিরে পাইবেই। কিন্তু যে কর্মযোগী সে তাহার পূজা-কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরদর্শনরূপ ফল আকাঙ্ক্ষা করে। কেবল প্রসাদ পাওয়া যাইবে এরূপ তুচ্ছ মূল্য সে নিজ কর্মের ধার্য করে না। নিজের কর্মের মূল্য কম ধরিতে সে রাজী নহে। সে নিজের কাজ স্থূল মাপে ওজন করে না। যাহার লক্ষ্য স্থূল প্রাপ্তিও তাহার স্থূল। চাষবাসের একটি প্রবাদে বলে, "গভীরে বোন, কিন্তু ভিজা বোন।" কেবল গভীর লাঙ্গল করিলে চলিবে না, নীচে আর্দ্রতা থাকা চাই। গভীরতার সহিত আর্দ্রতার সংযোগ হইলে শস্যের দানা কড়াইএর মত বড় হইবে। কর্ম গভীর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। তাহা ছাড়া ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরার্পণরূপ আর্দ্রতাও থাকা চাই। কর্মযোগী গভীর কর্ম করিয়া তাহা ঈশ্বরার্পণ করে।

পরমার্থ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে মনে করে পরমার্থী লোকের হাত-পা নাড়ার, কাজকর্ম করার দরকার নাই। বলা হয়, যে লোক চাষ করে, খাদি বোনে সে আবার কিরূপ পরমার্থী ? কিন্তু একথা লোকে ভুলেও বলে না যে, যে খায় সে আবার কেমন পরমার্থী ? কর্মযোগীর পরমেশ্বর সে কখনও ঘোড়া দলাইমলাই

করে। কখনও গাই চড়ায়। সেই দ্বারকার রাজা যখন গোকুলে যাইত তখন বাঁশী বাজাইয়া গাই চরাইত। সাধুরা এরূপ অশ্ব-পরিচর্যাকারী, গোচারণকারী, রথ-পরিচালনকারী, উচ্ছিষ্ট সাফাই ও ভূমি লেপনকারী কর্মযোগীর মূর্তিকেই পরমেশ্বর রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। আর তাঁহারা নিজেরা কেহ দরজীর কাজ করিয়া কেহ কুমারের কাজ করিয়া, কেহ বা তাঁতির, কেহ বা মালীর, কেহ বা ধানভাঙ্গুনীর, কেহ বা বেনের, কেহ বা নাপিতের আবার কেহ বা মরা জন্তুর চর্ম-উন্মোচনকারী চামারের কাজ করিতে করিতে মুক্ত পুরুষের পদবী লাভ করিয়াছেন।

এইরূপ যে দিব্য কর্মযোগের ব্রত, তাহা হইতে মানুষ দুই কারণে চ্যুত হয়। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের বিশেষ স্বভাবের কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা "এ চাই, ও চাই না"—এই দ্বন্দ্বের ফেরে ঘুরপাক খায়। যাহা কাম্য তার জন্য মনে রাগ অর্থাৎ অনুরাগ আর যাহা কাম্য নয় তার প্রতি জন্মে দ্বেষ। রাগদ্বেষ এবং কাম ক্রোধ এভাবে মানুষকে কুরিয়া কুরিয়া খায়। কর্মযোগ কতই না সুন্দর, রমণীয় আর অনন্ত ফলদায়ী! কিন্তু এই সব কাম, ক্রোধ, "এটা নাও, ওটা ছাড়" এই দ্বন্দ্ব আমাদের পিছনে লাগাইয়া রাখে, দিনরাত আমাদের জ্বালাতন করে। এই অধ্যায়ের অন্তে ভগবান 'ইহাদের সংস্রব ত্যাগ কর' —এইরূপ সতর্কতার ঘণ্টা বাজাইতেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ যেরূপ সংযমের মূর্তি কর্মযোগীকেও সেইরূপ হইতে হইবে।

রবিবার ৬. ৩. ১৯৩২

চতুর্থ অধ্যায়

কর্মযোগের সহকারী সাধনা : বিকর্ম

॥ ১৪ ॥ কর্মের সহিত বিকর্মের সহযোগ চাই

বন্ধুগণ,

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা নিষ্কাম কর্মযোগের বিবেচনা করিয়াছি। স্বধর্মাচরণ না করিয়া আমরা যদি অবান্তর ধর্ম আশ্রয় করি তবে নিষ্কামতারূপ ফল লাভ অসম্ভব। ব্যাপারীর স্বধর্ম স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় করা। কিন্তু এই স্বধর্ম ছাড়িয়া সে যখন সাত সমুদ্র পারের বিদেশী মাল বিক্রয় করে তখন তাহার মনে অধিক লাভের কথাই থাকে। তবে সেই কর্মে নিষ্কামতা কোথা হইতে আসিবে? অতএব কর্মকে নিষ্কাম করার জন্য স্বধর্মাচরণ একান্ত আবশ্যক। পরন্তু এই স্বধর্মাচরণও 'সকাম' হইতে পারে। অহিংসার কথাই ধরা যাক। অহিংসার উপাসকের কাছে হিংসা বর্জনীয়। কিন্তু বাহ্যত অহিংস হইয়াও বস্তুত সে হিংসাময় হইতে পারে। কারণ হিংসা মনের এক ধর্ম। কেবল বাহ্যত হিংসা-কর্ম না করিলেই যে মন অহিংস হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। তলোয়ার হাতে লইলে হিংসাবৃত্তির প্রকাশ অবশ্যই হয়, কিন্তু তলোয়ার ত্যাগ করিলেই মানুষ অহিংস হইল তাহা নয়। স্বধর্মাচরণের বেলাও ঠিক তাহাই। নিষ্কামতার জন্য পরধর্ম হইতে ত বাঁচিতেই হইবে! কিন্তু উহা নিষ্কামতার আরম্ভ মাত্র। অতটুকুতেই সাধ্য মিলিল তাহা নহে।

নিষ্কামতা মনের ধর্ম। মনের এই ধর্মের উৎপত্তির পক্ষে কেবল স্বধর্মাচরণরূপ সাধনই পর্যাপ্ত নহে। অন্য সাধনের আশ্রয়ও লইতে হয়। কেবল তেল-পলিতায় আলো জ্বলে না। তার জন্য আগুনের সংযোগ চাই। জ্যোতি হইলেই না অন্ধকার দূর হইবে। সেই জ্যোতি প্রজ্বালনের উপায় কী? তাহার জন্য মানসিক শুদ্ধির আবশ্যক। আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা চিত্তের মলিনতা, চিত্তের আবর্জনা ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ ভাগে ভগবান এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলিয়াছেন। তাহা হইতেই চতুর্থ অধ্যায়ের জন্ম হইয়াছে।

গীতায় 'কর্ম' শব্দ 'স্বধর্ম' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমরা আহার করি, পান করি, নিদ্রা যাই—এ সবই কর্ম। কিন্তু গীতার 'কর্ম' শব্দে এই সব ক্রিয়া সূচিত হয় না। কর্মের অর্থ সেখানে স্বধর্মাচরণ। কিন্তু এই স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম করার পরেও নিষ্কামতা প্রাপ্তির জন্য আরও এক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর সহায়তা আবশ্যক—তাহা হইতেছে কামক্রোধ জয় করা। চিত্ত যতক্ষণ পর্যন্ত গঙ্গাজলের মত নির্মল ও প্রশান্ত না হয় ততক্ষণ নিষ্কামতা আসে না। এইরূপ চিত্তশুদ্ধির জন্য যে সব কর্ম করা হয় গীতা তাহাকে 'বিকর্ম' সংজ্ঞা দিয়াছে। কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম চতুর্থ অধ্যায়ের এই তিনটি শব্দের গুরুত্ব খুব বেশী। কর্মের অর্থ স্বধর্মাচরণ-রূপ বাহ্যিক স্থূল ক্রিয়া। এই বাহ্যিক কর্মে চিত্ত সংযোগ করাকে 'বিকর্ম' বলে। বাহ্যত আমরা কাহাকেও নমস্কার করি। কিন্তু মস্তক অবনত করারূপ ঐ বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিত মনও যদি নত না হয় তবে ঐ নমস্কার নিরর্থক। ভিতর-বাহির এক হওয়া চাই। অনুক্ষণ জলধারা দিয়া আমি শিবলিঙ্গের অভিষেক করিতে পারি। ইহা বাহ্য ক্রিয়া। পরন্তু ঐ জলধারার সহিত যদি মানসিক চিন্তা ধারাও অখণ্ড প্রবাহিত না হয় তবে ঐ অভিষেকের মূল্য কি? সে স্থলে সম্মুখের ঐ শিবলিঙ্গও পাথর আর আমিও পাথর। পাথরের সামনে পাথর উপবিষ্ট—এই হইবে উহার অর্থ। নিষ্কাম কর্মযোগ কেবল তখনই সিদ্ধ হয় যখন বাহিরের স্থূল কর্মের সহিত চিত্তশুদ্ধিরূপ আমাদের আন্তরিক কর্মও যুক্ত হয়।

'নিষ্কাম কর্ম' শব্দে 'কর্ম' অপেক্ষা 'নিষ্কাম' পদের গুরুত্ব অধিক। 'অহিংস-অসহযোগ' শব্দ-যোজনায় যেমন 'অসহযোগ' অপেক্ষা 'অহিংস' বিশেষণেরই অধিক গুরুত্ব, ইহাও সেইরূপ। অহিংসা বাদ দিয়া যদি কেবল অসহযোগ করা হয় তবে তাহা এক ভয়ঙ্কর জিনিস হইতে পারে। তেমনি স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম করার সময়ে মনের বিকর্ম যদি তাহাতে যুক্ত না হয় তবে তাহা ধোঁকা মাত্র।

আজ যাহারা সার্বজনিক সেবা করিতেছে তাহারা স্বধর্মেরই আচরণ

করিতেছে। মানুষ যখন গরীব, কাঙ্গাল, দুঃখী ও বিপন্ন তখন তাহাদিগকে সেবা করিয়া সুখী করাই প্রবাহ-প্রাপ্ত ধর্ম। কিন্তু ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন যে যত লোক সার্বজনিক সেবা করিতেছেন তাঁহারা সকলেই কর্মযোগী। লোকসেবা করিতে গিয়া মনে যদি শুদ্ধ ভাবনা না থাকে তবে সে লোকসেবা এক ভয়ঙ্কর জিনিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিজ আত্মীয় পরিজনের সেবার সময় আমরা যতটা অহঙ্কার, যতটা দ্বেষ-মৎসর, যতটা স্বার্থ আদি বিকার সৃষ্টি করি লোকসেবার সময়ও আমরা ততটাই করি। উহার প্রত্যক্ষ দর্শন আজকালকার লোকসেবকদের সমাবেশ হইতেই পাওয়া যায়।

॥ ১৫ ॥ উভয়ের সংযোগে অকর্মের স্ফুরণ

কর্মের সহিত মনের সংযোগ হওয়া চাই। কর্মের সহিত মনের এই মিলনকে গীতা বিকর্ম বলে। বাহিরের স্বধর্মাচরণ সাধারণ কর্ম। আর অন্তরের এই কর্ম বিশেষ কর্ম। এই বিশেষ কর্ম নিজ নিজ মানসিক প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বিকর্মের এইরূপ অনেক প্রকারের কথা চতুর্থ অধ্যায়ে উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে। পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে উহার আরও বিস্তার করা হইয়াছে। এই বিশেষ কর্মের, এই মানসিক শুদ্ধির যোগ যখন আমরা করিব তখনই নিষ্কামতার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে। কর্মের সহিত যখন বিকর্মের মিলন হয় তখন আস্তে আস্তে নিষ্কামতা আমাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। যদি শরীর ও মন এই দুই পৃথক বস্তু হয় তবে সাধনও এই দুয়ের পৃথক পৃথক হইবে। এই দুইয়ের মিলন ঘটিলে সাধ্য আমাদের হাতে আসিয়া যায়। মন এক দিকে আর শরীর অন্য দিকে না যায় সে জন্য শাস্ত্রকারগণ দ্বিবিধ মার্গের কথা বলিয়াছেন। ভক্তিযোগে বাহিরে তপ ও ভিতরে জপের নির্দেশ আছে। উপবাসাদি বাহ্য তপস্যার সঙ্গে যদি অন্তরে মানসিক জপও না চলে তবে সমস্ত তপ ব্যর্থ হইয়া যায়। যে ভাবনা হইতে তপ করিতেছি সে ভাবনা অনুক্ষণ অন্তরে জ্বলিতে থাকা চাই। উপবাস শব্দের অর্থই হইল ভগবানের নিকট উপবেশন। পরমেশ্বরের কাছে আমাদের চিত্ত থাকুক এই উদ্দেশ্যে বাহ্য ভোগের দরজা বন্ধ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু বাহিরের

ভোগ বর্জন করিয়া মনে মনে যদি ভগবানের চিন্তা না করা হয় তবে সেই বাহ্য উপবাসের আর কি মূল্য রহিল ? ঈশ্বর চিন্তা না করিয়া সেই সময় যদি পানাহারের কথাই চিন্তা করা হয় তবে তাহা আরও ভয়ঙ্কর ভোজন হইয়া যাইবে। এই যে মানসিক ভোজন, মনে মনে বিষয় চিন্তন, ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর বস্তু আর নাই। তন্ত্রের সহিত মন্ত্র থাকা চাই। কেবল বাহ্য তন্ত্রের কোন মূল্য নাই। আবার কেবল কর্মহীন মন্ত্রেরও কোন গুরুত্ব নাই। হস্ত এবং হৃদয় উভয়ের দ্বারাই সেবা হওয়া চাই। তবেই আমাদের দ্বারা খাঁটি সেবা হইতে পারিবে।

কর্মের সহিত হৃদয়ের আর্দ্রতা যদি যুক্ত না হয় তবে সেই স্বধর্মাচরণ শুষ্ক থাকিয়া যাইবে। উহাতে নিষ্কামতার ফুল-ফল ধরিবে না। মনে করুন কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষার কাজ আরম্ভ করা হইল। ঐ সেবা কার্যের সহিত যদি কোমল দয়াভাব যুক্ত না হয় তবে ঐ রোগী-সেবা নীরস মনে হইবে এবং তাহা অরুচিকর ও বোঝাস্বরূপ বোধ হইবে। রোগীর কাছেও সেই সেবা ভার মনে হইবে। ঐ শুশ্রূষায় যদি মনের সহযোগ না থাকে তবে সেই সেবা হইতে অহঙ্কার জন্মিবে। আমি আজ উহার কাজ করিলাম, উহারও আমার কাজ করা উচিত। উহার আমাকে প্রশংসা করা উচিত। আমাকে লইয়া লোকের গৌরব করা উচিত ইত্যাদি ভাব মনে জন্মিবে। অথবা আমরা অতিষ্ঠ হইয়া বলিব এত সেবা করিতেছি তবুও রোগী খিটমিট করে। অসুস্থ লোক এমনিই খিটখিটে হয়। তাহার এই খিটখিটে স্বভাবে সেবাভাবরহিত সেবক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।

কর্মের সহিত যখন আন্তরিক ভাবের মিলন হয় তখন তাহা এক বিশিষ্টতা লাভ করে। তেল ও পলিতার সহিত জ্যোতির সংযোগে আলোর উৎপত্তি হয়। কর্মের সহিত বিকর্মের মিলনে নিষ্কামতা আসে। বারুদে বাতির সংযোগ হইলে বিস্ফোরণ ঘটে। ঐ বারুদে তখন এক শক্তির সৃষ্টি হয়। কর্মকে বন্দুকের বারুদ মনে কর। উহাতে বিকর্মের বাতি বা অগ্নির সংযোগ হইলে কর্মে সিদ্ধি। যতক্ষণ উহাতে বিকর্মের সংযোগ না ঘটে ততক্ষণ ঐ কর্ম স্থূল। উহা চৈতন্যহীন। বিকর্মের ফুল্‌কি পড়ামাত্রই উহাতে বর্ণনাতীত সামর্থ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক চিমটি বারুদ পকেটে

নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া আছে বা হাতে নাড়াচাড়া করা হইতেছে, কিন্তু উহাতে আগুনের সংযোগ হইয়াছে কি শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে। স্বধর্মাচরণের মধ্যে তেমনি অনন্ত শক্তি লুকানো আছে। উহাতে বিকর্মের সংযোগ করুন, দেখিবেন কিরূপ ভাঙ্গাগড়া শুরু হইয়া যায়। উহার স্ফুরণে অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ আদি ভস্ম হইয়া যাইবে এবং পরমজ্ঞানের (পরম প্রশ্নের) সমাধান হইয়া যাইবে।

কর্ম জ্ঞানের ইন্ধন (জ্বালানি)। কাঠের বড় একটা কুঁদা পড়িয়া আছে, উহাতে আগুন ধরাইয়া দিন। উহা জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হইবে। ঐ কাঠ আর ঐ আগুনে কত পার্থক্য ! কিন্তু ঐ কাঠেরই ত ঐ আগুন। কর্মে বিকর্মের সংযোগ হইলে কর্ম দিব্যরূপ ধারণ করে। মা সন্তানের পিঠে হাত বুলান। পিঠ ত সেই একই। মা যেমন তেমন ভাবে একবার হাত বুলাইলেন। কিন্তু ঐ এক সামান্য ক্রিয়াতে মা ও সন্তানের মনে যে ভাব খেলিয়া গেল তাহার বর্ণনা করিবে কে ? এতটা লম্বা-চওড়া পিঠে এত ওজনের কোমল হাত বুলাইলে এতটা আনন্দ সৃষ্টি হইবে এই হিসাব যদি কেহ করিতে বসে ত তাহা হইবে তামাসা মাত্র। হাত-বুলানোরূপ ঐ ক্রিয়া নিতান্তই সাধারণ কিন্তু উহাতে ঢালা হইয়াছে মায়ের হৃদয়। বিকর্ম ঢালা হইয়াছে বলিয়াই উহাতে এত আনন্দ ! তুলসীরামায়ণে একটি প্রসঙ্গ আছে। রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বানরেরা শিবিরে আসিয়াছে। সারা গায়ে জখম হইয়াছে। গা হইতে রক্ত ঝরিতেছে। কিন্তু প্রভু রামচন্দ্রের একটিমাত্র দৃষ্টিপাতে বানরদের যাতনা কোথায় দূর হইয়া গেল !

রাম কৃপা করি চিতবা সবহী।
ভয়ে বিগতশ্রম বানর তবহী ॥

ধরুন কোন লোক রামের সেই সময়কার চোখের ও চাহনির ফটো লইয়া ততটাই চক্ষু বিস্তার করিয়া কাহারও দিকে তাকাইয়াছে, তাহাতে কি ঐরূপ ফল হইবে ? ঐ প্রকার চেষ্টা হাস্যকর।

কর্মের সহিত বিকর্মের সংযোগ হইলে শক্তির স্ফুরণ হয়। আর তাহা হইতে অকর্মের উৎপত্তি হয়। কাঠ পুড়িয়া ছাই হয়। প্রথমে ছিল এতবড়

একখণ্ড কাঠ, কিন্তু হইয়াছে তাহা এক মুষ্টি নিস্তেজ ছাই ! যেমন ইচ্ছা হাতে নিন, আর গায়ে মাখুন। কর্মে বিকর্মের জ্যোতি স্পর্শ হইলে অকর্ম হয়। কোথায় কাঠ আর কোথায় ছাই ! কঃ কেন সম্বন্ধঃ ! উহাদের গুণধর্মে এখন আদৌ সমতা নাই। কিন্তু সেই কাঠেরই যে এই ছাই তাহাতে সংশয় নাই।

কর্মে বিকর্ম ঢালিলে অকর্ম হয়, একথার অর্থ কি ? অর্থ এই যে, কর্ম যে করিয়াছি তাহা মনেই হয় না। কর্ম তখন বোঝা মনে হয় না। করিয়াও অকর্তা। গীতা বলে, মারিয়াও তুমি মার না। মা পুত্রকে মারেন। তুমি একটু মারিয়া দেখ ত। ছেলে তোমার মারধর সহ্য করিবে না। মা মারেন, তবুও তাঁহার আঁচলেই সে মুখ লুকায় ; কারণ মার বাহ্যিক কর্মে চিত্তের শুদ্ধতা যুক্ত আছে। মায়ের প্রহার নিষ্কাম। ঐ কর্মে তাঁহার স্বার্থ নাই। বিকর্মের দরুণ, চিত্তশুদ্ধি হেতু কর্মের কর্মত্ব উড়িয়া যায়। রামের সেই চাহনি আন্তরিক বিকর্মের দরুণ পবিত্র প্রেমসুধা-সাগর হইয়া গিয়াছিল। ঐ কর্মে রামের কোন শ্রম হয় নাই। চিত্তশুদ্ধি হইতে কৃত কর্ম আসক্তিশূন্য হয়। তাহার পাপপুণ্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। নতুবা কর্মের কতই না বোঝা আমাদের বুদ্ধির উপর—হৃদয়ের উপর চাপিত। কাল সব রাজনৈতিক বন্দীদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এই কথা যদি আজ দুইটায় রটে ত দেখিতে পাইবেন কেমন দৌড়ঝাঁপ শুরু হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে কেমন শোরগোল আরম্ভ হইয়াছে। কর্মের ভালমন্দের জন্য আমরা ব্যগ্র থাকি। কর্ম চারিদিক হইতে আমাদের ঘিরিয়া ধরে। কর্ম যেন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। সমুদ্রের প্রবাহ সজোরে ভূমিতে প্রবেশ করিয়া যেমন খাড়ি সৃষ্টি করে, কর্মের জঞ্জাল চিত্তে প্রবেশ করিয়া তেমনি ক্ষোভ সৃষ্টি করে। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব জন্মায়। সকল শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে আর চলিয়াও গিয়াছে। কিন্তু উহার বেগ থাকিয়া গিয়াছে, কর্ম চিত্তের উপর আসর জমাইয়া রাখে। আর উহা কর্তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়।

কিন্তু কর্মে বিকর্ম জুড়িয়া দিন। দেখিবেন যত কর্মই করা হউক না কেন ক্লান্তি নাই। মন তখন ধ্রুব নক্ষত্রের মত শান্ত, স্থির ও তেজোময়।

কর্মে বিকর্ম ঢালিলে উহা অকর্ম হইয়া যায়। কর্ম করিয়া যেন তাহা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে।

॥ ১৬ ॥ অকর্মের কৌশল সন্তদের নিকট শিক্ষণীয়

এই কর্ম অকর্ম হয় কিরূপে? ইহার কৌশল কাহার কাছে পাওয়া যাইবে? সন্তদের কাছে। এই অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলিতেছেন, "সাধুদের কাছে গিয়ে বস ও শিক্ষা গ্রহণ কর।" কর্ম কিরূপে অকর্ম হয় তাহা বর্ণনা করিতে ভাষা নিঃশেষ হইয়া যায়। উহার সম্পূর্ণ ধারণা পাইতে হইলে সন্তদের কাছে যাইতে হইবে। পরমেশ্বরের বর্ণনাও ত এইরূপ—

"শান্তাকারং ভুজগশয়নম্।"

পরমেশ্বর সহস্র-ফণা শেষনাগের উপর শায়িত তবুও শান্ত। তেমনি সাধুরা সহস্র কর্ম করিলেও নিজেদের মানস সরোবরে রতিভর ক্ষোভতরঙ্গও উঠিতে দেন না। এই বিশেষত্ব সাধুসংসর্গ বিনা বোঝার কোন উপায় নাই।

বর্তমান কালে বই সস্তা হইয়া গিয়াছে। আনা, দুই আনায় গীতা, মনাচে শ্লোক* পাওয়া যায়। গুরুর অভাব নাই। শিক্ষা বহুল-বিস্তৃত ও সুলভ। বিদ্যাপীঠ জ্ঞানের প্রসাদ বিতরণ করিতেছে। কিন্তু তবুও কেহ জ্ঞানামৃত ভোজনের উদ্গার ত তোলে না। পুস্তকের এই পর্বত দেখিয়া সাধুদের নিকট যাওয়ার আবশ্যকতা দিন দিন অধিক অনুভূত হইতেছে। পুস্তকের মজবুত কাপড়ের বাঁধাইর বাহিরে জ্ঞান দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি 'অভঙ্গ' সতত আমার মনে পড়ে:

কাম ক্রোধ আড় পড়িলে পর্বত।
রাহিলা অনন্ত পৈলীকডে॥

"কামক্রোধরূপী পাহাড়ের পরপারে নারায়ণ বিরাজ করেন।" জ্ঞানরাজও সেইরূপ ঐ পুস্তকরাশির পিছনে লুকাইয়া আছেন। পুস্তকালয় ও গ্রন্থাগারে চারিদিক ছাইয়া গেলেও দেখা যাইতেছে, মানুষ সর্বত্র সংস্কার-হীন, জ্ঞানহীন বানরই রহিয়া গিয়াছে। বরোদায় প্রকাণ্ড এক লাইব্রেরী আছে। একবার জনৈক ভদ্রলোক হাতে একখানি বেশ মোটা বই

---

* সমর্থ রামদাসকৃত মারাঠী গ্রন্থ।

লইয়া যাইতেছিলেন, বইখানিতে অনেক ছবি ছিল। ভদ্রলোক মনে করিয়াছিলেন বইখানি ইংরেজী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বই ওখানি?" তিনি বইখানি বাড়াইয়া দিলেন। বলিলাম, "এ যে ফ্রেঞ্চ্"! ভদ্রলোক বলিলেন, "ও, ফ্রেঞ্চ্ এসে গেছে?" পরম পবিত্র রোমান লিপি, সুন্দর ছবি, উত্তম বাঁধাই। জ্ঞানের আর তবে কমতি কোথায়!

ইংরেজী ভাষায় প্রতি বছর হাজার দশেক নূতন বই ছাপা হয়। অন্য ভাষা সম্পর্কেও ঐ কথা খাটে। জ্ঞানের এরূপ প্রসার সত্ত্বেও মানুষের মগজ আজও এরূপ শূন্য কেন? কেহ বলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কেহ বা বলে একাগ্রতার অভাব। অবার কেহ বলে, লোকে যাহা কিছু পড়ে সবই সত্য মনে করে। বিচার করার অবসর পায় না, একথাও শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "অর্জুন, অনেক শুনতে শুনতে তোমার বুদ্ধি ভ্রম হয়েছে। তা যতক্ষণ স্থির না হচ্ছে ততক্ষণ তোমার যোগপ্রাপ্তি হবে না। শোনা এবং পড়া বন্ধ করে সাধুর শরণ লও। সেখানে জীবনগ্রন্থ পড়তে পাবে। সেখানকার 'মৌন ব্যাখ্যান' শুনে তুমি 'ছিন্ন-সংশয়' হবে। সেখানে গেলে দেখতে পাবে নিরন্তর সেবাকার্য করেও মন কি ভাবে পূর্ণ শান্ত থাকে, কর্মের আবর্তের মধ্যেও হৃদয়ে সেতারের তান কেমন অখণ্ড ঝঙ্কৃত হতে থাকে।"

রবিবার, ১৩-৩-১৯৩২

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বিবিধ অকর্মাবস্থা : যোগ ও সন্ন্যাস

॥ ১৭ ॥ বাহ্য কর্ম মনের দর্পণ

বন্ধুগণ,

সংসার বড় ভয়ানক স্থান। অনেক সময় সমুদ্রের সহিত উহার তুলনা করা হয়। সমুদ্রের যে দিকে তাকান জল আর জল, সংসারও তেমনি। সংসার সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে। ঘরদোর ছাড়িয়া কেহ দেশের কাজে লাগিয়াছে ত সেখানেও সংসার তাহার মনে আড্ডা গাড়ে। পর্বতগুহায় গিয়াছে ত সেখানেও বিঘত প্রমাণ নেংটিতে সংসার ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। নেংটিতেই তখন তাহার সমস্ত আসক্তি জমাট বাঁধে। এতটুকু নোটে যেমন হাজার টাকা থাকে, ঐ ছোট্ট নেংটি তেমন অপার আসক্তির আধার হয়। ঘর-সংসার ভাঙ্গিলাম, ঝঞ্ঝাট কমাইলাম, সংসার যে তাহাতে কমিল তাহা নয়। দশের পঁচিশই বলুন আর দুইয়ের পাঁচই বলুন, কথা একই। ঘরে থাকুন কি বনে, আসক্তি সঙ্গেই আছে। সংসার এক কণাও কমে না। দুইজন যোগী হিমালয়ের গুহায় গিয়া বসিল। একে অন্যের প্রশংসার কথা শুনিলে সেখানেও তাহারা জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরে। সার্বজনীন ক্ষেত্রেও এই দৃশ্য দেখা যায়।

এই প্রকারে এই সংসার প্রপঞ্চ এমনই নাছোড়বান্দা হইয়া আমাদের পিছনে লাগিয়া আছে। সেইজন্য স্বধর্মাচরণের সীমার মধ্যে থাকিলেও সংসারের হাত হইতে আমাদের অব্যাহতি নাই। অনেক ছুটোপাটি কমাইয়াছি, কর্মের বিস্তার ছোট করিয়াছি, সংসারপ্রপঞ্চ ছোট করিয়া লইয়াছি তবুও তাহাতেই সমস্ত মমত্ব জমা হইয়া থাকে। রাক্ষস যেমন কখনও ছোট হয় কখনও বড় হয়, এই সংসারের অবস্থাও তেমনি। ছোটই হোক বা বড়ই হোক রাক্ষস তো রাক্ষসই। প্রাসাদেই থাকুক বা কুঁড়েতেই থাকুক উহার দুর্নিবারত্ব একই থাকে। স্বধর্মের রেখা টানিয়া সংসারকে যদি সীমাবদ্ধ কর তবুও সেখানে বহু ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি

হইবে এবং তোমার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। সেখানেও অনেক পরিবার ও অনেক লোকের সহিত তোমার সম্বন্ধ সৃষ্টি হইবে আর তুমি হাঁপাইয়া উঠিবে। মনে হইবে কেন এই ঝঞ্ঝাটে পড়িতে গেলাম। এই সবও তোমার মন যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। কেবল স্বধর্মাচরণের দ্বারাই অলিপ্ততা আসে না। কর্মের ব্যাপ্তি কম করার মানে অলিপ্ত হওয়া নয়।

তবে অলিপ্ততা লাভের উপায় কি? তাহার জন্য মনোময় প্রযত্ন চাই। মনের সহযোগ যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না। মা-বাপ ছেলেকে কোন প্রতিষ্ঠানে রাখিয়াছে। সেখানে সে ভোরে ওঠে, সূর্য নমস্কার করে, চা খায় না। কিন্তু দেখা যায় ঘরে আসিতেই দুই দিনে সব পাল্টাইয়া যায়। মানুষ মাটির তাল নয়। তাহার মনকে যে রূপ দিতে চাই তাহা যদি তাহার মন গ্রহণ করে, তবে না? মন যদি উহা গ্রহণ না করে তবে বাহিরের সব চেষ্টাই বৃথা। সেইজন্য সাধনার ক্ষেত্রে মানসিক সহযোগিতার আবশ্যকতা এত বেশী।

সাধন হিসাবে বাহ্য 'স্বধর্মাচরণ এবং ভিতর হইতে মনের বিকর্ম এই দুই বস্তুই চাই। বাহ্য কর্মের আবশ্যকতা ত আছেই। কর্ম না করিলে মনের পরীক্ষা হয় না। সকালবেলার প্রশান্ত সময়ে মনে হয় আমাদের মন খুব শান্ত। কিন্তু শিশু একটু কাঁদিয়াছে অমনি সেই মনের শান্তির মূল্য যে কি তাহা ধরা পড়ে। বাহ্য কর্ম এড়াইয়া গেলে কাজ চলিবে না। বাহ্য কর্মে আমাদের মনের স্বরূপ প্রকাশ হয়। জলের উপরিভাগ দেখিতে পরিষ্কার। কিন্তু জলে পাথর ফেলুন। জল নড়িয়া উঠিলেই তলাকার ময়লা উপরে ভাসিয়া উঠিবে। আমাদের মনের দশাও ঐ। মনের অন্তঃসরোবরে হাঁটু সমান ময়লা জমিয়া আছে। বাহ্য বস্তুর সহিত সংস্পর্শমাত্র তাহা উপরে ভাসিয়া ওঠে। আমরা বলি সে চটিয়াছে। এই ক্রোধ কি বাহির হইতে আসিয়াছে? উহা ত অন্তরেই ছিল। মনে যদি না থাকিত তবে বাহিরেও দেখা যাইত না।

লোকে বলে, "সাদা খদ্দর চাই না। ময়লা হয়ে যায়। রঙ্গীন কাপড় ময়লা হয় না।" তাহাও ময়লা হয়, কেবল দেখা যায় না। সাদা খাদি ময়লা হইলে বুঝা যায়। উহা বলে, "ময়লা হয়ে গেছি, কেচে

নাও।” এরূপ বলে বলিয়া লোকে তাহা চায় না। এই ভাবে আমাদের কর্মও কথা বলে। কর্ম বলিয়া দেয় আমরা রাগী কিনা, স্বার্থপর কিনা বা আর কিছু কিনা। কর্ম সেই দর্পণ যাহাতে আমাদের স্বরূপ দেখা যায়। তাই কর্মের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা চাই। আয়নায় যদি আমাদের মুখ নোংড়া দেখায় তবে কি আয়না ভাঙ্গিয়া ফেলিব? না, হওয়া ত চাই উহার প্রতি কৃতজ্ঞ। মুখ ধুইয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করিয়া পুনরায় দেখিব। এইরূপে কর্মের দ্বারা আমাদের মনের ত্রুটি-মলিনতা যদি বাহিরে ধরা পড়ে তবে কি কর্ম হইতে দূরে থাকিব? ঐ কর্ম ত্যাগ করিলে কি মন নির্মল হইবে? সুতরাং কর্ম করিতে হইবে আর নির্মল হওয়ার জন্য উত্তরোত্তর অধিক চেষ্টা করিতে হইবে।

কোন লোক গুহায় গিয়া বসে। সেখানে কাহারও সম্পর্কে তাহাকে আসিতে হয় না। তাহার মনে হয় এখন সে পুরাপুরি শান্তবুদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু গুহা ছাড়িয়া ভিক্ষার জন্য কোন গৃহস্থের বাড়ী সে যাক্। সেখানে খেলায় মত্ত কোন শিশু হয়ত দরজার শিকলটা খটখট করিয়া বাজাইতেছে সেই বালব্রহ্ম তখন নাদব্রহ্মে লীন। কিন্তু ঐ নিষ্পাপ শিশুর শিকল-বাজানো-রূপ ক্রিয়া ঐ যোগীর কাছে অসহ্য হইয়া উঠে। সে বলিয়া বসে, “আঃ, কি খটখট করছে ছেলেটা!” গুহায় থাকিয়া সে মনকে এত দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে যে যৎসামান্য ধাক্কা ও সহ্য করিতে পারে না। খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল অমনি তার শান্তি ভঙ্গ হইয়া গেল। মনের এই দুর্বল ভাব আদৌ ভাল নয়।

তাৎপর্য এই যে নিজের মনের স্বরূপ বোঝার জন্য কর্ম করা একান্ত আবশ্যক। দোষ দেখা গেলে তবে না উহা দূর করা যায়; দোষ ধরা না পড়িলে প্রগতি বন্ধ হয়, বিকাশ থামিয়া যায়। কর্ম করিলেই না দোষ ধরা পড়িবে। তাহা দূর করার জন্য বিকর্মের আশ্রয় লইতে হয়। অন্তরে রাতদিন এইরূপ বিকর্মের প্রযত্ন চলিতে থাকে ত স্বধর্মের আচরণ করিয়াও কিরূপে অলিপ্ত থাকা যায়, কামক্রোধ লোভমোহের অতীত হওয়া যায় তাহা যথাসময়ে বুঝা যাইবে। কর্মকে নির্মল করার জন্য যখন অবিরাম চেষ্টা শুরু হয়, তখন আপনা হইতেই কর্ম নির্মল হইতে থাকে। নির্বিকার

কর্ম যখন একের পর এক সহজভাবে হইতে থাকে তখন টেরই পাওয়া যায় না কর্ম কখন হইয়া গেল। কর্ম যখন সহজ হইয়া যায় তখনই কর্ম অকর্ম হইয়া পড়ে। সহজ কর্মকেই যে অকর্ম বলা হয় তাহা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিয়াছি। কর্ম কিভাবে অকর্ম হয় তাহা সাধু পুরুষের চরণপ্রান্তে গেলে বুঝা যাইবে, একথাও চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ অংশে ভগবান বলিয়াছেন। এই অকর্ম-স্থিতির বর্ণনা করিতে বাণী অসমর্থ।

॥ ১৮ ॥ অকর্ম-দশার স্বরূপ

সহজ কর্মের একটি পরিচিত উদাহরণ লইতেছি। শিশু চলিতে শিখে ; প্রথমে কতই না অসুবিধা হয়। তাহার এই লীলা আমাদের আনন্দ দেয়। আমরা বলি "দেখ, খোকা চলতে শিখেছে।" কিন্তু পরে ঐ চলা সহজ হইয়া যায়। চলিতে চলিতে কথাও বলিতে থাকে, চলার দিকে তখন লক্ষ্যই থাকে না। এই কথা খাওয়া সম্বন্ধেও খাটে। শিশুর অন্নপ্রাশন আমরা করি। খাওয়া যেন এক মহাব্যাপার। কিন্তু পরে খাওয়া সহজ কর্ম হইয়া যায়। লোকে যখন সাঁতার কাটিতে শিখে তখন খুব কষ্ট হয়। প্রথম প্রথম দম ফুরাইয়া যায়। কিন্তু পরে হয় উল্টা। অন্য কাজ করিয়া ক্লান্ত হইলে আমরা বলি, "চল, একটু সাঁতার কাটা যাক। ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।" সাঁতার-কাটা তখন আর কষ্টের কাজ থাকে না। শরীর সহজভাবে জলের উপর চলাফেরা করে। শ্রমশীল হওয়া মনের ধর্ম। মন যখন ঐ সব কর্মে ব্যস্ত থাকে তখন শ্রম মনে হয়। কিন্তু কর্ম যখন সহজ ভাবে হইতে থাকে তখন আর উহা বোঝা বলিয়া বোধ হয় না। কর্ম যেন অকর্মে পরিণত হয়। কর্ম আনন্দময় হইয়া যায়।

কর্মকে অকর্মে পরিণত করা আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম করিতে হয়। উহা করিতে করিতে দোষ দেখা দিবে। দোষ দূর করার জন্য বিকর্মের আশ্রয় লইতে হইবে। আর এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে মন এমন অভ্যস্ত হইয়া যাইবে যে কর্মের ব্যস্ততা বা কষ্টবোধ আদৌ থাকিবে না। হাত দিয়া হাজার রকমের কর্ম নিষ্পন্ন হইতে থাকিলেও মন নির্মল ও শান্ত থাকিবে। আকাশকে জিজ্ঞাসা করুন, "ভাই আকাশ, গরমে তুমি ঝল্‌সে যাও না, বর্ষায় ভিজে যাও না, শীতে

কাঁপ না?" আকাশ কি বলিবে? বলিবে "আমার কি হয় না হয় তা তুমি ঠিক কর। আমি কিছু জানি না।"

পিসেঁ নেসলেঁ কীঁ নাগবেঁ।
লোকীঁ যেউন জাণাবেঁ॥

—পাগল উলঙ্গ কি কাপড় পরিয়া আছে তাহা নির্ণয় করিবে লোকে। পাগলের সে বোধ নাই।

ইহার ভাবার্থ এই যে, স্বধর্মাচরণ সম্বন্ধীয় কর্ম বিকর্মের সহায়তায় নির্বিকার করার অভ্যাসের ফলে ক্রমে ক্রমে উহা স্বাভাবিক হইয়া যায়। বড় বড় কঠিন সমস্যাও তখন আর কঠিন মনে হয় না। এমনই কর্মযোগের এই চাবি। চাবি ছাড়া তালা খুলিতে গেলে হাতে ফোসকা পড়ে। কিন্তু চাবি পাইলে মুহূর্তে তালা খুলিয়া যায়। কর্মযোগের এই চাবির সহায়তায় সকল কর্ম নির্ঝঞ্ঝাট মনে হইবে। এই চাবি মনোজয় হইতে লাভ করা যায়। অতএব মন জয় করিবার নিরন্তর চেষ্টা করিতে হইবে। কর্ম করিতে গিয়া যে মনের ময়লা দেখা যাইবে তাহা ধুইয়া ফেলার প্রযত্ন করা চাই। সে অবস্থায় বাহ্য কর্মকে ঝঞ্ঝাট মনে হইবে না। কর্মের অহঙ্কারও মিটিয়া যাইবে। কামক্রোধের বেগ নষ্ট হইবে। ক্লেশ অনুভব হইবে না। কর্ম যে করা হইতেছে তাহা কর্মী টেরও পাইবে না।

কোন এক ব্যক্তি এক সময়ে আমাকে লিখে, "অমুকে এতবার নাম জপ করবেন। তুমি এতে যোগ দাও এবং জানাও যে কতবার জপ করবে।" নিজের বুদ্ধি অনুসারে সে ব্যক্তি ব্যবস্থা করিতেছিল। তাহাকে দোষ দেওয়ার জন্য একথা বলিতেছি না। কিন্তু রামনাম তো কোন মাপ জোপের ব্যাপার নয়। মা সন্তানের সেবা করেন। তিনি কি তার রিপোর্ট ছাপেন? যদি ছাপিতেন তবে 'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলিয়া আমরা ঋণমুক্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু মা রিপোর্ট লিখেন না। তিনি বলেন, "কি আর করেছি, কিছুই ত করি নি। এ কি আমার কাছে বোঝা!" বিকর্মের সাহায্যে মন নিবিষ্ট করিয়া, হৃদয় ঢালিয়া দিয়া মানুষ যখন কর্ম করে তখন তাহা কর্ম থাকে না। তাহা অকর্ম হইয়া যায়। তখন ক্লেশ, কষ্ট, কঠিনতা —কিছুই থাকে না।

এই অবস্থার বর্ণনা করা যায় না। একটা অস্পষ্ট কল্পনা করা যায় মাত্র। সূর্য ওঠে। কিন্তু একথা কি সে ভাবে যে এখন আমি অন্ধকার দূর করিব, পাখিদের উড়িতে প্রেরণা দিব, লোকদের কর্মে প্রবৃত্ত করিব? সূর্য ওঠে। তার অস্তিত্বমাত্রই বিশ্বকে গতি দান করে। কিন্তু সূর্যের তাহা জানা নাই। আপনি যদি বলেন, "হে সূর্যদেব, আপনার অশেষ অনুগ্রহ। কত অন্ধকার আপনি দূর করে দিলেন"—ত সূর্য ধাঁধায় পড়িবে। সূর্য বলিবে, "এতটুকু অন্ধকার এনে আমায় দেখাও ত। তা যদি আমি দূর করতে পারি তখন বলব যে তা আমার কর্ম।" সূর্যের কাছে কি অন্ধকার লইয়া যাওয়া যায়? সূর্যের অস্তিত্ব মাত্রেই অন্ধকার দূর হইয়া যায়। কেহ তার আলোতে সদ্‌গ্রন্থ পড়ে, কেহ বা অসদ্‌গ্রন্থ। কেহ তার আলো দিয়া আগুন লাগায়, কেহ বা কাহারও উপকার করে। কিন্তু এই পাপপুণ্যের দায়িত্ব সূর্যের নয়। সূর্য বলে, "আলো আমার সহজ ধর্ম। আমার কাছে যদি আলো না থাকে ত থাকবে কি? আমি যে আলো দিই তা আমি জানিই না। আমার অস্তিত্বই আলো। আলো দেওয়ায় কোন কষ্ট আমার নাই। আমি বুঝতেই পারি না আমি কিছু করছি।"

সূর্যের আলোক দান যেমন স্বাভাবিক কর্ম, সাধুদের অবস্থাও তেমনি। সূর্যের থাকা মানেই আলোক দান করা। জ্ঞানী পুরুষকে বলুন, "মহাত্মন, আপনি সত্যবাদী।" তিনি বলিবেন, "সত্যপথে চলব না ত করব কি? আমি বিশেষ কি করছি?" জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে অসত্যতা হইতেই পারে না।

অকর্মেরও ভূমিকা এইরূপ। ক্রিয়াসমূহ এমন নৈসর্গিক ও স্বাভাবিক ভাবে হইয়া যায় যে, কখন তাহা আরম্ভ হয় আর কখন শেষ হয় তাহা টেরও পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার কাজে সহজে অভ্যস্ত হইয়া যায়। স্বাভাবিক কথা বলাই তখন সহজ উপদেশ হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় কর্ম অকর্ম হইয়া যায়। জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে সৎকর্ম স্বাভাবিক হইয়া যায়। কলরব করা পাখির সহজ-ধর্ম। মার কথা মনে হওয়া শিশুর সহজ-ধর্ম। তেমনি ঈশ্বরের কথা মনে হওয়া সাধুদের সহজ-ধর্ম। ভোর হইলে 'কুঁকুড়-কু' করা মোরগের সহজ-ধর্ম। স্বরের জ্ঞান দিতে গিয়া ভগবান পাণিনি মোরগের

ডাকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পাণিনির সময় হইতে আজও মোরগ ডাকে। তাই বলিয়া কেহ কি তাহাকে মানপত্র দিয়াছে? মোরগের উহা সহজ-কর্ম! সেইরূপ সত্য বলা, জীবমাত্রের প্রতি দয়া করা, কাহারও দোষক্রটি না দেখা, সেবা করা ইত্যাদি সৎপুরুষের কর্ম। এই সকল কর্ম সহজভাবে হইতে থাকে। এসব না করিয়া তাঁহার উপায় নাই। কেহ আহার করিলে কি আমরা তাহার যশ গান করি? পান, আহার, নিদ্রা যেমন সংসারী জীবের সহজকর্ম তেমনি সেবাকর্ম জ্ঞানীদের সহজকর্ম। উপকার করা তাঁহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। "উপকার করিব না" জ্ঞানীদের পক্ষে একথা বলা অসম্ভব। এইরূপ জ্ঞানী পুরুষেরকর্ম অকর্ম অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থাকে 'সন্ন্যাস' নামক অতি পবিত্র পদবীতে ভূষিত করা হইয়াছে। সন্ন্যাসই পরম ধন্য অকর্ম-দশা। এই দশাকে 'কর্মযোগ'ই বলা উচিত। কর্ম করিতেছে বলিয়া উহা **যোগ**, এবং করিতেছে এই বোধ থাকে না বলিয়া উহা **সন্ন্যাস**। সে এরূপভাবে কর্ম করে যে কর্মের ছোপ তাহাতে লাগে না। তাই উহা 'যোগ' আর করিয়াও কিছু করে না তাই উহা 'সন্ন্যাস'।

॥ ১৯ ॥ অকর্মের এক দিক : সন্ন্যাস

সন্ন্যাসের কল্পনা কিরূপ? কিছু কাজ ছাড়িতে হইবে, কিছু কাজ করিতে হইবে ইহাই কি তাহার স্বরূপ? না, তাহা নহে। সকল কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে ইহাই বস্তুত সন্ন্যাসের সংজ্ঞা। সর্ব কর্ম হইতে মুক্ত হওয়া, কিঞ্চিৎ মাত্র কর্ম না করা—ইহার নাম সন্ন্যাস। কিন্তু কর্ম না করার মানে কি? কর্ম অতীব বিচিত্র বস্তু। সকল কর্ম সন্ন্যাস হইবে কিরূপে? কর্ম ত আগে পিছে, আশেপাশে সর্বত্র বিদ্যমান। বসিলেন তাহাও ত ক্রিয়া। 'বসা' একটি ক্রিয়াপদ। কেবল ব্যাকরণের দৃষ্টিতেই উহা ক্রিয়া নয়, সৃষ্টি-শাস্ত্রেও 'বসা' ক্রিয়া। সর্বদা বসিয়া থাকিলে পায়ে ব্যথা হয়। বসিয়া থাকিলেও শ্রম হয়। যেখানে 'না করা'ও কর্ম হইয়া যায় সেখানে কর্মসন্ন্যাস হইবে কিরূপে? ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জুন ভয় পাইলেন, ভীত হইয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন। কিন্তু চক্ষু মুদিয়া রহিলেন ত ভিতরেও

দেখিতে লাগিলেন। চক্ষু বুজিলেও যাহা দেখা যায় তাহা হইতে বাঁচার উপায় কি? না করিলেও যাহা হয় তাহা দূরে ঠেলা যায় কি ভাবে?

একটি লোকের কথা। তাহার নিকটে অনেক দামী গহনা ছিল। বড় একটা সিন্দুকে তাহা সে বন্ধ করিয়া রাখিবে ঠিক করিল। চাকর বেশ বড় দেখিয়া একটা লোহার সিন্দুক বানাইয়া আনিল। তাহা দেখিয়া সে বলিল, "বোকা কোথাকার! সৌন্দর্যের বোধ আদৌ যদি থাকে! এমন মূল্যবান সুন্দর গহনা থাকবে এরূপ বিশ্রী লোহার সিন্দুকে? সোনার ভাল সিন্দুক তৈরি করে আন্।" চাকর সোনার সিন্দুক লইয়া আসিল। "তালাও সোনার আন্। সোনার সিন্দুকে সোনার তালাই মানায়।" লোকটি চাহিয়াছিল গহনা লুকাইয়া রাখিতে, ঢাকিয়া রাখিতে। কিন্তু সে যাহা করিল তাহাতে সে সোনা ঢাকিয়া রাখিল কি খুলিয়া রাখিল? চোরের খুঁজিতেই হইল না। সিন্দুক হাতাইল আর কাজ হাসিল করিল। তাৎপর্য, কর্ম না করাও এক প্রকার কর্ম করা। এইরূপ ব্যাপক যে কর্ম তাহার 'সন্ন্যাস' কিরূপে সম্ভব?

এরূপ কর্মের সন্ন্যাস করার রীতি হইতেছে, যে উপায় অবলম্বন করিলে সারা দুনিয়ার কর্ম করিলেও তাহা গলিয়া ধুইয়া যাইবে সেই উপায় অবলম্বন করা। এরূপ যখন হইতে পারিবে তখন বলা যাইবে যে 'সন্ন্যাস লাভ' হইয়াছে। কর্ম করিলেও তাহা নিঃশেষে ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে ইহা কিরূপ কথা? সূর্যের যেরূপ। সূর্য রাতদিন কর্ম করিতেছে। রাতেও সে কর্ম করে। তার আলো তখন দ্বিতীয় গোলার্ধে কাজ করে। কিন্তু এত কর্ম করিলেও, একথা বলা যায় যে সে কিছুই করে না। সেইজন্য চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন,—"এই যোগ আমি প্রথমে সূর্যকে শিখাই, তারপরে বিচারশীল, চিন্তাশীল মনু সূর্যের নিকট হইতে তা শেখে। চব্বিশ ঘণ্টা কর্ম করিয়াও সূর্য লেশমাত্র কর্ম করে না। এই স্থিতি সত্যসত্যই অদ্ভুত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

॥ ২০ ॥ অকর্মের দ্বিতীয় দিক : যোগ

কিন্তু ইহা ত সন্ন্যাসের এক দিক মাত্র। সে কর্ম করিয়াও কোন কর্ম করে না, ইহা সন্ন্যাসের এক দিক। সে কোন কর্মই করে না অথচ সমগ্র

জগৎকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, ইহা সন্ন্যাসের দ্বিতীয় দিক। ইহাতে অপরিসীম প্রেরক শক্তি থাকে। অকর্মের বিশেষত্বও ইহাই। অকর্মে অনন্ত কর্মের উপযোগী শক্তি ভরা থাকে। বাষ্পেরও এই অবস্থা নয় কি? বাষ্পকে আটকাইয়া রাখেন ত উহা প্রচণ্ড কর্ম করে। ঐ আবদ্ধ বাষ্পে অশেষ শক্তি আসিয়া যায়। উহা অনায়াসে বড় বড় জাহাজ, বড় বড় রেলগাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। সূর্যেরও এইরূপই অবস্থা। সে লেশমাত্রও কর্ম করে না। অথচ চব্বিশ ঘণ্টা একটানা কাজ করে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, "আমি কিছু করি না।" দিনরাত কর্ম করিয়া কিছু না করা যেমন সূর্যের এক দিক তেমনি কিছু না করিয়া দিনরাত অনন্ত কর্ম করা তাহার আর এক দিক। এই দুই প্রকারে সন্ন্যাস বিভূষিত।

দুইটিই অসাধারণ। একটিতে কর্ম প্রকট ও অকর্মাবস্থা গুপ্ত। অপরটিতে অকর্মাবস্থা প্রকট দেখা যায় কিন্তু তৎসাহায্যে অনন্ত কর্ম হইতে থাকে। এই অবস্থায় অকর্মে কর্ম কানায় কানায় ভরা থাকে। এই জন্য তাহা দ্বারা প্রচণ্ড কর্ম হয়। এই অবস্থায় যে পৌঁছিয়াছে তাহার আর কুঁড়ে লোকের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী। কুঁড়ে লোক ক্লান্ত হইবে, হাঁপাইয়া উঠিবে। কিন্তু এই অকর্মী সন্ন্যাসী কর্মশক্তি অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। লেশমাত্রও কর্ম করে না। সে হাত-পা দ্বারা, ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কর্ম করে না। কিন্তু কিছু না করিয়াও সে অনন্ত কর্ম করে।

কোন লোক রাগ করিয়াছে। আমাদের ভুলের দরুন রাগ হইয়া থাকিলে তাহার কাছে যাই। কিন্তু সে কথাই বন্ধ করিয়া দেয়। তাহার না-বলার, ঐ কর্মত্যাগের কিরূপ প্রচণ্ড ফল হয়! আর একজন মুখের উপর কড়া কড়া শব্দ বলে। দুইজনেই ক্রুদ্ধ। একজন মৌন, আর একজন মুখর। উভয়ই ক্রোধের দৃষ্টান্ত। না-বলাও ক্রোধের এক রূপ। তাহাতেও কর্ম হয়। মা-বাবা সন্তানের সহিত কথা বন্ধ করিলে তার ফল কেমন প্রচণ্ড হয়! ঐ কথা-বলা বন্ধ করার, কর্ম না-করার পরিণাম প্রত্যক্ষ কর্ম-করার পরিণাম হইতে অনেক বেশী প্রচণ্ড হইয়া থাকে। ঐ অ-বলার যে প্রভাব হইল, বলার সে প্রভাব হওয়া সম্ভব

ছিল না। জ্ঞানীপুরুষের এইরূপই হয়। তাহার অকর্ম, তাহার শান্ত ভাব প্রচণ্ড কর্ম করিয়া থাকে। প্রচণ্ড সামর্থ্য সৃষ্টি করে। অকর্মী থাকিয়া সে এত কর্ম করে যে নানা ক্রিয়া দ্বারাও তাহা করা যায় না। সন্ন্যাসের ইহা অপর রূপ।

এইরূপ সন্ন্যাসীর সমস্ত প্রবৃত্তি সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য এক আসনে আসিয়া স্থির হয়। উত্তমের ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া নারায়ণের চরণে পুঁটুলির মত স্থির হইয়া যায়। সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য শান্ত হইয়া যায়।

তুকারাম রিক্ত হইয়াছেন, কিন্তু সেই রিক্ত পুঁটলিতে রহিয়াছে প্রচণ্ড প্রেরণা-শক্তি। সূর্য নিজে কখনও হাঁকে না কিন্তু তার সান্নিধ্যে পাখি ওড়ে, মেষশাবক নৃত্য করে, গাভী বনে চরিতে যায়, বেপারী দোকান খোলে, কৃষক ক্ষেতে যায়। সংসারে নানা কাজ শুরু হয়। সূর্যের উপস্থিতি মাত্র অনন্ত কর্ম শুরু হইয়া যায়। এই অকর্মাবস্থায় অনন্ত কর্মের প্রেরণা ভরা থাকে। পরিপূর্ণ সামর্থ্য ঠাসা থাকে। এইরূপ ইহা সন্ন্যাসের দ্বিতীয় অদ্ভুত রূপ।

॥ ২১ ॥ দুইয়ের তুলনা শব্দাতীত

পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাসের দ্বিবিধ রূপের তুলনা করা হইয়াছে। একজন চব্বিশ ঘণ্টা কর্ম করিয়াও কিছু করে না, আর অন্যজন পলভর কর্ম না করিয়াও সব কিছু করে। একের রূপ—বলিয়া না-বলা, আর অন্যের রূপ—না বলিয়া বলা। এই যে দুই দিব্য রূপ তাহা অবলোকন করুন, বিচার করুন, মনন করুন। অপূর্ব আনন্দের তাহা খনি।

বিষয়টিও অপূর্ব ও উদাত্ত। সন্ন্যাসের এই কল্পনা সত্যসত্যই অতীব পবিত্র, অতীব মধুর। এই ভাবের, এই কল্পনার কথা যাহার মনে প্রথম উদয় হয়, তিনি কতই না ধন্যবাদের পাত্র! মহান্ উজ্জ্বল এই কল্পনা। মানববুদ্ধি, মানবচিন্তা আজ পর্যন্ত যত উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হইয়াছে সন্ন্যাসের এই কল্পনা তাহাদের মধ্যে সর্ব উচ্চে পৌঁছিয়াছে। উহাকে আজও কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। উচ্চে বিচরণ করা আজও

ক্ষান্ত হয় নাই। কিন্তু চিন্তার, অনুভবের এত উচ্চে আর কেহ উঠিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। সন্ন্যাসের এই দ্বিবিধ রূপের ছবি চক্ষে ভাসিয়া উঠামাত্র অপার আনন্দের উদয় হয়। কিন্তু ভাষায় বা ব্যবহারের জগতে আসিলে সে আনন্দ কম হইয়া যায়। মনে হয় নীচে পড়িতেছি। বন্ধুদের সহিত এ বিষয়ে আমার প্রায়ই আলোচনা চলে। বহু বৎসর যাবৎ আমি এই সব দিব্য ভাবনা মনন করিয়া আসিতেছি। এখানে ভাষা অক্ষম। শব্দের দ্বারা ইহা প্রকাশ করা যায় না।

না করিয়া সব কিছু করিলাম আর সব কিছু করিয়াও লেশমাত্র করিলাম না—কেমন উদাত্ত রসময় ও কাব্যময় এই কল্পনা! কাব্যের আর কী বাকী থাকিল? যত কিছু কাব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ সবই এই কাব্যের কাছে ম্লান। এই কল্পনায় যে আনন্দ, যে উৎসাহ, যে স্ফূর্তি, যে দিব্যভাব রহিয়াছে তাহা কোন কাব্যে নাই। এইরূপে এই পঞ্চম অধ্যায়কে উচ্চ, অতি উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত কর্ম-বিকর্মের কথা বলিয়া এখানে খুবই উচ্চ কল্পনায় উল্লম্ফন করা হইয়াছে। এখানে অকর্মদশার দুই রূপের প্রত্যক্ষ তুলনা করা হইয়াছে। ভাষা এখানে পরাস্ত। কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ না কর্মসন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ? কে অধিক কর্ম করে. তাহা বলা সম্ভব নহে। সব কিছু করিয়াও কিছু না করা, আর কিছু না করিয়াও সব কিছু করা, এ দুই-ই যোগ। কিন্তু তুলনার জন্য এককে "যোগ" বলা হইয়াছে, আর অপরকে "সন্ন্যাস"।

॥ ২২ ॥ জ্যামিতি ও মীমাংসকদের দৃষ্টান্ত

এখন ইহাদের তুলনা কিরূপে করা যায়? তার জন্য কোনও উদাহরণের আশ্রয় লইতে হইবে। উদাহরণের কথায় মনে হয় যেন নীচে পড়িতেছি। কিন্তু নীচে পড়া ছাড়া উপায় নাই। বলিতে কি, পূর্ণ কর্মসন্ন্যাস কিংবা পূর্ণ কর্মযোগ এই কল্পনাই এরূপ যে এই দেহে তার স্থান সঙ্কুলান হয় না। ঐ কল্পনা এই দেহ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষ এই কল্পনার কাছাকাছিও পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদেরই দৃষ্টান্ত সামনে রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। উদাহরণ চিরদিনই অপূর্ণ থাকিবে, কিন্তু সাময়িক ভাবে ধরিয়া লইতে হইবে তাহা পূর্ণ।

জ্যামিতিতে বলা হয় 'মনে কর' কখগ একটি ত্রিকোণ। কেন মনে করিব? এই ত্রিকোণের রেখা যথার্থ রেখা নয় বলিয়া। আসলে রেখার সংজ্ঞা—দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ নাই। প্রস্থ বাদে দৈর্ঘ্য বোর্ডে আঁকা যায় কি? লম্বাইএর সঙ্গে চওড়াইও আসিয়া পড়ে, রেখা টানিলেই তাহাতে কিছু না কেছু প্রস্থ থাকিবেই। তাই জ্যামিতিশাস্ত্রে রেখা মনে করা ছাড়া কাজ চলে না। ভক্তিশাস্ত্রের কথাও তাহাই নয় কি? সেখানেও ভক্ত বলেন—'মনে কর' এই ছোটখাটো শালগ্রাম শিলাতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী রহিয়াছেন। এ কেমন বোকামি? একথা কেহ বলে ত তাহাকে বলিও,—তোমার এই জ্যামিতি কিরূপ বোকামি? পরিষ্কার মোটা রেখা দেখা যাইতেছে আর বলিতেছ 'মনে কর' ইহার প্রস্থ নাই, ইহা কিরূপ বোকামি? অণুবীক্ষণে দেখিলে আধ ইঞ্চি চওড়া দেখাইবে। জ্যামিতি-শাস্ত্রে তুমি যেমন ধরিয়া লও, ভক্তিশাস্ত্রও তেমনি বলে, "মনে কর এই শালগ্রামে পরমেশ্বর আছেন।" "পরমেশ্বরকে ভাঙ্গাচুরা যায় না। কিন্তু তোমার শালগ্রাম চূর্ণ হয়ে যাবে। লাগাও না ঘা?" একথা কোন বুদ্ধি-মত্তার পরিচায়ক নয়। জ্যামিতিতে 'মনে কর' চলিবে আর ভক্তিশাস্ত্রে চলিবে না কেন? বিন্দুকে বলা হয় 'মনে কর'। আর বোর্ডে বিন্দু আঁক। বিন্দু নয় ত সুন্দর এক বর্তুল। বিন্দুর বর্ণনা ব্রহ্মের বর্ণনারই তুল্য। বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু এরূপ বর্ণনা করিলেও বোর্ডে তাহা আঁকা হয়। বিন্দু ত কেবল অস্তিত্বমাত্র। পরিমাপ রহিত। তাৎপর্য হইল যথার্থ ত্রিকোণ, যথার্থ বিন্দু সংজ্ঞাতেই কেবল যথার্থ। উহা আমাদের ধরিয়া লইতে হয়। ভক্তিশাস্ত্রেও সেইরূপ। শালগ্রামে অভঙ্গুর সর্বব্যাপী পরমেশ্বর ধরিয়া লইতে হয়। আমরাও তেমনি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত লইয়া ইহাদের তুলনা করিব।

মীমাংসকগণ ত বড়ই মজা করিয়াছেন। পরমেশ্বর কোথায় আছেন একথার মীমাংসা করিতে গিয়া তাঁহারা সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতা আছে। এই সব দেবতাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে মীমাংসায় প্রশ্ন করা হয়, "এই ইন্দ্র কিরূপ? তার রূপ কি? কোথায় থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়াছেন, 'ইন্দ্র'

এই শব্দই ইন্দ্রের রূপ। 'ইন্দ্র' এই শব্দে সে থাকে। 'ই' আর পরে 'ন্দ্র' ইহাই ইন্দ্রের রূপ। ইহাই তাহার মূর্তি। ইহাই তাহার পরিমাপ। বরুণ দেবতা কিরূপ? ঐরূপেই প্রথমে 'ব' পরে 'রু' পরে 'ণ'। ব-রু-ণই বরুণের রূপ। এইরূপে অগ্নি আদি দেবতা সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই সকল দেবতাই অক্ষররূপধারী। দেবতাগণ অক্ষরমূর্তি। এই কল্পনায়, এই ভাবনায় বড়ই মাধুর্য নিহিত। দেবতার এই কল্পনাকে আকারে রূপায়িত করা যায় না। ঐ কল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য অক্ষর-রূপ চিহ্নই পর্যাপ্ত: ঈশ্বর কিরূপ? আগে 'ঈ' তারপরে 'শ্ব' তারপরে 'র'। পরিশেষে 'ওঁ' ত চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। 'ওঁ' অক্ষরই ঈশ্বর হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের উহা এক সংজ্ঞা হইয়া গিয়াছে। এরূপ সংজ্ঞা সৃষ্টি করিতে হয়। কারণ মূর্তিতে বা আকারে এই বিশাল কল্পনা ধরে না কিন্তু মানুষের ইচ্ছা অতি প্রবল। এই সব কল্পনাকে সে মূর্তিমান করিতে প্রয়াসী।

॥ ২৩ ॥ সন্ন্যাসী ও যোগী একই: শুক-জনকবৎ

সন্ন্যাস ও যোগ অতি উচ্চ স্তরের কল্পনা। পূর্ণ সন্ন্যাস ও পূর্ণ যোগের কল্পনার রূপায়ণ এই দেহে হইতে পারে না। রক্ত মাংসের দেহে তাহা আঁটানো না গেলেও চিন্তা দ্বারা ধরা যায়। পূর্ণ যোগী ও পূর্ণ সন্ন্যাসী ব্যাখ্যাতেই থাকিবে উহারা আদর্শ স্বরূপ এবং অপ্রাপ্যরূপেই থাকিবে। তবে উদাহরণ স্বরূপ এরূপ ব্যক্তি লইতে হইবে যিনি এই কল্পনার সর্বাধিক নিকটে পৌঁছিয়াছেন। আর জ্যামিতির মত মনে করিতে হইবে যে অমুক ব্যক্তি পূর্ণ যোগী আর অমুক ব্যক্তি পূর্ণ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের উদাহরণ দিতে গিয়া শুক-যাজ্ঞবল্ক্যের নাম করা হয়। আর জনক-শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদ্গীতায় কর্মযোগী বলা হইয়াছে। গীতারহস্যে লোকমান্য নামের এরূপ এক তালিকাই দিয়াছেন—"জনক-শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি এ পথে গিয়াছেন আর শুক-যাজ্ঞবল্ক্য আদি ওপথে গিয়াছেন।" একটু ভাবিয়া দেখিলে, ভিজা হাতে লেখা পুঁছিয়া ফেলার মত এই তালিকা পুঁছিয়া ফেলা যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন সন্ন্যাসী, জনক ছিলেন কর্মযোগী। অর্থাৎ কর্মযোগী জনক সন্ন্যাসী যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য ছিলেন। আর ঐ জনকেরই শিষ্য হইলেন

সন্ন্যাসী শুকদেব। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য জনক, আর জনকের শিষ্য শুকদেব। সন্ন্যাসী, কর্মযোগী, সন্ন্যাসী—এই রূপেই এই মালা প্রস্তুত হইয়াছে। অর্থাৎ যোগ ও সন্ন্যাস একই পরম্পরায় আসিয়া পড়িল।

ব্যাসদেব শুকদেবকে বলিলেন, "বৎস শুক, তুমি জ্ঞানী ত নিশ্চয়ই কিন্তু গুরুর ছাপ তোমার পাওয়া হয় নি। তুমি জনকের কাছে যাও।" শুকদেব চলিলেন। জনক তাঁহার বিশাল রাজপ্রাসাদের তেতলায় বসিয়া ছিলেন। শুক ছিলেন বনবাসী। নগর দেখিতে দেখিতে তিনি চলিয়াছেন। জনক শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন এসেছ?"

শুকদেব কহিলেন—"জ্ঞান লাভের জন্য।"

জনক—"কে পাঠিয়েছেন?"

—"ব্যাস দেব।"

—"এখন কোথা থেকে আঁসছ?"

—"আশ্রম থেকে।"

—"আসতে আসতে পথের পাশে কি দেখলে?"

—"সব জায়গায় একই রকম চিনির মিঠাই সাজানো দেখলাম।"

—"আর কিছু দেখলে?"

—"চলছে-বলছে এরূপ চিনির পুতুল সব দেখলাম।"

—"তারপরে কি দেখলে?

—"এখানে আসতে চিনির শক্ত সিঁড়ি পেলাম।"

—"তারপর?"

—"চিনির পুতুল এখানেও সর্বত্র দেখছি।"

—"এখন কি দেখতে পাচ্ছ?"

—"এক চিনির পুতুল আর এক চিনির পুতুলের সঙ্গে কথা বলছে।"

জনক বলিলেন, "যাও, সব জ্ঞান তোমার লাভ হয়েছে।" জনকের স্বাক্ষরিত যে প্রমাণপত্রের দরকার ছিল তাহা শুকদেব পাইলেন। মোদ্দা কথা, কর্মযোগী জনক সন্ন্যাসী শুকদেবকে শিষ্য বলিয়া পাস করিলেন।

শুক ত সন্ন্যাসী। তাঁহাকে শিষ্য বলিয়া পাস করিলেন কর্মযোগী জনক। দেখুন প্রসঙ্গটি কিরূপ মজার। পরীক্ষিৎ শাপগ্রস্ত হইলেন—

"সাত দিনে তোর মৃত্যু হবে।" পরীক্ষিৎকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে ; কিরূপে মরিতে হয় এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য গুরু চাই। শুকদেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শুকদেব আসিলেন আর স্বস্তিকাসনে বসিয়া ২৪ × ৭ = ১৬৮ ঘণ্টা ভাগবত শুনাইতে লাগিলেন। তিনি নিজ আসন হইতে উঠিলেন না, একটানা সাতদিন বলিয়া চলিলেন। আপনারা বলিবেন ইহাতে আর বিশেষত্ব কি ? বিশেষত্ব এই যে সাত দিন অত্যন্ত পরিশ্রম হইলেও তাহা শুকদেবের মনেই হয় নাই। অনুক্ষণ কর্ম করিতে থাকিলেও তিনি যেন কর্ম করিতেছিলেন না। শ্রমের বোধই সেখানে ছিল না। তাৎপর্য, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ আসলে ভিন্ন বস্তুই নয়।

সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন,—

'একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'

সন্ন্যাস ও যোগকে যে একই দেখে সে-ই যথার্থ রহস্য বুঝিয়াছে। একজন না করিয়াও করে, আর একজন করিয়াও করে না। যিনি সত্য-সত্যই শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, যাঁহার নিরন্তর সমাধি লাগিয়া থাকে, যিনি পূর্ণ নির্বিকার এইরূপ কোন সন্ন্যাসী যদি আসিয়া আমাদের মধ্যে দিন দশেক থাকেন ত দেখিবেন কত জ্ঞান কত প্রেরণা তিনি দিয়াছেন। বহু বর্ষের বহু প্রকারের কর্মের দ্বারা যাহা হয় নাই তাহা তাঁহার দর্শনমাত্রে, অস্তিত্বমাত্রে হইয়া যাইবে। ফটো দেখিয়া যদি মনে পবিত্র ভাব আসে, মৃত লোকের ছবি দেখিয়া যদি ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা হৃদয়ে জন্মে, তাহা হইলে জীবন্ত সন্ন্যাসী দেখিয়া কতই না প্রেরণা পাওয়া যাইবে !

সন্ন্যাসী ও যোগী উভয়েই লোকসংগ্রহ করেন। বাহির হইতে এক জায়গায় কর্মের ত্যাগ দেখা গেলেও সেই কর্মত্যাগে কর্ম ঠাসা ভরা থাকে। অনন্ত প্রেরণা ভরা থাকে। জ্ঞানী-সন্ন্যাসী ও জ্ঞানী-কর্মযোগী উভয়ে একই সিংহাসনে বসিবার অধিকারী। নাম পৃথক হইলেও অর্থ একই, একই তত্ত্বের ইহা দুইটি দিক বা প্রকার। যন্ত্র যখন বেগে ঘুরিতে থাকে তখন মনে হয় তাহা স্থির, ঘুরিতেছে না। সন্ন্যাসীর স্থিতিও সেইরূপ। তাঁহার শান্তভাব হইতে, স্থিরতা হইতে অনন্ত শক্তি, অফুরন্ত প্রেরণা উৎসারিত হয়। মহাবীর

বুদ্ধ, নিবৃত্তিনাথ, এঁরা এইরূপই বিভূতি ছিলেন। সন্ন্যাসের সকল প্রচেষ্টার প্রবাহ যদি এক স্থানে আসিয়া স্থির হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাহা প্রচণ্ড কর্ম করে। তার মানে যোগীই সন্ন্যাসী, আর সন্ন্যাসীই যোগী। দুইয়ে আসলে কোন পার্থক্য নাই। শব্দ ভিন্ন ভিন্ন, অর্থ এক। যেমন পাথর মানে পাষাণ আর পাষাণ মানে পাথর। সেইরূপ কর্মযোগী মানে সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসী মানে কর্মযোগী।

॥ ২৪ ॥ তা সত্ত্বেও সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ

কথা যদিও এক তাহা হইলেও ভগবান কর্মযোগের উপর একটি শূন্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। ভগবান বলিতেছেন সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। দুইই যদি এক হয় তবে ভগবান এরূপ বলিতেছেন কেন? ইহাতে কী রহস্য নিহিত? ভগবান যখন বলেন, কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ তখন তিনি সাধকের দৃষ্টিতে তাহা বলেন। কোন কর্ম না করিয়া সকল কর্ম করার যে উপায় তাহা কেবল সিদ্ধ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব, সাধকের পক্ষে নহে। কিন্তু সর্ব কর্ম করিয়াও কিছু না করার যে উপায় তাহার কিছুটা অনুকরণ করা যাইতে পারে মাত্র। এই কার্য সাধকের সাধ্যাতীত। কেবল সিদ্ধের পক্ষেই সম্ভব। অপরটি সাধকের পক্ষেও অল্পাধিক সম্ভবপর। আদৌ কর্ম না করিয়া কর্ম কিরূপে করা যায়, তাহা সাধকের কাছে এক ধাঁধা বলিয়া মনে হইবে। তাহা তাহার বুদ্ধির অগম্য। সাধকের পক্ষে কর্মযোগ মার্গও বটে লক্ষ্যও বটে। কিন্তু সন্ন্যাস তো অন্তিম লক্ষ্য পথের জিনিস নয়। এই জন্য সাধকের দৃষ্টিতে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।

এই ন্যায় অনুসারে পরবর্তী দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান নির্গুণ অপেক্ষা সগুণকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন। সগুণে সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম আছে। নির্গুণে তাহা নাই। নির্গুণে হাত কর্মহীন, পা কর্মহীন, চক্ষু কর্মহীন। সকল ইন্দ্রিয় কর্ম শূন্য। সাধকের অবস্থায় এসব সম্ভবপর নয়। কিন্তু সগুণে তাহা নহে। চোখ দিয়া রূপ দেখা যায়, কান দিয়া কীর্তন শোনা যায়, হাত দিয়া পূজা করা যায়—লোকের সেবা করা যায়, পা দিয়া তীর্থ ভ্রমণ করা যায়। এইভাবে সকল ইন্দ্রিয়কে কাজ দিয়া এবং তাহাদের দ্বারা সেই সব কাজ করাইতে করাইতে ধীরে ধীরে তাহাদের হরিময় বানানো যায়। কিন্তু

নির্গুণে সব বন্ধ—জিভ বন্ধ, কান বন্ধ, হাত-পা বন্ধ। কর্মশূন্যতার এই শূন্য রূপ দেখিয়া বেচারা সাধক ঘাবড়াইয়া যায়। তাঁহার চিত্তে নির্গুণের স্থান হইবে কিরূপে? সে যদি নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে তবে তাহার মনে আজেবাজে চিন্তা খেলিতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের স্বভাব এই যে তাহাকে যাহা করিতে নিষেধ করিবে, সে তাহাই করিবে। বিজ্ঞাপনের বেলাও তাহাই হয় না কি? উপরে লিখিয়া দেয় 'পড়িও না' পাঠক মনে মনে বলে, "কেন পড়িব না? ইহাই আগে পড়িতে হইবে। 'পড়িওনা' বলার উদ্দেশ্য অবশ্যই পড়িবে। লোকে তাহা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। নির্গুণে মন দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকিবে। সগুণ ভক্তির অবস্থা তাহা নহে। সেখানে আরতি আছে, পূজা আছে, সেবা আছে, প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়া আছে। ইন্দ্রিয়ের জন্য সেখানে পর্যাপ্ত কাজ আছে। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠিক কাজে লাগাইয়া দাও আর বল, "এবার যেখানে ইচ্ছা যা।" কিন্তু মন তখন দৌড়াইবে না। কর্মে লীন হইবে, অজ্ঞাতেই একাগ্র হইবে। কিন্তু জোর করিয়া উহাদের যদি কোথাও স্থির করিতে যাও ত ছুটিয়া পালাইবে। এক একটি ইন্দ্রিয়কে এক একটি সুন্দর কর্মে লাগাইয়া দাও আর তারপর মনকে বল যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াও। উহা দৌড়াদৌড়ি করিবে না। যাওয়ার খোলা ছুটি দিয়াছ ত বলিবে, "এখানেই আমি থাকব।" 'চুপ করে বস' এই হুকুম করিয়াছ ত সে বলিবে, "এই আমি চল্লাম।"

দেহধারী মানুষের পক্ষে সহজসাধ্যতার দিক হইতে নির্গুণ অপেক্ষা সগুণ শ্রেষ্ঠ। কর্ম করিয়া কর্মের ভার উড়াইয়া দেওয়ার কৌশল কর্ম না করিয়া কর্ম করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ তাহাতে সুলভতা রহিয়াছে। কর্মযোগে প্রযত্নের, বারংবার চেষ্টার সুযোগ আছে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে আনিয়া আস্তে আস্তে সকল প্রযত্ন হইতে মনকে উঠাইয়া লওয়ার চেষ্টা করার সুযোগ কর্মযোগে আছে। ঐ কৌশল আজই আয়ত্তে না আসিলেও আয়ত্তে আনা সম্ভবপর। কর্মযোগ অনুকরণ-সুলভ। আর এখানেই সন্ন্যাসের তুলনায় ইহার বিশেষত্ব। কিন্তু পূর্ণাবস্থায় কর্মযোগ ও সন্ন্যাস দুইই সমান। পূর্ণ সন্ন্যাস ও পূর্ণ কর্মযোগ দুইই এক বস্তু। নাম দুই, দেখিতে পৃথক পৃথক, কিন্তু আসলে দুইই এক। একটিতে দেখা যায় কর্মের

প্রচণ্ডরূপ বাহিরে প্রকট কিন্তু ভিতরে শান্তি বিরাজিত। অপরটিতে রহিয়াছে কিছু না করিয়াও ত্রিভুবন ওলটপালট করার শক্তি। যাহা দেখা যায় তাহা নয় ইহাই এই দুয়ের স্বরূপ। পূর্ণ কর্মযোগ যদি সন্ন্যাস হয়, তবে পূর্ণ সন্ন্যাসও কর্মযোগ। কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্মযোগ সহজ। পূর্ণাবস্থায় দুইই এক।

জ্ঞানদেবকে চাঙ্গদেব একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র নয়, উহা ছিল কেবল সাদা কাগজ। জ্ঞানদেব ছিলেন চাঙ্গদেব হইতে বয়সে ছোট। 'চিরজীবেষু' লিখিবেন কিন্তু জ্ঞানদেব যে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। 'পূজনীয়' লেখা চলে না। কারণ বয়সে জ্ঞানদেব ছোট। কি বলিয়া সম্বোধন করা যায় ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাই চাঙ্গদেব সাদা কাগজই পাঠাইয়া দিলেন। সে কাগজ প্রথমে নিবৃত্তিনাথের হাতে পড়ে। তিনি সেই সাদা কাগজ পড়িয়া জ্ঞানদেবের হাতে দিলেন। জ্ঞানদেব পড়িয়া মুক্তাবাঈকে দিলেন। মুক্তাবাঈ পড়িয়া কহিলেন, "চাঙ্গদেব এত বড় হয়েছেন, কিন্তু আজও তিনি সেই কোরা, আনকোরাই রয়ে গেছেন।" নিবৃত্তিনাথ পাইলেন অন্য অর্থ। তিনি কহিলেন, "চাঙ্গদেব তেমনি সরল, শুদ্ধ, নির্মল। উপদেশ দেওয়ার অধিকারী।" একথা বলিয়া জ্ঞানদেবকে উত্তর দিতে বলিলেন। জ্ঞানদেব ৬৫টি ওবী শ্লোকে পত্রের উত্তর দিলেন। উহাকে 'চাঙ্গদেব পাসষ্টী' বলে। এমনি মজাদার এই পত্রের বৃত্তান্ত।

লেখা পড়া সহজ, কিন্তু অ-লেখা কাগজ পড়া কঠিন। তাহা পড়িয়া শেষ করা যায় না। সেইরূপ সন্ন্যাসী দেখিতে কর্মশূন্য, রিক্ত দেখাইলেও তাহাতে অপরিসীম কর্ম ভরা থাকে।

পূর্ণ সন্ন্যাস ও পূর্ণ কর্মযোগের মূল্য এক সমান। কিন্তু তদতিরিক্ত কর্মযোগের ব্যবহারিক মূল্য অধিক। একখানি নোট, মূল্য তার পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকার মুদ্রাও আছে! সরকার না বদলানো পর্যন্ত উভয়ের মূল্য এক সমান। কিন্তু সরকার বদলাইলে নোটের ব্যবহারিক মূল্য এক পয়সাও থাকে না। কিন্তু সোনার মুদ্রার মূল্য কিছু-না-কিছু থাকেই। কারণ মূলত তাহা সোনা। পূর্ণাবস্থায় কর্মত্যাগ ও কর্মযোগের মূল্য

*ওবী এক প্রকার প্রচলিত মারাঠী ছন্দ।

একেবারে সমান, কারণ উভয়েই পরিপূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে। জ্ঞানের মূল্য অনন্ত। অনন্তে কিছু যোগ করিলে মূল্য অনন্তই থাকে। ইহা গণিতশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ যখন পরিপূর্ণ জ্ঞানে মিলিয়া যায় তখন উভয়ের মূল্য সমান। কিন্তু উভয় হইতে যদি জ্ঞান বাদ দেওয়া যায় তবে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ সাধকের কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হইবে। উভয় দিকে পূর্ণ শুদ্ধ জ্ঞান রাখ ত মূল্য এক। গন্তব্যে পৌঁছিলে জ্ঞান+কর্ম= জ্ঞান+কর্মাভাব। কিন্তু উভয় দিক হইতে জ্ঞান সরাইয়া লও ত কর্মের অভাব অপেক্ষা কর্মই সাধকের কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হইবে। না-করিয়া-করা একথা সাধকের বুদ্ধিতে আসে না। করিয়া-না-করা একথা সে বোঝে। কর্মযোগ যেমন মার্গে তেমন লক্ষ্যে রহিয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাস কেবল লক্ষ্যেই স্থিত, মার্গে নহে। একথা শাস্ত্রীয় ভাষায় বলিলে, কর্মযোগ সাধনও বটে আর নিষ্ঠাও বটে। কিন্তু সন্ন্যাস কেবল নিষ্ঠা। নিষ্ঠা মানে অন্তিম অবস্থা।

রবিবার ২০-৩-১৯৩২

ষষ্ঠ অধ্যায়

চিত্তবৃত্তি নিরোধ

॥ ২৫ ॥ আত্মোদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা

বন্ধুগণ,

মানুষ যে কত ঊর্ধ্বে বিচরণ করিতে পারে, কল্পনা ও বিচার সাহায্যে তাহা আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিয়াছি। কর্ম বিকর্ম অকর্ম মিলিয়া সকল সাধনা পূর্ণ হয়। কর্ম স্থূল বস্তু। যে সব স্বধর্ম-কর্ম আমরা করি তাহাতে আমাদের মনের সহযোগ থাকা চাই। মানসিক শিক্ষার জন্য যে কর্ম করা হয় তাহা বিকর্ম, বিশেষ কর্ম, কিম্বা সূক্ষ্ম কর্ম। কর্ম ও বিকর্ম দুইই দরকার। এই দুইয়ের আচরণ করিতে করিতে অকর্মের ভূমিকা প্রস্তুত হয়। এই ভূমিকায় কর্ম ও সন্ন্যাস দুইই যে একরূপ হইয়া যায় তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি। এখন ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভে পুনঃ বলা হইয়াছে যে কর্মযোগের ভূমিকা সন্ন্যাসের ভূমিকা হইতে দেখিতে ভিন্ন মনে হইলেও বস্তুত অক্ষরে অক্ষরে একরূপ। কেবল দেখিতে পৃথক। পঞ্চম অধ্যায়ে যে অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে সে অবস্থায় পৌঁছানোর নানা উপায়ের অনুসন্ধান হইতেছে পরবর্তী অধ্যায়সমূহের বিষয়।

এরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা কিছু লোকের মধ্যে আছে যে পরমার্থ, গীতা আদি গ্রন্থ কেবল সাধুদের জন্য। কেহ কেহ বলেন। "আমি ত আর সাধু নই।" ইহার অর্থ এই যে, সাধু নামে কোন এক জীব আছে আর বক্তা তাহাদের একজন নন। ঘোড়া, সিংহ, ভালুক, গাভী আদি প্রাণী যেমন, তেমনি সাধু নামে কোন এক প্রাণী আছে, আর পরমার্থের ভাবনা কেবল তাহাদেরই জন্য। অবশিষ্ট ব্যবহারিক জগতের লোকেরা যেন অন্য জাতির—তাহাদের বিচার পৃথক, আচার পৃথক! এই ভাবনা দ্বারা সাধুসন্ত ও ব্যবহারিক লোক এই দুইটি পৃথক জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। 'গীতা-রহস্য' গ্রন্থে তিলক মহারাজ একথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গীতা-গ্রন্থ সর্বসাধারণের জন্য, ব্যবহারিক লোকের জন্য, তিলকের কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মনে করি। ভগবদ্গীতা সমস্ত জগতের

জন্য। পরমার্থ-বিষয়ক সর্বপ্রকার সাধন সর্বসাধারণের জন্য। পরমার্থ আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে আপন আচরণ শুদ্ধ ও নির্মল করিয়া কিভাবে মনের সমাধান ও শান্তি লাভ করা যায়। ব্যবহার কিরূপে শুদ্ধ করা যায় তারই জন্য গীতা। যখনই কেহ কোন আচরণ করে তখনই গীতা আসিয়া যায়। কিন্তু গীতা তাহাকে সেখানেই রাখিতে চায় না। তাহার হাত ধরিয়া গীতা তাহাকে অন্তিম লক্ষ্যে লইয়া যায়। 'পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে ত মহম্মদ পর্বতের কাছে যাবে' এই প্রসিদ্ধ প্রবাদ-বাক্য কে না জানে। জড় পর্বতের কাছেও নিজের বাণী পৌঁছান—ইহাই ছিল মহম্মদের উদ্দেশ্য। পর্বত জড়, তাই তার আসার প্রতীক্ষায় মহম্মদ বসিয়া থাকিবে না। এই কথাই গীতা সম্বন্ধে খাটে। যতই গরীব, দুর্বল ও মূর্খ হউক না কেন গীতা তার কাছেও যাইবে। কিন্তু যেখানে সে আছে সেখানে তাহাকে রাখার জন্য যাইবে না, যাইবে তাহাকে হাত ধরিয়া আগে লইয়া যাওয়ার জন্য, উপরে টানিয়া উঠাইবার জন্য। মানুষ নিজ আচরণ শুদ্ধ করিয়া পরম উচ্চ অবস্থা লাভ করুক—গীতা ইহাই চায়। ইহার জন্যই গীতার উদ্ভব।

অতএব 'আমি জড়, আমি বিষয়ী লোক, আমি সাংসারিক জীব' একথা বলিয়া নিজের চারিদিকে গণ্ডি টানিও না। 'আমার দ্বারা কি হবে? এই সাড়ে তিন হাত দেহেই আমার সব কিছু'।—একথা বলিও না। বন্ধনের এইরূপ প্রাচীর, কারাপ্রাচীর নিজের চারিদিকে খাড়া করিয়া ইতর প্রাণীর মত আচরণ করিও না। অগ্রসর হওয়ার, ঊর্ধ্বে আরোহণ করিবার সাহস অবলম্বন কর।

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ'

এই মনোবল অবলম্বন কর যে আমি নিজেকে নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বে লইয়া যাইব। আমি ক্ষুদ্র সাংসারিক জীব একথা ভাবিয়া মনের শক্তি নষ্ট করিও না। ভাবনার সূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিও না। ভাবনাকে বাধাহীন বিশাল কর। ভরত পাখির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য কর। ভোরের সূর্য দেখিয়া ভরত বলে, 'আমি সূর্য পর্যন্ত উড়ে যাব।' তেমনই আমাদেরও হইতে হইবে। ভরত পাখী তার দুর্বল ডানার সাহায্যে যতই উচ্চে উঠুক না কেন, সূর্যে সে

পৌঁছিবে কি প্রকারে? কিন্তু কল্পনায় সে সূর্য পর্যন্ত নিশ্চয়ই যাইতে পারে। আমাদের আচরণ হয় ঠিক উল্টা। আমরা যতটা উঁচুতে উঠিতে পারি ততটা না উঠিয়া, নিজেদের কল্পনা ও ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া নিজেদের নীচে টানিয়া রাখি। যে শক্তি আমরা পাইয়াছি তাহাও সঙ্কুচিত ভাবনার জন্য নষ্ট করিয়া ফেলি। যেখানে কল্পনার পা-ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেখানে নীচে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেইজন্য কল্পনার গতি ঊর্ধ্বমুখী হওয়া চাই। কল্পনার সাহায্যেই মানুষ অগ্রসর হয়। তাই কল্পনাকে সঙ্কুচিত করিও না।

ঘোপটমার্গা সোডুঁ নকো।
সংসারামধি ঐস আপুলা উগা চ ভটকত ফিরুঁ নকো।

"প্রচলিত পথ ছেড়ো না। চুপচাপ সব মেনে নাও, এদিকে ওদিকে ব্যর্থ ঘোরাঘুরি করো না।" এইরূপ গতানুগতিক বুলি আওড়াইও না। আত্মার অপমান করিও না। (সাধকের) কল্পনায় যদি বিশাল ভাব থাকে, আত্মবিশ্বাস থাকে তবে সাধকের মার নাই। তাহা দ্বারাই উদ্ধার হইবে। "ধর্ম ত কেবল সাধুদের জন্য, আর সাধুদের নিকট গেলেও, 'যা করেছ তোমার অবস্থায় তাই ঠিক' সাধুদের কাছ হইতে এইরূপ সার্টিফিকেট পাওয়ার কল্পনা মন হইতে দূর করিয়া দাও। এইরূপ ভেদাত্মক কল্পনা করিয়া নিজেকে বন্ধনে আবদ্ধ করিও না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ না করিলে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না।

এই দৃষ্টি, এই আকাঙ্ক্ষা, এই মহান্ ভাবনা যদি আসে তবে না সাধনার আটঘাট বাঁধার প্রয়োজন, নতুবা সবই ফাঁকা। বাহ্য কর্মের সহায়করূপে মানসিক সাধনরূপ বিকর্মের কথা বলা হইয়াছে। কর্মের সহায়তার জন্য বিকর্ম নিরন্তর দরকার। এই দুইয়ের সহায়তায় অকর্ম নামক যে দিব্যস্থিতি লাভ হয় সেই অকর্ম ও অকর্মের রূপ পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি। এই ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে বিকর্মের বিবিধ রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মানসিক সাধনার কথা বলা হইয়াছে। এই মানসিক সাধনা বুঝাইবার পূর্বে গীতা বলিতেছে, "হে জীব, তুমি দেবতা হতে সক্ষম। তুমি এই দিব্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর। মন মুক্ত রেখে কল্পনার

ডানা দৃঢ় কর।” ভক্তিযোগ, ধ্যান, জ্ঞানবিজ্ঞান, গুণবিকাশ, আত্মনাত্ম-বিবেক ইত্যাদি হইতেছে সাধনের তথা বিকর্মের বিভিন্ন রূপ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ‘ধ্যানযোগ’ নামক সাধনের কথা বলা হইয়াছে।

॥ ২৬ ॥ চিত্তের একাগ্রতা

ধ্যানযোগে তিনটি বিষয় মুখ্য। (১) চিত্তের একাগ্রতা, (২) চিত্তের একাগ্রতার উপযোগী জীবনের পরিমিততা ও (৩) সাম্যদশা বা সমদৃষ্টি। এই তিন বস্তু ছাড়া যথার্থ সাধনা সম্ভব নহে। চিত্তের একাগ্রতা মানে চিত্তের চঞ্চলতার উপর অঙ্কুশ বা নিয়ন্ত্রণ। জীবনের পরিমিততা মানে সকল ক্রিয়া মাপিয়া জুখিয়া হিসাব করিয়া করা। সমদৃষ্টি মানে বিশ্বকে দেখার উদার দৃষ্টি। এই তিনের সংযোগে ধ্যানযোগ হয়। এই ত্রিবিধ সাধনেরও আবার সাধন আছে। তাহা হইতেছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য। এই পাঁচ বিষয়ের একটু আলোচনা এখানে করিব।

প্রথমে চিত্তের একাগ্রতার কথা ধরুন। যে কোন কাজের জন্যই চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োজন। বৈষয়িক ব্যাপারেও চিত্তের একাগ্রতা চাই। এমন নয় যে, ব্যবহারিক জীবনের জন্য এক প্রকার গুণ দরকার আর পরমার্থের জন্য অন্য গুণ। ব্যবহার শুদ্ধ করাই পরমার্থ। ব্যবহার (কর্ম) যেমনই হোক তার ভালমন্দ সফলতা-নিষ্ফলতা একাগ্রতার উপরই নির্ভরশীল। ব্যবসা আচরণ, শাস্ত্রানুশীলন, রাজনীতি, কূটনীতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই সেই কার্যে রত ব্যক্তির একাগ্রতা অনুসারে ফল লাভ হইয়া থাকে। নেপোলিয়নের সম্বন্ধে বলা হয় যে, যুদ্ধের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার পরে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি গণিতের সূত্র-মীমাংসায় ডুবিয়া যাইতেন। তাঁবুতে গোলা পড়ে, সৈন্য মরে, কিন্তু নেপোলিয়নের চিত্ত গণিতে নিবিষ্ট। নেপোলিয়নের একাগ্রতা অতি উচ্চ স্তরের ছিল একথা বলি না। তাহা হইতে উচ্চতর একাগ্রতার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার একাগ্রতা কিরূপ ছিল তাহাই বলিতেছি। খলিফা ওমরের সম্বন্ধেও এরূপ কথিত আছে যে, যুদ্ধ চলিতেছে কিন্তু নমাজের সময় হইয়াছে ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হাঁটু গাড়িয়া নমাজ পড়িতে বসিতেন

এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্ত এমন একাগ্র হইয়া যাইত যে তিনি টেরও পাইতেন না—কাহার লোক কাটা যাইতেছে, মারা পড়িতেছে। শুরুতে মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ঈশ্বরনিষ্ঠা এরূপ একাগ্রতা ছিল বলিয়াই ইসলামধর্মের এতটা প্রসার হইতে পারিয়াছিল।

সম্প্রতি এক ফকিরের কথা শুনিয়াছি। তাঁহার শরীরে তীর বিঁধিয়াছিল। খুব যাতনা হইতেছিল। তীর বাহির করিতে গেলে যাতনা বাড়িবে। তাই তোলা যাইতেছিল না। ক্লোরোফর্মের মত অজ্ঞান করার ঔষধ তখন ছিল না। সমস্যা কঠিন। ফকিরকে জানিত এমন একজন বলিল, "তীর এখন তুলতে যাবেন না। ইনি যখন নমাজ পড়তে বসবেন তখন তুলে নেবেন।" সান্ধ্য নমাজে ফকির বসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চিত্ত এমন একাগ্র হইল যে তীর তাঁহার শরীর হইতে তুলিয়া লওয়া হইল। তিনি টেরও পাইলেন না। কেমন প্রগাঢ় ঐ একাগ্রতা!

সারাংশ, ব্যবহারিক জীবনই বলুন, পরমার্থই বলুন চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত সাফল্যলাভ করা কঠিন। চিত্ত একাগ্র হইলে সামর্থ্যের কখনও অভাব হয় না। ষাট বছর বয়সেও যুবকের মত উৎসাহ ও সামর্থ্য দেখা যাইবে। মানুষ যত বৃদ্ধ হইবে তাহার মন ততই অধিক শক্তিশালী হইতে থাকিবে—এইরূপই হওয়া চাই। ফলের কথা ধরুন। প্রথমে থাকে সবুজ, পরে পাকে, তারপর পচিয়া গলিয়া শেষ হইয়া যায়। কিন্তু উহার ভিতরের বীজ দিন দিন শক্ত হইতে থাকে। এই বাহ্য শরীর পচিবে, গলিবে। কিন্তু উহা ফলের সারসর্বস্ব নহে। ফলের সারসর্বস্ব ফলের আত্মা, বীজ। শরীরের কথাও তাহাই। শরীর বৃদ্ধ হোক না, কিন্তু স্মরণশক্তি ত বাড়িতে থাকা চাই। বুদ্ধি তেজস্বী হইতে থাকা চাই। কিন্তু এরূপ হয় না। লোকে বলে, "আজকাল আমার স্মরণশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।" "কেন?" "বুড়ো হয়ে গেছি।" তোমার জ্ঞান, তোমার বিদ্যা, তোমার স্মরণশক্তি ইহাই তোমার বীজ। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে শরীর শিথিল হইতে থাকিবে, কিন্তু ভিতরের আত্মা সেই অনুপাতেই অধিক বলবান হইতে থাকা চাই। এইজন্যই আবশ্যক একাগ্রতার।

॥ ২৭ ॥ একাগ্রতা লাভের উপায়

একাগ্রতা লাভ করিতে হইবে ; কিন্তু তাহার উপায় ? তার জন্য কি করা চাই ? ভগবান বলিয়াছেন, আত্মায় মন স্থির করিয়া **"ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"**—অন্য কিছু আর চিন্তা করিও না। কিন্তু তাহা করার উপায় কি ? মনকে একেবারে শান্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। চিন্তার চক্রকে জোর করিয়া না থামাইলে একাগ্রতা কোথা হইতে আসিবে ? বাহিরের চক্র না হয় কোন রকমে থামাইলে, কিন্তু ভিতরের চক্র ত সর্বদা চলিতেই থাকে। চিত্তের একাগ্রতার জন্য বাহ্যিক উপায় যতই অবলম্বন করিবে ভিতরের চক্র তত অধিক বেগে চলিতে থাকিবে। আপনি আসন করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, দৃষ্টি স্থির করিলেন কিন্তু তাহাতেই মন একাগ্র হইবে না। আসল কথা মনের চঞ্চলতা বন্ধ করা শিখিতে হইবে।

কথা হইতেছে যে, বাহিরের এই অপার সংসার যাহা আমাদের মনে ঘর বাঁধিয়া রহিয়াছে তাহা বন্ধ করা ছাড়া একাগ্রতা লাভ অসম্ভব। আত্মার অসীম জ্ঞানশক্তি আমরা বাহ্য ক্ষুদ্র বস্তুতে খরচ করিয়া ফেলি। এইরূপ করা ঠিক নয়। অপরকে না ঠকাইয়া নিজের চেষ্টায় যে ধনী হইয়াছে সে যেমন অযথা খরচ করে না, তেমনি আত্মার জ্ঞানশক্তি ক্ষুদ্র বিষয় চিন্তায় আমাদের ব্যয় করা উচিত নহে। এই জ্ঞানশক্তি আমাদের অমূল্য মূলধন কিন্তু স্থূল বিষয়ে উহা আমরা খরচ করিয়া ফেলি। বলি রান্না ভাল হয় নাই, লবণ কম হইয়াছে। কয় রতি কম হইয়াছে, ভাই ? কণাভর লবণ কম হইয়াছে এই মহান্ বিচারেই আমাদের জ্ঞান খরচ হইয়া যায়। দেয়াল ঘেরা ঘরে ছেলেদের পড়ানো হয়। বলা হয় গাছতলায় গিয়া বসিলে কাক-কোকিল দেখিয়া তাহাদের মন একাগ্র হইবে না ! ছোট ছোট শিশু তো ! কাক-কোকিল দেখিল না ত হইয়া গেল একাগ্রতা ! আমরা হইয়াছি ঘোড়া ! আমাদের এখন শিং গজাইয়াছে। কেহ যদি আমাদের সাত দেয়ালের ভিতরেও পুরিয়া দেয় ত আমাদের একাগ্রতা হইবার নয়। কারণ দুনিয়ার ছোট-বড় সব ব্যাপারের চর্চা করা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। যে জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বর লাভ হইতে

পারে তাহা আমরা রান্নার আস্বাদের চর্চায় খরচ করি আর নিজেদের কৃতার্থ মনে করি।

এভাবে এই ভয়ানক সংসার আমাদের চারিদিকে—ভিতরে বাহিরে গিজ গিজ করিতেছে। আমরা প্রার্থনা করি, ভজন গাই। তাহাও বাহ্য কারণে। পরমেশ্বরে তন্ময় হইয়া ক্ষণিকের জন্যও তো সংসার ভুলিতে পারা যায় না। এইরূপ ভাবনাই হয় না! প্রার্থনাও লোক দেখানোর জন্য। কাজেই আসন করিয়া বসা আর চক্ষু বোজা সবই বৃথা। মনের গতি নিরন্তর বাহিরে ধাবিত হয় বলিয়া মানুষের সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কোনরূপ নির্ণয়, কোনরূপ নিয়ন্ত্রণশক্তি মানুষের থাকে না। একথার প্রমাণ আজ আমাদের দেশে পদে পদে দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষ বাস্তবপক্ষে পরমার্থ-ভূমি। লোকে জানে এখানকার লোক সেই যুগেই ঊর্ধ্বে বিচরণ করিত। কিন্তু এরূপ যে দেশ সেখানে আপনার আমার অবস্থা কি! ছোট ছোট ব্যাপারের এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও চর্বিতচর্বণ আমরা করি যে দেখিয়া দুঃখ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েই আমাদের চিত্ত ডুবিয়া আছে।

'কথা-পুরাণ-শ্রবণে, মিঠে নিদ আসে নয়নে।
শুয়েছি কি বিছানায়, ঘিরেছে শত চিন্তায়।
এমনি কর্মের গতি, কেঁদে নাই তা থেকে নিষ্কৃতি।'

কথা-পুরাণ শুনিতে যাই ত নিদ্রা পায় আর ঘুমাইতে যাই ত চিন্তা ও বিচার-চক্র শুরু হয়। একদিকে শূন্যাগ্রতা ত অন্যদিকে অনেকাগ্রতা। একাগ্রতা কোথাও নাই। মানুষ এমনই ইন্দ্রিয়ের দাস। কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "চোখ আধা বুজে থাকবে, এরূপ বলা হয়েছে কেন?" উত্তরে বলিয়াছিলাম, "কথাটা সোজা। চোখ পুরা বন্ধ করলে ঘুম পায়। খোলা রাখলে চারদিকে ছুটে বেড়ায়। একাগ্রতা আসে না। চোখ বুজলে ঘুম পায় এ হচ্ছে তমোগুণ। খুলে রাখলে চারদিকে দৌড়ায় এ হচ্ছে রজোগুণ। তাই মধ্যাবস্থার কথা বলা হয়েছে।"

তাৎপর্য, মনের ভাব পরিবর্তন ছাড়া একাগ্রতা হয় না। মনের ভাব শুদ্ধ হওয়া চাই। কেবল আসনে বসিলে তাহা হয় না। তার জন্য সকল আচরণ শুদ্ধ হওয়া চাই। আচরণ শুদ্ধ করার মানে আচরণের

উদ্দেশ্য বদলানো। ব্যক্তিগত লাভ, বাসনাতৃপ্তি কিংবা ঐরূপ কোন বাহ্য বিষয়ের জন্য কর্ম করিতে নাই।

আমরা সারাদিন কর্ম করি। সারাদিনব্যাপী এই দৌড়-ঝাঁপ কেন?

য়াজসাঠীঁ কেলা হোতা অট্টহাস।
শেঁবটচা দীস গোড় ব্‌হাবা॥

'অন্তিম সময় সুখের হবে তার জন্যই না এত হুটোপুটি, এত দৌড়-ঝাঁপ।' জীবনভর তিক্ত বিষ হজম করিয়াছি। কেন? সেই অন্তিম ক্ষণ, সেই মৃত্যু পবিত্র হোক এই বাসনায়। সন্ধ্যা দিবসের অন্তিম ক্ষণ। আজিকার দিনের সকল কর্ম যদি পবিত্র ভাবনা হইতে করিয়া থাকি ত রাত্রির প্রার্থনা আনন্দময় হইবে। দিনের ঐ অন্তিম ক্ষণ যদি আনন্দময় হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে দিনের সকল কাজ সফল হইয়াছে। তখন মনের একাগ্রতা আসিবে।

একাগ্রতার জন্য এরূপ জীবন-শুদ্ধি আবশ্যক। বাহ্য বস্তুর চিন্তন দূর হওয়া চাই। মানুষের জীবন দীর্ঘ নহে। তাহা হইলেও ভাগবত সুখের আস্বাদ লাভের সামর্থ্য এই আয়ুতেই আছে। দুইটি লোক একই ছাঁচের একই আকৃতির—দুই চোখ, তার মধ্যে এক নাক আর দুইটি নাসা-রন্ধ্র। এইরূপ সম্পূর্ণ এক রকমের হইলেও একজন দেবতুল্য হয় ত আর একজন হয় পশুতুল্য। এরূপ কেন হয়? একই পরমেশ্বরেব সন্তান, সব-ই এক খনির, তবু কেন এই ব্যবধান? মনে হয় না এই দুই মানুষ একই জাতির। এক নরে নারায়ণ অন্য নরে বানর।

মানুষ যে কত উচ্চে উঠিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দিবার মত লোক পূর্বেও ছিল, আজও আছে। ইহা অনুভূতির কথা। এই নরদেহ যে কত শক্তির আধার তাহার সাক্ষ্য সাধুসন্ত। আগেও তাঁরা ছিলেন, আজও আছেন। এই দেহে থাকিয়া মানুষ যদি এরূপ মহান কাজ করিতে পারে তবে আমিই বা পারিব না কেন? কেন আমি নিজের কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখি? যে নরদেহে থাকিয়া অন্যে নর-বীর হইয়াছে, সে নরদেহ আমিও পাইয়াছি, তবে আমার এ দশা কেন? কোথাও-না-কোথাও আমার ত্রুটি আছে। আমার এই চিত্ত অনুক্ষণ বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করে। অন্যের দোষগুণ দেখিতে উহা একান্ত উৎসুক হইয়া

রহিয়াছে। কিন্তু অন্যের দোষ-গুণ দেখার কী প্রয়োজন আমার ?

কাসয়া গুণদোষ পাহুঁ আণিকাঁচে।
মজ কায় উ্যাচে উণেঁ অসে ॥

'অন্যের দোষগুণ কেন দেখি ? আমার মধ্যে কি কিছু কম আছে ?' আমাতে কি দোষ কিছু কম ! অন্যের ছোটখাটো কথা লইয়া যদি মশগুল থাকি ত আমার চিত্তের একাগ্রতা আসিবে কিরূপে ? সে স্থলে আমার দুই অবস্থা হইতে পারে। এক—শূন্য অবস্থা অর্থাৎ নিদ্রা, আর দুই—অনেকাগ্রতা। তমোগুণ ও রজোগুণ এই দুইয়ে আমি পাক খাইতে থাকিব।

চিত্তের একাগ্রতার নিমিত্ত এভাবে বস, এভাবে চক্ষু রাখ, এভাবে আসন কর একথা ভগবান অবশ্যই বলিয়াছেন। কিন্তু চিত্তের একাগ্রতার জন্য ব্যাকুল হইলে না এসব কাজে লাগিবে ? চিত্তের একাগ্রতার জন্য আকুল হইলে মানুষ নিজেই সেই পথ খুঁজিয়া পায়।

॥ ২৮ ॥ জীবনের পরিমিতত্তা

চিত্তের একাগ্রতার পক্ষে আর এক সহায়ক, জীবনের পরিমিততা। সব কিছু মাপাজোখা হওয়া চাই। গণিতশাস্ত্রের এই বৈশিষ্ট আমাদের সকল কর্মে থাকা চাই। ঔষধের মত আহার-নিদ্রারও সময় এবং মাত্রা থাকা চাই। সর্বত্র হিসাব রাখা চাই। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপর পাহারা বসানো দরকার। অধিক খাইতেছি না ত, অধিক ঘুমাইতেছি না ত, প্রয়োজনের অধিক দেখিতেছি না ত—সর্বদা এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

কোন লোক সম্বন্ধে কেহ আমাকে বলিয়াছিল, "কারো ঘরে সে যায় ত ঘরের কোথায় কি আছে মুহূর্তে দেখে নেয়।" আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম, "ভগবান, এ ক্ষমতা আমার দরকার নাই।" আমি কি তাহার একান্ত সচিব যে সাত-সতের জিনিসের হিসাব মনে রাখিব ? অথবা আমাকে কি চুরি করিতে হইবে ? সাবান এখানে ছিল, ঘড়ি ওখানে ছিল। ওসবে আমার কি কাজ ? এই জ্ঞানে আমার কি দরকার ? চোখের এই ব্যর্থ ব্যবহার আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। কানের সম্বন্ধেও তাই। কানের উপর পাহারা বসাও। কেহ কেহ মনে করে, কুকুরের কানের

মত যদি আমাদের কান হইত ত বেশ হইত। যেদিকে ইচ্ছা মুহূর্ত মধ্যে ঘুরানো যাইত। ভগবান মানুষের কানে এই ত্রুটি রাখিয়াছেন। কিন্তু কানের এই প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তিতে আমার কাজ নাই। সেইরূপ এই মনও খুব চঞ্চল। একটু শব্দ হইয়াছে ত মন সেখানে গিয়া হাজির। অতএব জীবনে নিয়মন ও পরিমিততা আন। কুদৃশ্য দেখিও না। মন্দ বই পড়িও না। নিন্দাস্তুতি শুনিও না। সদোষ বস্তু ত নয়ই, নির্দোষ বস্তুও প্রয়োজনের অধিক গ্রহণ করিবে না। লোলুপতা আদৌ নয়। মদ, তেলেভাজা, রসগোল্লা ত নয়ই। কমলা, কলা, মোসাম্বি তাও অধিক নয়। ফলাহার শুদ্ধ কিন্তু তাহাও মাত্রা ছাড়াইয়া নয়। জিহ্বার স্বেচ্ছাচার অন্তর পুরুষের অসহ্য হওয়া চাই। উলটা পালটা পথে চলিলে ভিতরের মালিক সাজা দিবেন—এই ভয় ইন্দ্রিয়সমূহের থাকা চাই। নিয়মিত আচরণকেই জীবনের পরিমিততা বলে।

॥ ২৯ ॥ মঙ্গল-দৃষ্টি

তৃতীয় কথা, সমদৃষ্টির সাধনা। সমদৃষ্টির অর্থই হইল শুভদৃষ্টি। শুভদৃষ্টি লাভ না হইলে চিত্ত একাগ্র হয় না। সিংহ এত বড় বনরাজ। কিন্তু চার পা চলে ত একবার পিছন ফিরিয়া দেখে। হিংস্র সিংহের একাগ্রতা আসিবে কোথা হইতে? বাঘ, কাক, বিড়াল, ইহাদের চোখ সতত ঘোরে। দৃষ্টি ইহাদের চঞ্চল ও ভয়চকিত। হিংস্র প্রাণীর অবস্থা এইরূপই থাকিবে। সাম্যদৃষ্টি আসা চাই। সকল সৃষ্টি মঙ্গলময় মনে হওয়া চাই। নিজের উপর আমার যেরূপ বিশ্বাস সারা সৃষ্টির উপর তেমনি হওয়া চাই। এখানে ভয়ের কি আছে? সবই শুভ, সবই পবিত্র।

"বিশ্বং ভদ্র্ ভদ্রং যদবন্তি দেবাঃ"

এই বিশ্ব মঙ্গলময় কারণ ইহার দেখাশুনা করেন পরমেশ্বর। ইংরেজ কবি ব্রাউনিংও এইরূপই বলিয়াছেন: ঈশ্বর আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাই ত সমগ্র বিশ্ব ঠিক ভাবে চলিতেছে।

জগতে কোন গোলযোগ নাই। থাকে ত তাহা আমাদের দৃষ্টিতে। যেমন আমাদের দৃষ্টি তেমন এই সৃষ্টি। লাল রঙের চশমা পরিলে সৃষ্টি লাল দেখাইবে, মনে হইবে জলিতেছে।

গুরু রামদাস রামায়ণ লিখিতেন আর শিষ্যদের পড়িয়া শুনাইতেন।

হনুমান গুপ্তরূপে আসিয়া তাহা শুনিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "হনুমান অশোক বনে গেলেন। সেখানে তিনি সাদা ফুল দেখলেন।". ইহা শুনিবামাত্র হনুমান সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমি মোটেই সাদা ফুল দেখিনি, দেখেছিলাম লাল ফুল। তুমি ভুল লিখেছ, শুধরে নাও।" সমর্থ বলিলেন, আমি "ঠিক লিখেছি। তুমি সাদা ফুলই দেখেছিলে।" হনুমান বলিলেন, "আমি নিজে গিয়েছিলাম, আর আমি দেখেছি ভুল?" শেষটায় ঝগড়া গিয়া পৌঁছিল রামচন্দ্রের নিকটে। রামচন্দ্র বলিলেন, "ফুল সাদাই ছিল। কিন্তু হনুমানের চোখ তখন রাগে লাল হয়েছিল। তাই সাদা ফুল তার কাছে লাল মনে হয়েছিল।" এই মধুর কাহিনীর তাৎপর্য এই যে, যে দৃষ্টি দ্বারা আমরা জগতকে দেখিব জগতও আমাদের নিকট ঠিক তেমনি মনে হইবে।

এই সৃষ্টি শুভ এই নিশ্চিত বোধ যতদিন না জন্মে ততদিন একাগ্রতা আসে না। এই সৃষ্টি ভাল নয় এই ভাব যতদিন থাকিবে ততদিন ভয়চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতে থাকিব। কবিরা পাখিদের স্বাধীনতার গান গাহিয়া থাকেন। তাঁহাদের বলিব, একবারটি পাখি হইয়া দেখুন, তখন বুঝিতে পারিবেন পাখিদের স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু। পাখির ঘাড় সতত সামনে-পিছনে ঘুরিয়া থাকে। সারাক্ষণ অন্যের ভয়ে ভীত। পক্ষীকে আসনে বসাইয়া দাও। উহা কি একাগ্র হইয়া যাইবে? একটু কাছে গিয়াছ কি সে উড়িয়া যাইবে। মনে করিবে এই বুঝি আমাকে মারিতে আসিল। যাহার মনে এইরূপ সাংঘাতিক ভয়—সমস্ত জগৎ ভক্ষক-সংহারক, তাহার শান্তি কোথায়? আমার রক্ষক একমাত্র আমি নিজে, আর সবই ভক্ষক এই ভার দূর না হইলে একাগ্রতা আসে না। সমদৃষ্টির ভাবনাই একাগ্রতা লাভের উত্তম উপায়। সর্বত্র মঙ্গল দেখিতে থাকুন, চিত্ত আপনা হইতে শান্ত হইয়া যাইবে।

কোন লোক দুঃখে পড়িয়াছে। তাহাকে কুলকুল বহমানা নদীর কিনারায় লইয়া যান। নদীর নির্মল শান্ত প্রবাহ দেখিয়া তাহার অস্থিরতা কমিয়া যাইবে। সে দুঃখ ভুলিয়া যাইবে। ঐ স্রোতের মধ্যে এই শক্তি কোথা হইতে আসিল? পরমেশ্বরের কল্যাণী শক্তি উহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। বেদে ঝরনার সুন্দর বর্ণনা আছে:

"অভিষ্ঠন্তীনাম্ অনিবেশনানাম্"

এই হইতেছে ঝরনা। ঝরনা অখণ্ড বহিয়া চলে। তার নিজের কোন ঘর-দুয়ার নাই। সে সন্ন্যাসী। এই পবিত্র ঝরনা মুহূর্তে আমার মন একাগ্র করিয়া দেয়। ঐ সুন্দর ঝরনা দেখিয়া প্রেমের, জ্ঞানের ঝরনা নিজের মনে কেন না সৃষ্টি করিয়া লই ?

বাহিরের এই জড় জল যদি আমার মনকে এতটা শান্তি দান করিতে পারে, তবে আমার মানস-উপত্যকায় যদি ভক্তি ও জ্ঞানের চিন্ময় ঝরনা বহিতে থাকে ত আমার মন কতই না শান্তি লাভ করিবে !

আমার এক বন্ধু হিমালয়ে কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তথাকার পবিত্র পর্বতের রমণীয় জলপ্রবাহের বর্ণনা আমাকে লিখিয়া পাঠাইতেন। আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, "যে জল-স্রোত, যে পর্বতমালা, যে শুভ সমীর তোমাকে ওখানে অনুপম আনন্দ দিচ্ছে সে সবের উপলব্ধি আমি আমার নিজের হৃদয়ের মধ্যেই করছি। অতএব আমার অন্তঃসৃষ্টিতে সে সকল রমণীয় দৃশ্য আমি নিত্য দেখতে পাই। সুতরাং তুমি ডাকলেও আমার হৃদয়স্থিত ভব্য দিব্য হিমালয় ছেড়ে আমি যাব না।"

স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।

স্থিরতা লাভের জন্য স্থিরতার মূর্তি স্বরূপ যে হিমালয়ের উপাসনা করা দরকার, সে হিমালয়ের বর্ণনা শুনিয়া লুব্ধ হইয়া আমি যদি কর্তব্য ছাড়ি ত তাতে কি লাভ হইবে ?

সারাংশ, চিত্ত একটু শান্ত করুন। চিত্তকে মঙ্গল দৃষ্টিতে দেখুন। তখন আপনার হৃদয়ে অনন্ত ঝরনা বহিতে থাকিবে। কল্পনার দিব্য তারকা রাজি হৃদয়াকাশে ঝিকমিক্ করিতে থাকিবে। পাথরের ও মাটির শুভ বস্তু দেখিয়া যদি চিত্ত শান্ত হয় তবে অন্তঃসৃষ্টির দৃশ্য দেখিয়া কেন হইবে না ? এক সময়ে আমি ত্রিবাঙ্কুর গিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্রের কিনারায় বসিয়া ছিলাম। ঐ অপার সমুদ্র, ঐ সোঁ সোঁ গর্জন, আর সময়টি ছিল সন্ধ্যা। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। আমার বন্ধু খাওয়ার জন্য কিছু ফল ইত্যাদি সমুদ্রের কিনারায় আনিয়া দিলেন। সে সময়ে ঐ সাত্ত্বিক আহারও আমার কাছে বিষের মত লাগিয়াছিল। সমুদ্রের

ঐ ওঁ ওঁ গর্জন আমাকে 'মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ' এই গীতাবচন স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। সমুদ্র অনুক্ষণ স্মরণ করিতেছিল ও কর্ম করিতেছিল। ঢেউ আসে, চলিয়া যায়, আবার আসে। ক্ষণিকের জন্যও বিরাম নাই। সে দৃশ্য দেখিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আসলে, ঐ সমুদ্রে ছিল কী? ঐ নোনা জলের ঢেউ দেখিয়া আমার হৃদয় যদি নাচিয়া ওঠে তাহা হইলে জ্ঞান ও প্রেমের অগাধ সাগর রূপী হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতে দেখিয়া কতই না নাচিব! বৈদিক ঋষিদের হৃদয়ে এইরূপ সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইত—

অন্তঃসমুদ্রে হৃদি অন্তরায়ুষি
ঘৃতস্য ধারা অভিচাকশীমি
সমুদ্রাদূর্মির্মধু মাং উদারৎ।

এই দিব্য ভাষার উপর ভাষ্য লিখিতে গিয়া বেচারা ভাষ্যকারদের কি-না দুর্দশা হইয়াছিল! কেমন ঐ ঘৃতের ধারা? কেমন ঐ মধুর ধারা? আমার হৃদয়ে দুধ-ঘি ও মধুর ঢেউ উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

॥ ৩০ ॥ বালক গুরু

হৃদয়ের এই সমুদ্রকে দেখিতে শিখ। বাহিরের নিরভ্র নীল আকাশ দেখিয়া চিত্তকেও অলিপ্ত ও নির্মল বানাও। বস্তত চিত্তের একাগ্রতা এক খেলা। সাধারণ কথা। চিত্তের ব্যগ্রতাই অস্বাভাবিক ও অনৈসর্গিক। শিশুদের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে দেখ। শিশু পলকহীন দৃষ্টিতে দেখে। তুমি দশ বার পলক ফেলিবে। শিশুর একাগ্রতা শীঘ্র হয়। চার-পাঁচ মাসের শিশুকে বাহিরের শস্যশ্যামলা সৃষ্টি দেখাও। এক দৃষ্টিতে সে দেখিতে থাকিবে। স্ত্রীলোকেরা বলে, বাহিরের গাঢ় সবুজ লতাপাতা দেখিয়া শিশুদের মলের রং পর্যন্ত সবুজ হইয়া যায়। সকল ইন্দ্রিয়কে চক্ষু বানাইয়া যেন তাহারা দেখে। শিশুদের মনে যে কোন ঘটনার গভীর ছাপ পড়ে। প্রথম দুই-চার বছরে শিশুরা যে শিক্ষা লাভ করে, শিক্ষা-

বিদ্‌দের মতে তাহাই তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা। আপনি যতই বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা ও সংঘ প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, আরম্ভে যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে তাহা আর পাওয়া যাইবে না। শিক্ষার ব্যাপারে আমার যোগ আছে! বাহিরের এই শিক্ষা শূন্যপ্রায়, এই বিশ্বাস আমার দিন দিন দৃঢ় হইতেছে। প্রারম্ভিক সংস্কার বজ্রলেপ হইয়া যায়। পরবর্তী শিক্ষা ইইতেছে পালিশ, উপরের চুনকাম মাত্র। সাবান মাখিলে উপরের দাগ দূর হয়। কিন্তু চামড়ার কালো রং যায় না। তেমনি প্রারম্ভিক সংস্কার দূর হওয়া শক্ত! কিন্তু, এই প্রারম্ভিক সংস্কারই বা বলবান কেন আর পরবর্তী সংস্কারই বা দুর্বল কেন? তার কারণ শৈশবে চিত্তের একাগ্রতা প্রকৃতিগত। একাগ্রতা হেতু যে সংস্কার শৈশবকালে গড়িয়া ওঠে তাহা দূর হইবার নয়। চিত্তের একাগ্রতার এমনই মহিমা। এই একাগ্রতা যে লাভ করিয়াছে তাহার কাছে কিছুই অসাধ্য নয়।

আমাদের সারা জীবন আজ কৃত্রিম হইয়া গিয়াছে। বালবৃত্তি মরিয়া গিয়াছে। জীবনে প্রকৃত রস নাই। জীবন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা উলটা-পালটা যেমন-তেমন চলিতেছি। ডারউইন সাহেব নয়, আমরাই আমাদের আচরণ দ্বারা প্রমাণ করিতেছি যে—বানরই মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল।

শিশু বিশ্বাসপরায়ণ। মা যাহা বলে তাহা তার কাছে প্রমাণ। তাকে যে গল্প বলা হয় তাহা তার কাছে অসত্য মনে হয় না। কাক বলিল, চড়ুই বলিল, সবই তার কাছে সত্য মনে হয়। শিশুদের এই মঙ্গল-বৃত্তির জন্য উহাদের একাগ্রতা এত শীঘ্র আসে।

॥ ৩১ ॥ অভ্যাস, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা

সারাংশ, ধ্যানযোগের জন্য চিত্তের একাগ্রতা, জীবনের পরিমিততা ও শুভ সাম্য-দৃষ্টি আবশ্যক। ইহা ছাড়া আরও দুইটি উপায় বা সাধনের কথা বলা হইতেছে—বৈরাগ্য ও অভ্যাস। একটি বিনাশী আর অপরটি সৃজনী। ক্ষেত হইতে ঘাস উপড়াইয়া ফেলা বিধ্বংসী কর্ম। উহাকে বৈরাগ্য বলে। ক্ষেতে বীজ বোনা বিধাত্মক কর্ম। মনে সদ্‌বিচারসমূহের

পুনঃ পুনঃ চিন্তন করাকে অভ্যাস বলে। বৈরাগ্য বিধ্বংসী ক্রিয়া, অভ্যাস সৃজনী ক্রিয়া।

বৈরাগ্য লাভের উপায়? আমরা বলি আম মিঠা। কিন্তু মধুরতা কি কেবল আমেই আছে? না, কেবল আমেই নয়। আমাদের আত্মার মধুরতা আমরা বস্তুতে ঢালিয়া দিই তবেই তাহা মিঠা লাগে। অতএব ভিতরের মধুরতা আস্বাদ করিতে শেখো। কেবল বাহ্য বস্তুতে মধুরতা নাই। বরং ঐ যে 'রসানাং রসত্তমঃ' মাধুর্যসাগর আত্মা আমাতে বিদ্যমান তাহা হইতে মধুর জিনিসে মাধুর্য আসে, এরূপ ভাবনা মনে চলিতে থাকিলে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। সীতা হনুমানকে মোতির মালা দিলেন। হনুমান মোতি চিবান, দেখেন আর ফেলিয়া দেন। তিনি উহাতে রাম দেখিতে পাইলেন না। রাম ছিলেন তাঁহার হৃদয়ে। ঐ মোতির জন্য নির্বোধ লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে।

এই ধ্যানযোগের বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান প্রারম্ভেই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলিয়াছেন। তাঁহা এই, আমার "নিজেরই নিজের উদ্ধার করতে হবে। আমি এগিয়ে যাব। উর্ধ্বে উঠব। নরদেহে যেমন তেমন ভাবে পড়ে থাকব না। ভগবানের নিকট যাওয়ার জন্য সাহসের সঙ্গে প্রযত্ন করব।" এরূপ দৃঢ় সংকল্প হওয়া চাই।

এসব শুনিয়া অর্জুনের মনে শংকা জন্মিল। তিনি বলিলেন, "ভগবান, এখন ত বয়স হয়েছে। দু'দিন বাদে মরে যাব। এ সাধনা তবে কোন্ কাজে লাগবে?" ভগবান বলিলেন, "মৃত্যু মানে দীর্ঘ নিদ্রা।" দিনের কাজের পরে সাত-আট ঘণ্টা আমরা ঘুমাই। সেই নিদ্রাকে কি আমরা ভয় করি? উল্টা, ঘুম না আসে ত আরও ভাবনায় পড়ি। নিদ্রা যেমন দরকার, মৃত্যুও তেমনি দরকার। ঘুম হইতে উঠিয়া আমরা আবার কাজ শুরু করি। তেমনি মৃত্যুর পরে পূর্বেকার সকল সাধনা আমাদের কাজে আসিবে। এই প্রসঙ্গে লিখিতে গিয়া জ্ঞানদেব জ্ঞানেশ্বরীতে ওবী ছন্দে যেন আত্মচরিত লিখিয়া ফেলিয়াছেন:

বালপণীঁ চ সর্বজ্ঞতা। বরী তয়াতেঁ।
সকল শাস্ত্রেঁ স্বয়ম্ভেঁ। নিঘতী মুখেঁ।

'শৈশবকালেই সর্বজ্ঞতা লাভ হয়।' সমস্ত শাস্ত্র মুখে মুখে প্রকাশ পায়।'

এই সব বচনে ইহারই আভাস পাওয়া যায়। কাঁহারও কাঁহারও চিত্ত বিষয়ের দিকে যায়ই না। মোহ যে কি তাহা তাঁহারা জানেনই না। তার কারণ সে সাধনা পূর্ব জন্মেই তাঁহারা করিয়া আসিয়াছেন।

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

যে মানুষ কল্যাণ-মার্গ ধরিয়া চলে তাহার কোন চেষ্টাই ব্যর্থ যায় না। এরূপ আশ্বাস অন্তে দেওয়া হইয়াছে। যাহা কিছু অপূর্ণতা আছে তাহা শেষে পূর্ণ হইবে। ভগবানের এই উপদেশের মর্ম উপলব্ধি করুন, আর নিজের জীবন সার্থক করিয়া তুলুন।

রবিবার, ২৭-৩-১৯৩২

সপ্তম অধ্যায়

প্রপত্তি অথবা ঈশ্বর-শরণতা

॥ ৩২ ॥ ভক্তির দিব্য দর্শন

বন্ধুগণ,

অর্জুনের সামনে স্বধর্ম পালনের প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহার মনে স্বজন ও পরজন এইরূপ মোহ জন্মে আর তিনি স্বধর্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার পথ খুঁজিতে থাকেন। তাঁহার এই অকারণ মোহ প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে। আর এই মোহ দূর করার জন্যই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা। সেখানে তিনটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত করা হইয়াছে, (১) আত্মা অমর ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, (২) দেহ নাশবান, (৩) স্বধর্ম কখনও ত্যাগ করিতে নাই। আর সেই সঙ্গে যাহা দ্বারা এইসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যায় সেই ফলত্যাগরূপ উপায়ের কথাও বলা হইয়াছে। এই কর্মযোগের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম এই তিন বিষয়ের উদ্ভব হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা কর্ম ও বিকর্মের সংযোগে উৎপন্ন অকর্মের স্বরূপ দেখিয়াছি। ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিকর্মের স্বরূপ বর্ণনার প্রারম্ভ হইয়াছে এবং সাধনার পক্ষে আবশ্যক একাগ্রতার কথাও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

আজ সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনা। এই অধ্যায়ে বিকর্মের এক সুন্দর নূতন প্রকোষ্ঠ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সৃষ্টিদেবীর আঙিনায় কোনও বিশাল বনে আমরা যেমন নানা মনোহর দৃশ্য দেখি, গীতা-গ্রন্থেও সেইরূপ দেখিতে পাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ে একাগ্রতার স্বরূপ দেখিয়াছি। এখন অন্য এক প্রকোষ্ঠে আমরা একবার প্রবেশ করিয়া দেখি।

এই কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটনের পূর্বেই ভগবান এই মোহ-সৃষ্টিকারী জগৎ-রচনার রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। একই রকম কাগজে একই তুলিতে চিত্রকর নানা চিত্র আঁকে। সেতার বাদক সাতটি স্বরের দ্বারা অনেক রাগের সৃষ্টি করে। বাহান্নটি অক্ষরের সহায়তায় আমরা নানাবিধ চিন্তাধারা ব্যক্ত করি। এই সৃষ্টির রহস্যও তাহাই। সৃষ্টিতে অনন্ত বস্তু ও অনন্ত বৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু এই সারা অন্তর্বাহ্য সৃষ্টি একই

অখণ্ড আত্মা এবং একই অষ্টধা প্রকৃতির সংযোগে তৈরী। ক্রোধী মানুষের ক্রোধ, প্রেমী মানুষের প্রেম, দুঃখিতের ক্রন্দন, আনন্দিতের আনন্দ, অলসের নিদ্রা-প্রবণতা, উদ্‌যোগীর কর্মস্ফূর্তি, সবই এক চৈতন্যশক্তির খেলা। এই পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের মূলে একই চৈতন্য বিরাজমান। ভিতরের চৈতন্য একই। সেইরূপ বাহ্য আবরণের স্বরূপও একই। চৈতন্যময় আত্মা ও জড় প্রকৃতি এই দ্বিবিধ উপাদান হইতে সারা সৃষ্টির উদ্ভব একথা প্রারম্ভেই ভগবান বলিয়া দিতেছেন।

আত্মা ও দেহ, পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্বত্র একই। তবুও মানুষ মোহে পড়ে কেন? ভেদ দেখা দেয় কেন? প্রিয়জনকে দেখিয়া মন উৎফুল্ল হয়, আবার পরিচয়হীন কাহাকেও দেখিলে মন সাড়া দেয় না। একজনের সহিত মিলনের এবং অপরকে এড়ানোর ইচ্ছা হয় কেন? একই পেন্সিল, একই কাগজ, একই চিত্রকর; কিন্তু বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত হয়। এখানেই চিত্রকরের কুশলতা। চিত্রকরের ও সেতার-বাদকের অঙ্গুলিতে এমনই নৈপুণ্য যে সে আমাদের কাঁদায়, হাসায়। বিশেষত্ব সবই তার ঐ আঙুলের।

এ কাছে থাক্, সে দূরে যাক্, ইহা আমার, উহা অন্যের, এই যে ভাব মনে আসে তার ফলে মানুষ আপন কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হয়। এ সকলেরই মূলে রহিয়াছে মোহ। এই মোহ হইতে বাঁচিতে হইলে সৃষ্টিকর্তার অঙ্গুলি-চাতুর্যের রহস্য জানিতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে নাকারার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। একই নাকারা হইতে নানাবিধ ধ্বনি বাহির হয়। কোনটিতে আমি ভীত হই, কোনটিতে নাচিতে থাকি। এই সকল ভাব জয় করিতে হইলে ধরিতে হয় নাকারা-বাদককে। তাহাকে ধরিতে পারিলে সকল নাদ ধরা পড়িয়া যায়। একটি বাক্যে ভগবান বলিতেছেন, "যে মায়া থেকে মুক্ত হতে চায় সে আমার শরণ নিক।"

য়েথ এক চি লীলা তরলে, জে সর্বভাবেঁ মজ ভজলে।
তয়াঁ ঐলী চি থডী সরলেঁ, মায়াজল।

"এখানে সেই ব্যক্তিই লীলা হইতে মুক্তি পায় যে সর্বভাবে আমার ভজনা করে, তাহার জন্য সংসারের মায়াজল শুকাইয়া যায়।"

এই মায়া কি ? মায়া মানে ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহার কলা, তাঁহার কুশলতা। আত্মা ও প্রকৃতি কিংবা জৈন পরিভাষায় বলিলে জীব ও অজীবরূপী এই উপাদান হইতে যিনি এই অনন্ত রঙবেরঙের সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন তাঁহার যে শক্তি বা কলা তাহাই মায়া। জেলে যেমন সেই একই সজি-রুটি ও একই সর্বরসী ডাল, অখণ্ড আত্মাও তেমন একই, আর অষ্টধা প্রকৃতিও একই। তাহা হইতে ভগবান নানা জিনিস বানাইতেছেন। এই সব জিনিস দেখিয়া ভালমন্দ নানা বিরোধী ভাব আমরা অনুভব করি। সত্যিকার শান্তি পাইতে হইলে এই সব বস্তুর উপরে উঠিয়া স্রষ্টাকে ধরিতে হইবে। তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে হইবে। তাঁহাকে জানিলে, বুঝিলে এই ভেদজনক, আসক্তিমূলক মোহ দূর করা যাইবে।

সেই পরমেশ্বরকে বুঝিবার এক মহান্ সাধন, এক মহান্ বিকর্ম নির্দেশ করার জন্য সপ্তম অধ্যায়ে গীতা ভক্তিরূপ সুন্দর ভবন খুলিয়া দিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধির জন্য যজ্ঞ-দান, জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি বহু বিকর্মের কথা বলা হয়। এই সব সাধনকে আমি সোডা, সাবান ও রিঠার সহিত তুলনা করি। কিন্তু ভক্তি হইতেছে জল। সোডা, সাবান, রিঠা পরিষ্কার করে কিন্তু জল ছাড়া এই সকলের চলে না। জল বিনা উহারা কোন কাজে আসে না। কিন্তু সোডা, সাবান, রিঠা না হইলেও কেবল জলই ময়লা দূর করিতে পারে। জলের সহিত এদের সংযোগ হইলে **'অধিকস্য অধিকং ফলম্'** হইবে। তাহা যেন দুধে চিনি সংযোগ। যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান, তপ এসবে যদি আন্তরিকতা না থাকে তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে কিরূপে ? অন্তর ঢালিয়া দেওয়াকেই বলে ভক্তি।

সর্বপ্রকার সাধনাতেই ভক্তির প্রয়োজন। ভক্তি এক সার্বভৌম উপায়। সেবাশাস্ত্র শিখিয়া চিকিৎসার জ্ঞানলাভ করিয়া কোন লোক রোগীর পরিচর্যার জন্য গেল। কিন্তু তাহার মনে যদি সেবাভাব না থাকে তবে ঠিক ঠিক সেবা হইবে কিরূপে ? বলদ খুব মোটাসোটা হইতে পারে কিন্তু গাড়ী টানার ইচ্ছা যদি না থাকে তবে ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া যাইবে। গাড়ীটাকে কোন গর্তেও ঠেলিয়া দিতে পারে। যে কার্যে আন্তরিকতা নাই তাহা তুষ্টিকরও নয়, পুষ্টিকরও নয়।

॥ ৩৩ ॥ ভক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ

এই ভক্তি লাভ হইলে সেই মহান্ চিত্রকরের কলা আমরা দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব তাঁহার হাতের সেই কলম। ঐ উৎসের সন্ধান যে পাইয়াছে, ঐ অপূর্ব রস যে একবার আস্বাদ করিয়াছে তাহার কাছে বাকি সব রস ফিকা ও নীরস মনে হইবে। যে আসল কলা খাইয়াছে, কাঠের রঙ্গীন কলা সে হাতে লইবে, 'বেশ সুন্দর ত' একথাও বলিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া দিবে। আসল কলার স্বাদ যে পাইয়াছে নকল কলার আগ্রহ তাহার হইবে কেন? তেমনি আসল ঝরনার মাধুর্য যে অনুভব করিয়াছে তাহাকে রঙ্গীন জলের কৃত্রিম ফোয়ারা আকৃষ্ট করিতে পারে না।

এক তত্ত্বজ্ঞানীকে কোন লোক বলিয়াছিল, "মহারাজ, শহরে আজ খুব আলোকসজ্জা হয়েছে, দেখবেন চলুন"। তত্ত্বজ্ঞানী বলিলেন, "আলোক-সজ্জা মানে কি? একটি বাতি, তারপর আর একটি, এইভাবে লাখ, দশ লাখ, কোটি যত ইচ্ছে বাড়িয়ে যাও। এই ত আলোকসজ্জা।" গণিত-প্রগতিতে ১+২+৩ এভাবে অনন্ত পর্যন্ত চলিয়াছে। সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান কত জানা থাকিলে সমস্ত সংখ্যা লেখার দরকার হয় না। তেমনি একটির পর আর একটি দীপ রাখা হইয়াছে। ইহাতে এমন উল্লসিত হওয়ার কি আছে? কিন্তু মানুষের ইহাতেই আনন্দ। সে লেবু আনিবে, চিনি আনিবে; তাহা জলে মিশাইয়া খাইয়া বলিবে,—"আঃ, কী চমৎকার সরবৎ হইয়াছে।" স্বাদগ্রহণ ছাড়া জিহ্বার যেন আর কোন কাজ নাই। ইহাতে ইহা মিশাও, উহাতে উহা মিশাও এইরূপ সাত-পাঁচ মিশাইয়া তাহার স্বাদ লওয়াতেই যত সুখ। ছেলেবেলায় একবার আমি সিনেমা দেখিতে যাই। সঙ্গে এক টুকরা চট লইয়া গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য, ঘুম পাইলে শুইয়া পড়িব। পরদায় চোখ ঝল্সানো আগুন দেখিতে লাগিলাম। সেই অগ্নিচিত্র দুই-চার মিনিট দেখার পর চক্ষু ক্লান্ত হইয়া গেল। আমি চটের উপর শুইয়া পড়িলাম ও সাথীদের বলিলাম নাটক শেষ হইলে আমাকে জাগাইয়া দিও। রাত্রিকালে বাহিরের খোলা হাওয়ায় আকাশের চন্দ্র-তারকা না দেখিয়া, শান্ত সৃষ্টির নির্মল আনন্দ উপভোগ না

করিয়া, কেন যে লোকে বাতাস-বন্ধ রঙ্গমঞ্চে বসিয়া আগুনের পুতুলের নাচ দেখে, হাততালি দেয়—তাহা আমি ভাবিয়া পাই না।

মানুষ এমন নিরানন্দ কেন? হায়, ঐ নির্জীব পুতুল দেখিয়া আনন্দের তৃষ্ণা মিটায়! জীবনে আনন্দ নাই তাই এরূপ কৃত্রিম আনন্দের খোঁজ করে। একবার আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ীতে ঝমঝম বাজনা বাজিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের বাজনা?" বলিল, "ছেলে হয়েছে।" জগতে একমাত্র তোমারই কি ছেলে হইয়াছে যে ঢোল বাজাইয়া জগতকে বলিতেছ তোমার ছেলে হইয়াছে? ছেলে হইলে হৈ চৈ পড়ে, লোকে নাচে, গান গায়। ইহা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কি? আনন্দের যেন দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যের কণা দেখিলেই যেমন ক্ষুধিতের দল ঝাঁপাইয়া পড়ে, এও ঠিক তেমনি। ছেলে হয়, সার্কাস আসে, সিনেমা আসে আর অমনি আনন্দের ভিখারীরা উল্লাসে মত্ত হইয়া উঠে।

ইহা কি যথার্থ আনন্দ? সংগীতের ঝঙ্কার কানে প্রবেশ করে আর তার ঢেউ গিয়া লাগে মস্তিষ্কে। রূপ চোখে লাগে আর মগজে গিয়া ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কার মধ্যেই বেচারাদের আনন্দ ভরিয়া আছে। কেহ তামাক গুঁড়া করিয়া নাকে ঠাসে; কেহ বা বিড়ি বানাইয়া মুখে টানে। ঐ নস্যের বা ঐ ধোঁয়ার ধাক্কা গিয়া মস্তিষ্কে লাগিল আর যেন আনন্দের বোঁচকা লাভ হইল। বিড়ির টুকরা মিলিল ত আনন্দের সীমা রহিল না। টলস্টয় লিখিয়াছেন, "সিগারেটের আবেশে লোক লোককে খুনও করতে পারে।" উহা এক প্রকারের নেশাই ত।

এইরূপ আনন্দে লোক মত্ত হয় কেন? কারণ তাহার যথার্থ আনন্দের খোঁজ জানা নাই। ছায়ার পিছনে মানুষ পাগল। আজ সে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেছে। চক্ষু-ইন্দ্রিয় যদি না থাকিত তবে সে মনে করিত জগতে চার ইন্দ্রিয়েরই আনন্দ আছে। কাল যদি মঙ্গল গ্রহ হইতে ছয় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট কোন জীব নামিয়া আসে ত পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী কাঁদিতে আরম্ভ করিবে আর বলিবে, "এর তুলনায় আমরা কত কাঙ্গাল।"

সৃষ্টির পূর্ণ অর্থ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচরে কি করিয়া আসিবে?

বেচারা মানুষ এই পাঁচ বিষয়েও নানারূপ বাছাই করে আর তাহাতে ডুবিয়া থাকে। গাধার চিৎকার কানে আসে ত মনে করে কোথা হইতে এই অশুভ চীৎকার আসিল ? তোমাকে দেখিলে কি ঐ গাধারও অশুভ হইবে না ? অন্যের দ্বারা তোমার হানি হইলে তোমার দ্বারা কাহারও কি কিছু হানি হয় না ? মানিয়া লইলাম গাধার ডাক অশুভ। তখন আমি বরোদা কলেজে পড়িতাম। সে সময় জনকয়েক ইউরোপীয় গায়ক আসিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহারা ভাল গায়ক—তাহাদের দিক হইতে তাঁহারা নৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মনে হইতেছিল কখন ওখান হইতে পালাইয়া বাঁচিব। কারণ ঐরূপ গান শুনিতে কান অভ্যস্ত ছিল না। তাঁহাদের আমি ফেল করিয়া দিলাম। আমাদের এখানকার গায়কেরা যদি ঐ দেশে যান তবে তাঁহারাও এইরূপ আনাড়ীই বিবেচিত হইবেন। সঙ্গীতে একজনের আনন্দ হয় ত আর একজনের হয় না। তার মানে উহা যথার্থ আনন্দ নয়, কৃত্রিম আনন্দ। যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত আনন্দের দর্শন না হয় ততদিন আমরা এই কৃত্রিম আনন্দে মজিয়া থাকিব। আসল দুধ না খাওয়া পর্যন্ত, আটাগোলা দুধই অশ্বত্থামা দুধ জ্ঞানে খাইত। তেমনি যখন যথার্থ আনন্দের স্বরূপ বুঝিবেন, তাহা আস্বাদ করিবেন তখন অপর সব কিছু ফিকা লাগিবে।

এই আনন্দে পৌঁছিবার উৎকৃষ্ট পথ ভক্তি। এই পথে চলিতে চলিতে ঈশ্বরীয় কুশলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই দিব্য ভাবনা আসিলে অপর সকল ভাবনা আপনা হইতেই লোপ পাইবে। তখন ক্ষুদ্র আকর্ষণ থাকিবে না। তখন জগৎ-জোড়া এক আনন্দই চোখে পড়িবে। মিঠাইয়ের শত দোকান থাকিলেও মিঠাই কিন্তু সেই একই। যতদিন আসল বস্তু লাভ না হয় ততদিন চঞ্চল পাখির মত এক জিনিষ খাইব এখানে আর এক জিনিষ খাইব ওখানে। ভোরবেলা তুলসী রামায়ণ পড়িতে-ছিলাম। বাতির কাছে পোকার ভিড় হইতেছিল। ইতিমধ্যে ওখানে একটা টিকটিকি আসিয়া হাজির। আমার রামায়ণে কি তার কাজ ? পোকা দেখিয়া তাহার মহা আনন্দ ! পোকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে এমন সময় আমি একটু হাত নাড়িলাম। টিকটিকিটা সরিয়া গেল। কিন্তু পলকহীন দৃষ্টি তার পোকার উপর। মনে মনে বলিলাম, 'তুই পোকা

খাচ্ছিস ? তোর জিভ থেকে জল পড়ছে ? আমার জিভে জল আসছে না। যে আনন্দ আমি লুটছি হতভাগা টিকটিকি তা তুই বুঝবি কি করে !" রামায়ণের রস আস্বাদনের শক্তি তার ছিল না। আমাদের দশা ঐ টিকটিকিরই মতো। নানা রসে আমরা মত্ত। যথার্থ রস মিলিলে কতই না মজা ! যে সাধন দ্বারা সেই সত্যকার রস আস্বাদন করা যায়, ভক্তিরূপ সেই সাধনের পথ ভগবান দেখাইতেছেন।

॥ ৩৪ ॥ সকাম ভক্তিরও মূল্য আছে

তিন প্রকার ভক্তের কথা ভগবান বলিয়াছেন। (১) সকাম ভক্ত, (২) নিষ্কাম কিন্তু একাঙ্গী ভক্ত, (৩) জ্ঞানী অর্থাৎ পূর্ণ ভক্তির সাধক। নিষ্কাম কিন্তু একাঙ্গী ভক্তির সাধক আবার তিন প্রকারের : (১) আর্ত, (২) জিজ্ঞাসু, (৩) অর্থার্থী। ভক্তি-বৃক্ষের এই সব শাখা-প্রশাখা।

সকাম ভক্ত মানে কি ? মনে কোন কামনা লইয়া পরমেশ্বরের কাছে যাইতে অভিলাষী। এই ভক্তি নিকৃষ্ট স্তরের একথা বলিয়া ইহার নিন্দা করিব না। অনেকে মান-সম্মানের আশায় সার্বজনীন কাজ করে। তাহাতে ক্ষতি কি ? তাহাদের মান দিন। খুব সম্মান দিন। মান-সম্মান দিলে কিছু ক্ষতি হইবে না। এরূপ সম্মান মিলিতে থাকিলে এক সময়ে সে সার্বজনীন কার্যে স্থির হইয়া যাইবে। পরে ঐ কাজে সে আনন্দ পাইবে। সম্মান লাভ হইবে এই যে ইচ্ছা, আসলে তাহার অর্থ কি ? অর্থ হইল, আমরা যে কাজ করিতেছি তাহা যে উত্তম ঐ সম্মান হইতে এই বিশ্বাস আমাদের দৃঢ় হয়। যে সেবা করিতেছি তাহা ভাল কি মন্দ তাহা নির্ণয় করার আভ্যন্তরীণ সাধন যাহার নাই, সে বাহ্য সাধনের আশ্রয় লয়। মা সন্তানের পিঠ চাপড়াইয়া বলে, 'শাবাশ'। তার ফলে সন্তানের মনে মায়ের কাজ করার উৎসাহ আরও বাড়ে। সকাম ভক্তির বেলায়ও এই কথা। সকাম ভক্ত সোজা ভগবানের কাছে গিয়া বলিবে, 'দাও'। ভগবানের কাছে গিয়া সবকিছু চাওয়া সামান্য ব্যাপার নয়। উহা অসাধারণ কথা।

জ্ঞানদেব নামদেবকে বলিলেন, "তীর্থে যাবেন ?" নামদেব বলিলেন, "কেন ?" জ্ঞানদেব বলিলেন, "সাধুসন্তের সমাগম হবে।" নামদেব

বলিলেন, "দাঁড়াও, ভগবানকে জিজ্ঞেস করে আসি।" নামদেব দেবালয়ে গেলেন। ভগবানের সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখ হইতে ধারা বহিতে লাগিল। ভগবানের যুগল চরণের দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভু, যাব কি?" জ্ঞানদেব পাশেই ছিলেন। এই নামদেবকে কি পাগল বলিলেন? এমন লোকের অভাব নাই স্ত্রী ঘরে না থাকিলে যারা কাঁদে, কিন্তু ভগবানের কাছে যে ভক্ত কাঁদে, হইলই বা সে সকাম ভক্ত, তবু সে অসাধারণ। যাহা চাওয়ার মত অজ্ঞানতাবশত তাহা সে চায় না এইমাত্র; কিন্তু সেইজন্য তাহার সকাম ভক্তি ছাড়া উচিত একথা মানিয়া লওয়া যায় না।

ভোরে উঠিয়া স্ত্রীলোকেরা নানা ব্রত করে, আরতি করে, তুলসী তলা প্রদক্ষিণ করে। কেন করে? মৃত্যুর পরে ভগবানের কৃপা লাভ হইবে এই আশায়। ইহা তাহাদের সরল বিশ্বাস বলিতে পারেন। কিন্তু ইহারই জন্য তাহারা ব্রত করে, উপবাস করে। এইরূপ ব্রতশীল পরিবারে মহাপুরুষের জন্ম হয়। তুলসীদাসের কুলে রামতীর্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামতীর্থ ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। কোন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "তুলসীদাসের কুলে জন্মেছ, সংস্কৃত জান না?" রামতীর্থের অন্তরে কথাটা বিঁধিল। কুলস্মৃতির এমনই সামর্থ্য যে, এই কথায় প্রেরিত হইয়া তিনি সংস্কৃতের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। স্ত্রীলোকদের এই ভক্তি-ভাবকে উপহাস করিও না। এইরূপ কণা-কণা ভক্তি যেখানে সঞ্চিত হয় সেখানে তেজস্বী সন্তানের উৎপত্তি হয়। তাই ভগবান বলিতেছেন, "আমার ভক্ত যদি সকাম হয়, তবুও তার ভক্তি আমি দৃঢ় করব। তার মনে বিভ্রম আসতে দেব না। অকপট হৃদয়ে সে যদি আমার কাছে রোগ-মুক্তির প্রার্থনা করে তবে তার আরোগ্যের ভাবনা পুষ্ট করে আমি তার রোগ দূর করে দেব। যে কারণেই সে আমার কাছে আসুক, তার পিঠে আমি হাত বুলাব, আদর করব।" ধ্রুবের কথা ধরুন। পিতার আসনে সে বসিতে পারিল না। মা তাহাকে বলিলেন, "ঈশ্বরের কাছে চাও।" সে উপাসনা করিতে লাগিল। ভগবান তাহাকে অচল স্থান দিলেন। না-ই বা হইল মন নিষ্কাম। মানুষ কাহার কাছে যায় আর কাহার কাছে চায়, গুরুত্ব সেখানে।

সংসারের কাছে হাত না পাতিয়া ঈশ্বরের কাছে মিনতি করার যে বৃত্তি তাহার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দেশ্য যাহাই হউক তুমি ভক্তিমন্দিরে যাইয়া দেখ ত। প্রথমে যদি কামনা লইয়াও যাও, পরে নিষ্কাম হইয়া যাইবে। লোকে প্রদর্শনীর আয়োজন করে। পরিচালক ডাকিয়া বলে, "মহাশয় আসুন। দেখুন খদ্দরের কেমন উন্নতি হয়েছে। নমুনা দেখুন।" লোকে যায়, প্রভাবিত হয়। ভক্তির বেলায়ও তাহাই। ভক্তিমন্দিরে একবার প্রবেশ ত কর, তখন উহার সৌন্দর্য ও সামর্থ্য আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে।

স্বর্গে যাইতে শেষ পর্যন্ত ধর্মরাজের সহিত কুকুরই ছিল। স্বর্গদ্বারে ধর্মরাজকে বলা হইল, "আপনি আসুন। কুকুরের প্রবেশ নিষেধ।" ধর্মরাজ বলিলেন, "আমার কুকুরের প্রবেশ নিষেধ হইলে আমারও প্রবেশ নিষেধ।" অনন্যসেবাকারী যদি কুকুরও হয় তবু সে 'আমার-আমার' বোধসম্পন্ন সংকীর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুকুর ভীম-অর্জুন হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ভগবানবিমুখ বড় বড় লোক অপেক্ষা ভগবানমুখী কীটও মহৎ। মন্দিরে কচ্ছপ ও নন্দীর মূর্তি থাকে। কিন্তু সকলে ঐ নন্দী-ষাঁড়কে নমস্কার করে। কারণ সে সাধারণ ষাঁড় নয়। সে ভগবানের সামনে থাকে, ষাঁড় বটে। কিন্তু সে ভগবানের—একথা বুঝিতে আমাদের ভুল হয় না। বড় বড় বুদ্ধিমান অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ। ভগবানের ভক্ত মূর্খ জীবও বিশ্বের বন্দনীয় হইয়া থাকে।

একবার আমি রেলে যাইতেছিলাম। যমুনার পুলের উপর গাড়ী আসিয়াছে। পাশের একটি লোক পুলকিত হৃদয়ে যমুনায় একটি আধলা ফেলিয়া দিল। কাছে একজন সমালোচক ছিলেন। তিনি বলিলেন, "এমনিই ত দেশ গরীব তার উপর এরা এভাবে নিরর্থক পয়সা ফেলছে।" আমি বলিলাম, "লোকটির মনোভাব আপনি বোঝেন নি। যে মনোভাব থেকে সে আধলাটি ফেলেছে তার মূল্য কি দু-চার পয়সাও হবে না? অন্য কোন সৎকাজে এ পয়সা দিলে দানটা আরও ভাল হত। সেকথার বিচার পরে হবে। এই নদী ঈশ্বরের করুণাধারা বহন করে আনছে—এই ভাবনা থেকে ভাবুক লোকটি এই ত্যাগ করেছে। আপনাদের অর্থশাস্ত্রে এই ভাবনার কোন স্থান আছে কি? দেশের একটি নদী দেখে তার

অন্তঃকরণ নরম হয়েছে। এই ভাবনার প্রতি যদি আপনার শ্রদ্ধা থাকে তবে তা দিয়ে হবে আপনার দেশপ্রেমের পরীক্ষা। দেশভক্তির মানে কি কেবল রুটি ? দেশের মহান্ নদীটি দেখে যদি সকল সম্পত্তি তাতে বিসর্জন করার, তার চরণে সমর্পণ করার বাসনা জাগে ত সে কত বড় দেশপ্রেম ! ঐ যে সব ধন-দৌলত সাদা, লাল, হলদে পাথর, ঐ যে কীটের বিষ্ঠার উৎপন্ন মোতি, মুগা—এ সকলের মূল্য কি ? জলে ফেলে দেওয়ারই মত। ঈশ্বরের চরণপ্রান্তে এ সকলের মূল্য ধুলোরই সমান। আপনি বলবেন নদী আর ঈশ্বরের চরণ এ দু'য়ের সম্বন্ধ কি ? আপনাদের সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কথা কোথাও আছে কি ? নদী মানে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন। সূর্য মানে অতি বৃহৎ একটি গ্যাসের আলো। তাকে আবার নমস্কার করা কেন ? নমস্কার কেবল আপনাদের রুটির চরণে। ভাল, ঐ রুটিতেই বা কি আছে ? ও ত আসলে এক রকমের সাদা মাটিই বটে। ওর জন্য এত লোভ কেন ? এত বড় সূর্য উঠেছে, এমন সুন্দর নদী বইছে—এতেও যদি ঈশ্বরের উপলব্ধি না হয় তবে হবে কিসে ? ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দুঃখ করে বলেছেন—আগে যখন ইন্দ্র-ধনু দেখতাম আনন্দে নেচে উঠতাম। হৃদয়ে দোলা লাগত। কিন্তু আজ কেন নাচে না ? আগেকার জীবন-মাধুরী খুইয়ে আমি কি পাথর হয়ে গেছি ?"

সারাংশ, সকাম ভক্তির কিংবা অজ্ঞানী মানুষের ভক্তি-ভাবনারও খুব মূল্য আছে। পরিণামে তাহা হইতেও মহান্ শক্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। জীব, সে যেই হউক না আর যেমনই হউক না, ঈশ্বরের দরবারে একবার প্রবেশ করিলে মান্যতা লাভ করে, আগুনে যে কোন কাঠ ফেলুন, জ্বলিয়া উঠিবে। ঈশ্বরভক্তি এক অপূর্ব সাধনা। ভগবান সকাম ভক্তিরও মূল্য দেন। পরিণামে সে ভক্তিও নিষ্কামতা ও পূর্ণতার দিকে যায়।

॥ ৩৫ ॥ নিষ্কাম ভক্তির প্রকার ও পূর্ণতা

সকাম ভক্ত আমরা দেখিলাম। এখন নিষ্কাম ভক্তের দিকে দৃষ্টি ফেরান যাক্। ইহাও দুই প্রকারের—একাঙ্গী ও পূর্ণ। একাঙ্গী আবার তিন প্রকারের। এক—আর্ত ভক্ত। আর্ত মানে সহানুভূতিপ্রার্থী।

ভগবানের জন্য সে কাঁদে ছট্‌ফট্‌ করে, যেমন নামদেব। ভগবানের প্রেম কবে লাভ করিব, কবে তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া জীবন সার্থক করিব, কবে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইব—ইহার জন্য সে উৎসুক, ব্যাকুল, অধীর, আতুর। আন্তরিকতা আছে কিনা, প্রেম আছে কিনা, এই দৃষ্টি হইতে এই ভক্ত প্রত্যেকটি কার্য নিরীক্ষণ করে।

দুই—জিজ্ঞাসু। বর্তমানে এই শ্রেণীর ভক্ত এদেশে বড় একটা নাই। এরূপ ভক্তের কেহ বার বার গৌরীশঙ্কর আরোহণ করিবে আর মরিবে। কেহ বা উত্তর মেরুর সন্ধানে বাহির হইবে আর অনুসন্ধানের ফল কাগজে লিখিয়া, বোতলে বন্ধ করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া মরিয়া যাইবে। অপর কেহ বা আগ্নেয়গিরির গহ্বরে প্রবেশ করিবে। আজকাল ভারতবাসীর নিকট মৃত্যু এক মহা ভয়ের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ছাড়া অন্য পুরুষার্থ তাহাদের নাই। জিজ্ঞাসু ভক্তের উৎসাহ অদম্য। সে বস্তুমাত্রের গুণধর্মের অনুসন্ধান করে। মানুষ যেমন নদীর গতি অনুসরণ করিতে করিতে অবশেষে সমুদ্রে পৌঁছিয়া যায়, এই জিজ্ঞাসু ভক্তও সেইরূপ পরিশেষে ভগবানের নিকট পৌঁছিয়া যায়।

তিন—অর্থার্থী। অর্থার্থী মানে প্রত্যেকটি কার্যের অর্থ যে অনুসন্ধান করে। অর্থ মানে পয়সা নহে। অর্থ মানে হিত, কল্যাণ। 'এ থেকে সমাজের কি কল্যাণ হবে'—প্রতিটি বিষয় এই কষ্টিপাথরে সে যাচাই করিয়া দেখে। আমি যাহা লিখি, যাহা বলি, যে সব কর্ম করি তাহাতে জগতের মঙ্গল হইবে কি-না ইহাই তাহার চিন্তা। নিরর্থক অহিতকর কার্য তাহার কাছে ত্যাজ্য। জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী কত বড় সে মহাত্মা! জগতের কল্যাণেই তাহার আনন্দ। প্রেমের দৃষ্টিতে সমগ্র ক্রিয়া যে দেখে সে আর্ত। জ্ঞানের দৃষ্টিতে যে দেখে সে জিজ্ঞাসু। আর সকলের কল্যাণ-দৃষ্টিতে যে দেখে সে অর্থার্থী।

এই তিন ভক্ত নিষ্কাম ত বটেই, কিন্তু একাঙ্গী। একজন কর্মের দ্বারা, আর একজন হৃদয়ের দ্বারা, আর তৃতীয় জন বুদ্ধিদ্বারা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায়। বাকি থাকিতেছে পূর্ণ ভক্তের কথা। তাহাকে জ্ঞানী ভক্তও বলা যায়। এই ভক্ত সব কিছুতেই ভগবানের রূপ দেখে। সুরূপ-কুরূপ, রাজা-ভিখারী, স্ত্রী-পুরুষ, পশু-পক্ষী সর্বত্রই সে পরমাত্মার দর্শন করে।

নর-নারী বালেঁ অবঘা নারায়ণ।
ঐসেঁ মাঝেঁ মন করীঁ দেবা॥

"নর, নারী, বালক সকলেই নারায়ণের মূর্তি—আমার মনের দৃষ্টি এমনি করে দাও প্রভু।"

এই ছিল তুকারাম মহারাজের প্রার্থনা। হিন্দু ধর্মে যেমন নাগ-পূজা, হাতীর শুঁড়ধারী দেবতার পূজা, গাছের পূজা—এরূপ পাগলপনার নমুনা আছে, জ্ঞানী ভক্তের ব্যাপারে এই পাগলামি চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে। যাহাকে সে দেখে, পিঁপড়া হইতে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত, সর্বত্রই সে একই পরমাত্মা দেখে এবং তাহাতে তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে।

মগ তয়া সুখা অন্ত নাহীঁ পার।
আনন্দেঁ সাগর হেলাবতী॥

"এরদ্বারা তার অপার আনন্দ লাভ হয়। আনন্দে তার হৃদয়-সাগর উত্তাল হয়ে ওঠে।"

এইরূপ যে দিব্য সুন্দর দর্শন তাহাকে ভ্রম বলিতে হয় বলুন। কিন্তু এই ভ্রম সুখের সাগর, আনন্দের খনি। গভীর সমুদ্রে সে দেখে প্রভুর বিলাস, গো-মাতার মধ্যে দেখে ভগবানের বাৎসল্য, পৃথিবীতে দেখে তাঁহার সামর্থ্য, মেঘশূন্য আকাশে দেখে তাঁহার নির্মলতা, রবি-চন্দ্র-তারকায় দেখে তাঁহার তেজ ও ভব্যতা, ফুলে দেখে তাঁহার কোমলতা, দুর্জনে দেখে নিজ পরীক্ষকরূপে দণ্ডায়মান পরমেশ্বর। এইভাবে সর্বত্র একই পরমাত্মার খেলা চলিতেছে এইরূপ দেখার প্রযত্ন জ্ঞানী ভক্ত করিতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে একদিন ঐ জ্ঞানী-ভক্ত-ঈশ্বরে মিলিয়া যায়।

রবিবার, ৩-৪-১৯৩২

অষ্টম অধ্যায়

প্রয়াণ-সাধনা : সাতত্য যোগ

॥ ৩৬ ॥ শুভ সংস্কার-সঞ্চয়

বন্ধুগণ,

মানুষের জীবন বহু সংস্কারে ভরা। আমাদের দ্বারা অসংখ্য ক্রিয়া হইতে থাকে। সে সকলের হিসাব করিতে গেলে অন্ত পাওয়া যাইবে না। মোটামুটি চব্বিশ ঘণ্টা ক্রিয়ার হিসাব করিতে গেলেও দেখা যাইবে যে সে সংখ্যা কত বড় হইয়া গিয়াছে। পানাহার, শোয়াবসা, চলাফেরা, কাজ কর্ম, লেখাপড়া, বলা এই সব ছাড়া নানাবিধ স্বপ্ন, রাগ-দ্বেষ, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনন্ত প্রকারের ক্রিয়া দেখা যাইবে। এই সকলের সংস্কার মনে অঙ্কিত হইতে থাকে। অতএব কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে জীবন কাহাকে বলে ত বলিব, জীবন মানে সংস্কার-সঞ্চয়।

সংস্কার দুই রকমের—ভাল ও মন্দ। উভয়েরই প্রভাব মানুষের জীবনে পড়িতে থাকে। বাল্যকালের ক্রিয়াসমূহের কথা ত মনেই থাকে না। গোটা বাল্যকালটা যেন শ্লেট্ হইতে মুছিয়া-ফেলা লেখার মত। পূর্বজন্মের সংস্কার ত একদম সাফ মুছিয়া-যাওয়ার মত ব্যাপার—এতদূর পর্যন্ত যে পূর্বজন্ম বলিয়া কিছু আছে কিনা সেই বিষয়েই সন্দেহ জন্মে। এই জন্মের ছোটবেলাকার কথাই মনে থাকে না, পূর্বজন্মের কথা ত দূরে। পূর্বজন্মের কথা থাক্। এই জন্মের কথাই ধরা যাক্। যে সব ক্রিয়ার কথা মনে থাকে কেবল তাহাই ঘটিয়াছে এমন নহে। ক্রিয়া অনেক, আর জ্ঞানও অনেক। কিন্তু এসব ক্রিয়া ও এসব জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া অবশিষ্ট থাকে কিছু সংস্কারমাত্র। রাত্রে শোয়ার সময়ে দিনের সব ক্রিয়ার কথা মনে করিতে গেলে সব কথা মনে পড়ে না। কোন্‌গুলি মনে পড়ে? যাহা অতিশয় সুস্পষ্ট তাহাই কেবল মনে পড়ে। খুব ঝগড়া করিয়া থাকি ত তাহা মনে পড়ে। কারণ তাহাই সেদিনকার মুখ্য ঘটনা। বিশেষ ঘটনার সংস্কার মনে গভীর দাগ কাটে। মুখ্য ক্রিয়া মনে থাকে, অন্য সব ম্লান হইয়া যায়। দিনলিপি লিখিতে বসি ত বিশেষ বিশেষ দুইচারটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

লিখি। প্রতিদিনের এরূপ সংস্কার লইয়া যদি এক সপ্তাহের হিসাব কষিতে যাই ত আরও কতকগুলি কথা বাদ পড়িবে এবং সপ্তাহের মুখ্য মুখ্য ঘটনামাত্র হিসাবে স্থান পাইবে; আর পুরা এক মাসের কর্মের হিসাব করিতে বসি ত সে মাসের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলিই কেবল মনে আসিবে। সেইরূপ ছয় মাসের, বছরের, পাঁচ বছরের হিসাব ধরিতে যাই ত দেখা যাইবে যে সামান্য কয়েকটি বিশেষ কথাই কেবল মনে আছে। আর তাহাই সংস্কারে পরিণত হয়। ক্রিয়া অসংখ্য ও জ্ঞান অনন্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে খুব কমই অঙ্কিত থাকে। সেই সব কর্ম, সেই সব জ্ঞান আসিল আর নিজ নিজ কর্ম করিয়া শেষ হইয়া গেল। কর্মের দুই চারটা সংস্কারই মাত্র দৃঢ় থাকিয়া যায়। সেই সংস্কারই আমাদের পুঁজি। আমরা জীবনরূপী ব্যাপার করিয়া কেবল সংস্কার-সম্পত্তি অর্জন করি। ব্যাপারী যেমন প্রতিদিনের, মাসের ও বছরের জমা-খরচ করিয়া বর্ষশেষে এত লাভ বা এত লোকসানের হিসাব বাহির করে, ঠিক সেই অবস্থা জীবনেরও। অনেক সংস্কারের জমা-খরচ টানিতে টানিতে শেষটায় অত্যন্ত সরল ও ছোট অবশিষ্ট বাকী থাকে। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত যখন ঘনাইয়া আসে তখন আত্মা অবশিষ্ট পুঁজির দিকে তাকায়। সারাজীবন কি করিয়াছি একথা যখন মনে আসে তখন সারা জীবনের উপার্জন গিয়া দাঁড়ায় দুইচারিটি কথায়। ইহার অর্থ এই নয় যে অন্য সব কর্ম ও জ্ঞান বৃথা গিয়াছে। তাহাদের কার্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নানারকমের লেনদেনের পরে শেষটায় ব্যাপারীর হাতে দাঁড়ায় পাঁচ হাজারের লোকসান নয় ত দশ হাজারের লাভ। এই মাত্র সার ব্যাপারীর হাতে আসে। লোকসান হইলে হৃদয় দমিয়া যায়, লাভ হইলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

আমাদের অবস্থাও সেইরূপ। মৃত্যুকালে যদি খাওয়ার বাসনা হয় তবে বুঝিতে হইবে সারা জীবন খাওয়ার আনন্দের অভ্যাসে কাটিয়াছে। ভোজন বা স্বাদের বাসনাই এই সারা জীবনের উপার্জন। মরণের সময়ে যদি মায়ের পুত্রের কথা মনে হয় তবে পুত্রবিষয়ক সংস্কার তাহার বলবান, ইহা মানিতে হইবে। তাহার অন্যান্য অসংখ্য কর্ম গৌণ হইয়া পড়ে। গণিতে ভগ্নাংশের উদাহরণ আছে। মস্ত বড় বড় সংখ্যা। কিন্তু সংক্ষেপ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত উত্তর হয়

এক বা শূন্য। তেমনি জীবনেও অনেক সংস্কারের আনাগোনা চলে, কিন্তু অবশিষ্ট থাকে সাররূপে কোন এক বলবান সংস্কার। জীবনরূপী প্রশ্নের উহা উত্তর। শেষ সময়ের সেই স্মরণই সারা জীবনের ফলিত সার।

জীবনের এই অন্তিম সার যাহাতে মধুময় হয়, এই অন্তিম কাল যাহাতে মধুর হয়, সেই জন্য সারাজীবন চেষ্টা করিতে হইবে। যাহার শেষ মধুর তাহার সব মধুর। ঐ অন্তিম উত্তরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সারা জীবনের প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সমগ্র জীবনের পরিকল্পনা রচনা কর। প্রশ্ন দেখিয়াই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। জীবনের ক্ষেত্রেও সেই রীতি অবলম্বনীয়। অতএব মৃত্যুকালে যে সংস্কারের প্রকাশ আমরা দেখিতে চাই, সারা জীবনের-প্রবাহ তদভিমুখী করিতে হইবে। দিনরাত সেইদিকে মনের প্রবণতা থাকা চাই।

॥ ৩৭ ॥ মরণের কথা সর্বদা মনে থাকা চাই

অষ্টম অধ্যায়ে এই তত্ত্ব উপস্থিত করা হইয়াছে যে, মৃত্যুকালে যে ভাব প্রবল থাকে পরের জন্মে তাহা বলবত্তর হয়। এই পাথেয় লইয়া জীব পরবর্তী যাত্রাপথে অগ্রসর হয়। আজিকার উপার্জনের পুঁজি লইয়া নিদ্রার পরে আমরা আগামী কালের জীবন শুরু করি। তেমনি এই জন্মের পুঁজি লইয়া মৃত্যুরূপী দীর্ঘ নিদ্রার পরে আমাদের যাত্রা পুনরায় শুরু হয়। এই জন্মের যাহা অন্ত আগামী জন্মের তাহাই আরম্ভ। অতএব সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া চল।

নির্ভয়ে যাহাতে মৃত্যু-বিভীষিকার সম্মুখীন হইতে পারা যায়। উহার সমাধান বাহির করিতে পারা যায়। তাহার জন্য ও মরণ স্মরণে রাখা দরকার। একনাথ মহারাজের একটি গল্প আছে। কোন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! আপনার জীবন কেমন সিধাসাদা, কেমন নিষ্পাপ। আমাদের তেমন নয় কেন? আপনি কখনও কারুর উপর চটেন না। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেন না, কোন ঝামেলায় যান না। আপনি কত শান্ত, পবিত্র ও প্রেমময়!" একনাথ বলিলেন, "আমার কথা এখন রাখ। তোমার সম্বন্ধে একটা কথা বলছি। আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে তোমার মৃত্যু হবে।" কে বলিবে একনাথের কথা মিথ্যা? সাত দিনে মৃত্যু! মাত্র ১৬৮ ঘণ্টা বাকী!

হায় ভগবান! কি হইল!! লোকটি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া গেল। কি করিবে ঠিক পাইতেছিল না। শেষের দিনের সকল কথা, সকল কাজ গুছাইতে লাগিল। অসুখ হইল। বিছানা লইল। ছয় দিন গেল! সাত দিনের দিন একনাথ তাহার কাছে গেলেন। লোকটি নমস্কার করিল। একনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?" সে বলিল, "আর কি? চলেছি!" নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছ'দিনে কত পাপ করলে? কত পাপ-ভাবনা মনে এসেছে?" আসন্নমৃত্যু লোকটি বলিল, "নাথ, পাপের কথা ভাবার অবসরই ছিল না। চোখের সামনে মৃত্যু দাঁড়াইয়া ছিল।" নাথ বলিলেন, "আমার জীবন এত নিষ্পাপ কেন, এ প্রশ্নের উত্তর এবার পেলে?" মৃত্যুরূপী ব্যাঘ্র সর্বদা সামনে খাড়া একথা মনে করিলে পাপ করার চিন্তা আসিতে পারে কি? পাপ করার জন্যও নিশ্চিন্ততা চাই। মরণকে সর্বদা স্মরণে রাখাই পাপ হইতে মুক্ত থাকার উপায়। মৃত্যু সামনে দেখিলে কোন্ সাহসে কেহ পাপ করিবে?

কিন্তু মানুষ মরার কথা দূরে ঠেলিয়া রাখে। পাস্কেল নামে এক ফরাসী দার্শনিক ছিলেন। 'পাঁসে' নামক তাঁহার একখানি বই আছে। 'পাঁসে'র অর্থ 'ভাবনা'। তাহাতে তিনি সংক্ষেপে বিভিন্ন চিন্তা উপস্থিত করিয়াছেন। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, "মরণ সর্বদা পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু মৃত্যুর কথা কিভাবে ভুলিয়া থাকা যায় এইটাই মানুষের সর্বদার চেষ্টা। মৃত্যু স্মরণ করিয়া কিভাবে চলিবে একথা সে সামনে রাখে না।" মরণ শব্দটাই মানুষের কাছে ভাল লাগে না। খাওয়ার সময় মৃত্যুর কথা বলিয়াছ ত সে বলিবে, "আঃ, অশুভ কথা এখন বল কেন?" তাহা হইলেও এক পা এক পা করিয়া আমরা সেই মৃত্যুর দিকেই ত চলিয়াছি। বোম্বাইর টিকেট কাটিয়া একবার গাড়ীতে বসিয়াছেন ত বসিয়া থাকিলেও গাড়ী আপনাকে বোম্বাই পৌঁছিয়া দিবে। জন্ম যখন হইয়াছে মৃত্যুর টিকেট তখনই আমাদের কাটা হইয়া গিয়াছে। আপনি বসিয়াই থাকুন বা দৌড়াইতেই থাকুন—বসিয়া থাকিলেও মৃত্যু আসিবে, দৌড়াইলেওআসিবে। মরণের কথা ভাবুন বা দূরেই ঠেলুন তার আসা বন্ধ হইবে না। মরণ নিশ্চিত। অন্য সব অনিশ্চিত। সূর্য অস্ত যায় আর সঙ্গে আমাদের আয়ুর এক এক অংশ গ্রাস করিয়া লইয়া যায়। জীবনের অংশ এইভাবে রোজ

কাটা যাইতেছে। প্রতিদিন পলে পলে ক্ষয় হইতেছে। তবু মানুষের সে খেয়াল নাই। জ্ঞানদেব বলেন, "তাজ্জব বটে!" তাঁহার আশ্চর্য বোধ হয়—এইরূপ নিশ্চিন্তে মানুষ যে কী করিয়া থাকে! মরণের ভয় এত বেশী যে মরণের চিন্তাও মানুষের কাছে অসহ্য। সে চিন্তা সে দূরে রাখিতে চায়। চোখে পরদা লাগাইয়া বসিয়া থাকে। যুদ্ধযাত্রী সৈনিক খেলে, নাচে, গায়, সিগারেট ফোঁকে। পাস্কেল লিখিয়াছেন, "সাক্ষাৎ মরণ সর্বত্র দেখলেও ঐ টমি, ঐ সিপাই তা ভুলে যাওয়ার জন্য পানাহারে, গানে-তানে মত্ত হয়ে থাকে।"

আমরা সকলে এই টমিরই মত। মুখ যাহাতে গোলগাল দেখায়, হাসি-হাসি দেখায় সর্বদা সেই চেষ্টা। রুক্ষ দেখাইলে তেল মাখা, পাউডার মাখা, চুল পাকিলে কলপ লাগানো ইত্যাদি কত চেষ্টাই না মানুষ করে। বুকের উপর মৃত্যু নাচিতেছে তবু তাহা ভুলিয়া যাওয়ার জন্য ঐ টমিরই মত অনন্ত চেষ্টা। লোকে বলিবে, "আর যা বলতে হয় বল, মরণের কথা মুখে এনো না।" ম্যাট্রিক পাস ছেলেকে জিজ্ঞাসা করুন "এখন কি করবে?" ত বলিবে, "এখনই কি! সবে ত ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি।" পরের বছর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ত বলিবে, "ইণ্টারমিডিয়েটটা পাস করি, তারপর দেখা যাবে।" এই ভাবেই চলিতে থাকে। পরের কথা আগেই চিন্তা করা হইবে না কেন? পরবর্তী পদক্ষেপের কথা আগেই ভাবিয়া দেখা দরকার, নইলে গর্তে পড়ার ভয় আছে। কিন্তু ছাত্ররা তাহা দূরে ঠেলিয়া রাখে। বেচারাদের শিক্ষা এমনই অন্ধকারময় যে তাহা হইতে ও-পারের ভবিষ্যৎ দেখাই যায় না। অতএব পরে কি করা হইবে এই প্রশ্নের সে সম্মুখীন হইতে চায় না। তার কারণ সে চারিদিকে কেবল অন্ধকারই দেখে। কিন্তু ভবিষ্যৎ এড়ানো যায় না। একদিন তাহা ঘাড়ে আসিয়া পড়েই।

তর্কশাস্ত্র পড়াইবার সময় কলেজের অধ্যাপক বলেন, "মানুষ মরণশীল। সক্রেটিস মানুষ, অতএব সক্রেটিস মরবে।" প্রোফেসর এই ন্যায় শিক্ষা দেন। তিনি সক্রেটিসের উদাহরণ দেন। নিজের উদাহরণ দেন না কেন? প্রোফেসর মরণশীল। সকল মানুষই মরিবে, তাই আমি প্রোফেসরও মরিব। আর ছাত্র তোমরাও মরিবে। এরূপ শিক্ষা প্রোফেসর দেন না। মৃত্যু তিনি সক্রেটিসের উপর চাপাইয়া দেন। কারণ

সক্রেটিস কবেই মরিয়া গিয়াছেন, আপত্তি করিতে তিনি আসিবেন না। শিষ্য-গুরু উভয়েই সক্রেটিসের উপর মরণ সঁপিয়া নিজেদের বেলায় "তোমরাও মৌন, আমরাও মৌন" এই ভাব অবলম্বন করে। তাহারা যেন ধরিয়া লইয়াছে, তাহারা অমর।

এইভাবে জানিয়া-বুঝিয়া মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকার চেষ্টা সর্বত্র চলিতেছে, কিন্তু মৃত্যুকে কি এড়ানো যায়? কাল যদি না মরিয়া যান ত মরণ সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে। নির্ভীকভাবে মৃত্যুর চিন্তা করিয়া তাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার পথ লোকে সাহসভরে খোঁজে না। হরিণের পিছনে বাঘ ছুটিতেছে। গতিদ্রুত বলিয়া লম্বা-লম্বা লাফ মারিয়া হরিণ দৌড়াইতে থাকে। কিন্তু ক্রমে তাহার শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। অবশেষে সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পিছনে বাঘ, যমের দূত, ধাওয়া করিতেছে। তখন ঐ হরিণের কি অবস্থা হয়? বাঘের দিকে সে চাহিতে পর্যন্ত পারে না। চোখ বুজিয়া মাটিতে মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া যায়। অসহায়ভাবে যেন বলে: নে আয়, এখন আমাকে খা। মৃত্যু আমরা সামনা সামনি দেখিতে চাই না। বাঁচার যত চেষ্টাই করি না কেন, মৃত্যু এত প্রবল যে শেষটায় আমাদের ঘাড় না মটকাইয়া ছাড়ে না।

মৃত্যু যখন আসে মানুষ তখন জীবনের স্থিতিপত্রের দিকে তাকায়। অলস বোকা ছাত্র পরীক্ষা দিতে বসিয়া দোয়াতে কলম ডুবায় আর উঠায় কিন্তু সাদা কাগজের উপর কালির আঁচড় কাটে না। ভাই, কিছু লিখিবে না বসিয়াই থাকিবে? মা সরস্বতী আসিয়া উত্তর লিখিতে বসিবেন কি? তিন ঘণ্টা সমাপ্ত। সাদা কাগজ জমা দেয় অথবা শেষ মুহূর্তে খস খস করিয়া যা মনে আসে কিছু লিখিয়া দেয়। প্রশ্নের সমাধান করার, উত্তর দেওয়ার দিকে দৃষ্টি নাই। এদিকে চায়, ওদিকে দেখে। আমাদের অবস্থাও তেমনি। জীবনের গতি মৃত্যুর দিকে, একথা স্মরণ রাখিয়া অন্তিম মুহূর্তকে পুণ্যময়, অতীব পবিত্র ও মাধুর্যময় করার চেষ্টা জীবনভর আমাদের করা কর্তব্য। কি করিলে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর সংস্কার জন্মে সেদিকে আজ হইতেই দৃষ্টি রাখা চাই। কিন্তু উত্তম সংস্কারের অভ্যাস কে করে? প্রতি পদক্ষেপে মন্দের অভ্যাস চলিতেছে। জিভ, চোখ, কান ইহাদিগকে লোলু-

পতা শিখাইতেছি। অন্য অভ্যাসে চিত্তকে অভ্যস্ত করিতে হইবে। ভালর দিকে চিত্তকে লইয়া যাইতে হইবে। সেই রঙে রাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। নিজের দোষ দেখামাত্র তাহা সংশোধন করার জন্য ব্যস্ত হওয়া চাই। দোষ জানার পরেও কি তাহা তেমনই করিতে থাকিবে? যখনই নিজেদের ভুল আমাদের কাছে ধরা পড়ে তখনই আমাদের পুনর্জন্ম হয়। তাহা আমাদের নূতন বাল্যাবস্থা। মনে করিতে হইবে তাহা আমাদের জীবনের নবীন প্রভাত। সত্যসত্যই এখন তুমি জাগ্রত হইয়াছ। এখন দিনরাত জীবন পরীক্ষা কর, সাবধানে চল। নতুবা আবার পা ফসকাইবে, মন্দ অভ্যাস আবার ফিরিয়া আসিবে।

অনেক বছর আগে ঠাকুরমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। খুবই বার্দ্ধক্যের অবস্থা তখন। বলিলেন, "বিন্যা, কিছুই এখন মনে থাকে না। ঘির পাত্র আনতে যাই ত খালি হাতে ফিরে আসি।" কিন্তু পঞ্চাশ বছর পূর্বের একখানি গহনার কথা তিনি আমাকে বলিলেন। পাঁচ মিনিট পূর্বের কথা ভুল হইয়া যায়, কিন্তু পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার বলবান সংস্কার তখনও পর্যন্ত সতেজ ছিল। ইহার কারণ কী? কারণ এই যে ঐ গহনার কথা তিনি অন্যকে বারবার বলিতেন। সতত ঐ কথা ভাবিতেন। উহা তাহার জীবনের অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল—একরূপ হইয়া গিয়াছিল। মনে মনে আমি বলিয়াছিলাম, "ভগবান, তোমার কাছে মিনতি, মরণের সময় গহনার কথা যেন ঠাকুরমার মনে না থাকে।"

॥ ৩৮ ॥ অনুক্ষণের ধ্যান ধারণা হোক

রাতদিন যেকথা ভাবি তাহা আমাদের পাইয়া বসিবে না ত কি? অজামিলের কথা পড়িয়া আমরা যেন ভুল না করি। সে বাহিরে পাপী ছিল, কিন্তু অন্তরে তাহার পূণ্যের ধারা বহিত। অন্তিম মুহূর্তে সেই পুণ্য জাগ্রত হইয়াছিল। অনুক্ষণ পাপ করিলেও অন্তিম সময়ে রামনাম নিশ্চয় মুখে আসিবে এরূপ আত্মপ্রতারণা যেন না করি। ছেলেবেলা হইতেই যত্ন-পূর্বক অভ্যাস করা চাই। সর্বদা সতর্ক থাকিবে যেন সদা উত্তম সংস্কারেরই অভ্যাস হয়। ইহাতে কি হইবে, উহাতে কি হইবে—এরূপ বলিও না।

ভোর চারটার সময়ে কেন উঠিব? সাতটায় উঠিলে ক্ষতি কি? এরূপ বলিলে চলিবে না। মনকে যদি বরাবর এরূপ স্বেচ্ছাধীনে চলিতে দিতে থাক তবে শেষটায় বিপদে পড়িবে। পরে উত্তম সংস্কারের ছাপ আর পড়িবে না। কণা কণা সঞ্চয় করিয়া ধন সংগ্রহ করিতে হয়। একটি মুহূর্তও ব্যর্থ যাইতে না দিয়া বিত্তার্জনে লাগাইতে হয়। প্রতি মুহূর্তে উত্তম সংস্কার জন্মিতেছে কি-না সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে। মন্দ কথা বলিলাম ত সঙ্গে সঙ্গে মন্দ সংস্কার জন্মিল। আমাদের প্রতিটি কর্ম ছেনি হইয়া জীবন-পাথরকে রূপ দেয়। দিন ভাল ভাবে কাটিলেও মন্দ চিন্তা রাতে স্বপ্নে আসে। দুই চার দিনের চিন্তা স্বপ্নে দেখা দেয় তাহা নয়। অনবধানতার কারণে কত মন্দ সংস্কারই না মনের মধ্যে পড়িয়া থাকে। কখন তাহা জাগ্রত হইবে তাহা বলা যায় না। তাই ছোটখাটো ব্যাপারেও সজাগ থাকা চাই। জলে যে ডুবিতেছে তৃণও তাহার অবলম্বন। সংসারসাগরে আমরা ডুবিতেছি। একটু ভাল কথা বলিলে তাহা আমাদের অবলম্বন হয়। ভাল কাজ কখনও ব্যর্থ যায় না। তাহা তোমার তারক হইবে। লেশমাত্রও মন্দ সংস্কার পড়িতে দিবে না। চোখ পবিত্র বস্তু দেখিবে, কান নিন্দা শুনিবে না, মুখ ভাল কথা বলিবে, সর্বদা যত্নশীল থাকিবে। এইরূপ সাবধানে চলিলে অন্তিম মুহূর্তে পাশার যে দান ডাকিবে তাহাই পড়িবে। এইভাবে আমরাই আমাদের জীবন-মরণের স্বামী হইয়া উঠিব।

পবিত্র সংস্কার অঙ্কিত করার জন্য মনে উদাত্ত ভাবের প্রবাহ বহানো চাই। হাত পবিত্র কর্মে রত থাকিবে। অন্তরে ঈশ্বরের স্মরণ—বাহিরে স্বধর্মের আচরণ চলিতে থাকিবে। হাতে সেবা-রূপী কর্ম, মনে বিকর্ম—এইরূপই হওয়া চাই প্রতিদিনের আচরণ। গান্ধীজীর দিকে তাকাও। রোজ সুতা কাটেন। দৈনিক সুতা-কাটার উপর তিনি জোর দেন। প্রতিদিন কেন কাটিব? কাপড়ের জন্য প্রয়োজনমত কাটিলে কি চলে না? ইহা ত হইল ব্যবহারিক কথা। কিন্তু নিত্য কাটাতে আছে আধ্যাত্মিকতা। দেশের জন্য আমার কিছু করিতে হইবে এই ভাবনা ইহাতে রহিয়াছে। ঐ সুতা প্রতিদিন আমাদিগকে দরিদ্রনারায়ণের সহিত যুক্ত করে—এইরূপ সংস্কার দৃঢ় হয়।

ডাক্তার রোজ ঔষধ খাইতে বলিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি সমস্ত ঔষধ একদিনে খাইয়া ফেলি ত তাহা হইবে মুর্খতা। ঔষধের উদ্দেশ্য তাহাতে সফল

হইবে না। ঔষধের দৈনিক ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির বিকৃতি দূর করিতে হইবে। জীবন সম্বন্ধেও এই কথাই ঠিক। শঙ্করের অভিষেক ধীরে ধীরেই করিতে হয়। ইহা আমার প্রিয় দৃষ্টান্ত। ছেলেবেলায় এই ক্রিয়া আমি রোজ দেখিতাম। চব্বিশ ঘণ্টায় বড় জোর দুই কলসী জল হইত। ঝপ্ করিয়া দুই কলসী জল শিবের মাথায় ঢালিয়া দিলেই ত হয়? একথার উত্তর ছেলেবেলাতেই আমি পাইয়াছিলাম। একবারে ঢালিলে কর্ম সফল হইবার নয়। সতত বিন্দু বিন্দু পড়িতে থাকার নাম উপাসনা। সংস্কারের ধারা সতত সমান বওয়া চাই। যে সংস্কার সকালে তাহাই দুপুরে, তাহাই সন্ধ্যায়। যাহা দিবসে তাহাই রাত্রে। যাহা কাল তাহাই আজ আর যাহা আজ তাহাই আগামী কাল। যাহা এ বছর তাহাই পরের বছর। যাহা এ জন্মে, তাহাই পরজন্মে। যাহা জীবনে তাহাই মরণে। এরূপ এক এক সংস্কারের দিব্য ধারা সারা জীবনব্যাপী সতত বহিতে থাকা চাই। এইরূপ প্রবাহ অখণ্ড বহিতে থাকিলে অন্তে আমরা জয়ী হইব। কেবল তখনই আমরা গন্তব্যে যাইয়া পতাকা উত্তোলন করিতে পারিব। সংস্কার-সমূহ একই দিকে প্রবাহিত হওয়া চাই। পাহাড়ের উপর পড়া জল যদি চারিদিকে বহিয়া যায় তবে তাহা হইতে নদীর সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু জল যদি একদিকে প্রবাহিত হয় তবে সেই ধারা হইতে নালা, নালা হইতে প্রবাহ, প্রবাহ হইতে নদী, নদী হইতে গঙ্গার সৃষ্টি হইয়া সমুদ্রে গিয়া মিলিবে। একদিকে প্রবাহিত জল সমুদ্রে গিয়া মেশে। কিন্তু যাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহা পথে শুকাইয়া যায়। এই কথা সংস্কার সম্বন্ধেও জানিও। শুভ সংস্কার আসিল আবার কিছু সময় পর মিলাইয়া গেল তাহাতে লাভ কি? সংস্কার সমূহের পবিত্র প্রবাহ যদি প্রতিনিয়ত বহিতে থাকে তবেই শেষটায় মরণ মহানন্দের নিধান মনে হইবে। যে যাত্রী পথে বেশী না থামিয়া, রাস্তার মোহ ও প্রলোভনে না ভুলিয়া, দৃঢ় পদক্ষেপে চড়িতে চড়িতে শিখরে গিয়া পৌঁছে এবং সকল বোঝা ও বন্ধন খুলিয়া সেখানকার মুক্ত হাওয়া অনুভব করে তাহার আনন্দের পরিমাপ অন্যের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে যাত্রী রাস্তায়ই থামিয়া যায় সে-ই পড়িয়া থাকে। সূর্যদেব তাহার জন্য বসিয়া থাকেন না।

॥ ৩৯ ॥ দিনরাত যুদ্ধের প্রসঙ্গ

তাৎপর্য, বাহিরে যেমন সতত স্বধর্মাচরণ এবং ভিতরে হরিস্মরণরূপ চিত্তশুদ্ধির ক্রিয়া, তেমনি অন্তর্বাহে যখন কর্ম-বিকর্মের প্রবাহ কাজ করিবে তখন মৃত্যু আনন্দের বস্তু মনে হইবে। তাই ভগবান বলিতেছেন :

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ।

"আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ কর এবং যুদ্ধ করিতে থাক।"

'সদা তঁ্যাত চি রংগলা'। সর্বদা তাঁহাতেই মন রাঙাইয়া রাখ। সর্বদা ঈশ্বরে লীন হইয়া থাক। ভগবৎ প্রেমে যখন অন্তর্বাহ্য রাঙিয়া যাইবে, সেই রং যখন সারা জীবনে ব্যাপ্ত হইবে তখন পবিত্র কথায় সর্বদা আনন্দ অনুভব হইবে। মন্দ বৃত্তি তখন সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই পারিবে না। মনে সুন্দর মনোরথের অঙ্কুর গজাইবে। ভাল কাজ আপনাআপনি হইতে থাকিবে।

ইহা ত ঠিকই ঈশ্বর-স্মরণ দ্বারা ভাল কর্ম সহজেই হইতে থাকিবে কিন্তু ভগবানের আজ্ঞা হইল যুদ্ধ করিতে থাক। তুকারাম মহারাজ বলেন :

"রাত্রীদিবস আম্হাঁ যুদ্ধাচা প্রসঙ্গ।
অন্তর্বাহ্য জগ আণি মন॥"

"রাতদিন আমাদের যুদ্ধ। একদিকে মন আর একদিকে অন্তর্বাহ জগৎ।"

ভিতরে ও বাহিরে অনন্ত সৃষ্টি ব্যাপ্ত। এই সৃষ্টির সহিত মনের সতত দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই ঝগড়ায় সব সময় জয়লাভ হইবে তাহা নয়। শেষে যাহার জয় হইবে সে-ই সত্যকার বিজয়ী। শেষের জয়ই জয়। কখনও অসাফল্য আসিবে—অসফলতায় নিরাশ হইবার কারণ নাই। পাথরে উনিশ ঘা মারা হইয়াছে তবু ভাঙ্গে নাই,—কুড়ি বারের বার ভাঙ্গিয়াছে। তবে কি মনে করিবে যে ঐ উনিশ ঘা বৃথা গিয়াছে? তা নয়। সেই বিশ ঘায়ের সাফল্য ঐ উনিশ ঘা-ই আনিয়া দিয়াছে।

নিরাশ হওয়া মানে নাস্তিক হওয়া। বিশ্বাস রাখ ঈশ্বর আমাদের রক্ষক। শিশুর সাহস বাড়াইবার জন্য মা তাহাকে এদিক-ওদিক যাইতে দেন।

কিন্তু তিনি তাহাকে পড়িয়া যাইতে দেন না। পড়ার উপক্রম হইলেই আস্তে আসিয়া তুলিয়া লন। ঈশ্বরও আমাদের উপর নজর রাখেন। আমাদের জীবন-ঘুড়ির সূতা তাঁহার হাতে। কখনও তাহা তিনি টানিয়া রাখেন, কখনও একটু ঢিলা ছাড়েন। কিন্তু সূতা তাঁহার হাতেই থাকে—এই বিশ্বাস রাখিবে। গঙ্গার ঘাটে সাঁতার শিখান হয়। ঘাটের গাছে শিকল বাঁধা থাকে। সেই শিকল কোমরে বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু শিখাইবার ওস্তাদ জলেই থাকেন। নতুন শিক্ষার্থী প্রথম প্রথম দুই চারবার ডোবে-ওঠে। কিন্তু শেষে সে সাঁতার কাটার কৌশল শিখিয়া লয়। এইভাবে পরমেশ্বরও আমাদের জীবন যাপনের কৌশল শিখাইয়া থাকেন।

॥ ৪০ ॥ শুক্ল-কৃষ্ণ গতি

অতএব পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখিয়া যদি কায়মনোবাক্যে দিনরাত যুঝিতে থাক তবে অন্তিম সময় খুব উত্তম হইবে। সে সময় সকল দেবতা অনুকূল হইবে। এই কথা এই অধ্যায়ের শেষে একটি রূপকের সাহায্যে বুঝানো হইয়াছে। এই রূপকটি আপনারা বুঝিয়া লউন। যাহার মৃত্যুর সময়ে আগুন জলিতে থাকে, সূর্য কিরণ দিতে থাকে, শুক্ল-পক্ষের চন্দ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে, উত্তরায়ণের মেঘমুক্ত সুন্দর আকাশ উন্মুক্ত হইয়া থাকে, সে ব্রহ্মে বিলীন হয়। আর যাহার মৃত্যুর সময়ে ধোঁয়ায় সব আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, ভিতর-বাহির অন্ধকারে ঘিরিয়া থাকে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র ক্ষীণ হইতে থাকে, দক্ষিণায়ণের মলিন ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ব্যাপ্ত হইতে থাকে, সে পুনরায় জন্মমরণের চক্রে পড়ে।

এই রূপক পড়িয়া অনেকে ধাঁধায় পড়েন। পুণ্য-মৃত্যু চাও ত অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ এই সকল দেবতার কৃপা লাভ করিতে হইবে। অগ্নি কর্মের প্রতীক, যজ্ঞের নিদর্শন। অন্তিমকালেও যজ্ঞের শিখা জলিতে থাকা চাই। ন্যায়মূর্তি রাণাডে বলিতেন, "নিরন্তর কর্তব্য করতে করতে যদি মৃত্যু আসে তবে জীবন ধন্য হয়। কিছু পড়ছি, লিখছি, কাজ করছি—এ অবস্থায় যদি মরতে পারি তবে সবই পেলাম।" একেই "যজ্ঞের শিখা

জ্বলিতে থাকা" বলে। মরণকালেও কর্ম করিতে থাকা অগ্নির কৃপার দ্যোতক। সূর্যের কৃপা বলিতে অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বুদ্ধির প্রভা উজ্জ্বল থাকা বুঝায়। চন্দ্রের কৃপা মানে মৃত্যু সময়ে পবিত্র ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে থাকা। চন্দ্র মনের, ভাবনার দেবতা। শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত মনে প্রেম, উৎসাহ, পরোপকার, দয়া ইত্যাদি শুদ্ধ ভাবনার পূর্ণ বিকাশ হওয়া চাই। আকাশের কৃপার অর্থ হৃদয়াকাশে লেশমাত্রও আসক্তির মেঘ দেখা না দেওয়া। গান্ধীজী একবার বলিয়াছিলেন, "আমি দিনরাত চরখার কথা বলি। চরখাকে পবিত্র বস্তু মনে করি। কিন্তু অন্তিম সময়ে তার বাসনাও যেন না থাকে। যিনি আমাকে চরখার প্রেরণা দিয়েছেন, চরখার কথা ভাববার শক্তি তাঁর পুরোমাত্রায়ই আছে। চরখা এখন অনেক ভাল ভাল লোকের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। চরখার ভাবনা ছেড়ে এখন পরমেশ্বরের সহিত মিলনের জন্য আমাকে প্রস্তুত হতে হবে।" তাৎপর্য, উত্তরায়ণের অর্থ হৃদয়ে আসক্তির মেঘ না থাকা।

শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেহ কোন-না-কোন সেবাকার্য করিতেছে, ভাবনার পূর্ণিমা শোভা পাইতেছে, হৃদয়াকাশে আসক্তির লেশও নাই, বুদ্ধি সতেজ—এই অবস্থায় যাহার মৃত্যু হয় সে পরমাত্মার সহিত লীন হইবে। এরূপ পরম মঙ্গলময় অন্তিম ক্ষণ লাভের জন্য সতর্কভাবে রাতদিন যুদ্ধ করিতে থাকা চাই। মুহূর্তের জন্যও মনে অশুদ্ধ সংস্কারের ছাপ পড়িতে দিতে নাই। আর এই শক্তি লাভের নিমিত্ত সতত পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা চাই। পুনঃ পুনঃ নামস্মরণ, তত্ত্বস্মরণ করিতে থাকা চাই।

রবিবার, ১০-৪-১৯৩২

নবম অধ্যায়

মানব-সেবারূপ রাজবিদ্যাঃ সমর্পণ যোগ

॥ ৪১ ॥ প্রত্যক্ষ অনুভবের বিদ্যা

বন্ধুগণ,

আজ আমার গলায় ব্যথা। আমার কথা আপনাদের কান পর্যন্ত পৌঁছিবে কিনা ঠিক বুঝিতেছি না। এই সময় সাধুচরিত্র বড় মাধবরাও পেশোয়ার অন্তিম সময়ের কথা মনে পড়িতেছে। ঐ মহাপুরুষ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কফের প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল। কফকে অতিসারে পর্যবসিত করা যায়। মাধবরাও বৈদ্যকে বলিলেন, "কফ দূর হয়ে অতিসার আসে সে ব্যবস্থা করুন। তা হলে কণ্ঠ মুক্ত হবে। হরিনাম করতে পারব।" আমিও আজ পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছিলাম। ভগবান বলিলেন— "গলায় যেমন দেয় তেমন বলবে।" আমি এখানে গীতার আলোচনা করিতেছি, কাহাকেও উপদেশ দেওয়ার জন্য নয়। লাভবান যাঁহারা হইতে চান তাঁহাদের অবশ্যই লাভ হইবে, কিন্তু আমি ত গীতাকে রামনাম মনে করিয়াই শুনাইতেছি। গীতার ব্যাখ্যা করার সময় আমার ভাবনা হরিনাম সংকীর্তনেরই থাকে।

আমি যাহা বলিতেছি আজিকার আলোচ্য নবম অধ্যায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই অধ্যায়ে হরিনামের অপূর্ব মহিমা কীর্তন কর হইয়াছে। এই অধ্যায় গীতার মধ্যস্থলে অবস্থিত। গোটা মহাভারতের মধ্যভাগে গীতা আর গীতার মধ্যভাগে নবম অধ্যায়! নানা কারণে এই অধ্যায় পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। কথিত আছে অন্তিম সমাধিকালে জ্ঞানদেব এই অধ্যায়ের জপ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই অধ্যায়ের স্মরণমাত্রে আমার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠে। হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। ব্যাসদেবের ইহা কতবড় কৃপা! কেবল ভারতবর্ষের উপর নয়, সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর তাঁহার এই কৃপা বর্ষিত হইয়াছে। যে অপূর্ব কথা ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, তাহা শব্দে ব্যক্ত করার মত নয়। কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া ব্যাসদেব তাহা সংস্কৃত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গুহ্য বস্তুকে বাণীরূপ দিয়াছেন। এই অধ্যায়ের আরম্ভে ভগবান বলিতেছেন :

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্,

এই যে রাজবিদ্যা, এই যে অপূর্ব বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। উহাকে ভগবান 'প্রত্যক্ষাবগম' বলিয়াছেন। শব্দ যাহা ধরিতে অসমর্থ অথচ প্রত্যক্ষ অনুভবের কষ্টিপাথরে যাহার যাচাই হইয়া গিয়াছে এইরূপ কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই জন্যই ইহা এমন সুমধুর হইয়াছে।

কো জানে কো জৈহৈ জমপুর, কো সুর-পুর পর-ধামকো।
তুলসিহিঁ বহুত ভলো লাগত, জগজীবন রামগুলামকো॥

"মরিলে স্বর্গলাভ হইবে সে কথায় এখানে কি লাভ হইবে? কে বলিতে পারে স্বর্গে কে যাইবে আর যমপুরে কে যাইবে? এই জগতে যে দুই চার দিন থাকিতে হইবে রামের গোলাম হইয়া থাকাতেই আমারআনন্দ"—তুলসীদাসজী একথা বলেন। রামের গোলাম হইয়া থাকার মধুর আস্বাদন এই অধ্যায়ে রহিয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে এই দেহে, এই চক্ষেই অনুভব করা যায় এমন ফল, জীবদ্দশায় উপলব্ধি করা যায় এইরূপ বিষয়ের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। গুড় খাইলে গুড়ের মিষ্টতা সঙ্গে সঙ্গে বুঝা যায়। তেমনি রামের গোলাম হইয়া থাকার মিষ্টত্ব এখানে বিদ্যমান। এই মৃত্যুলোকে জীবনের মধুরতা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় যে বিদ্যায় সেই রাজ-বিদ্যার কথা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই বিদ্যা অত্যন্ত গূঢ়। কিন্তু ভগবান তাহা সকলের পক্ষে সুলভ করিয়া সকলের জন্য খুলিয়া ধরিয়াছেন।

॥ ৪২ ॥ সহজ পথ

গীতা যে ধর্মের সার তাহাকে বৈদিক ধর্ম বলে। বৈদিক ধর্ম মানে বেদ হইতে উৎপন্ন ধর্ম। জগতে অত্যন্ত প্রাচীন যত গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে বেদই প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া মান্য করা হয়। তাই ভক্ত লোকেরা বেদকে অনাদি বলিয়া মানে। সেইজন্য বেদ চিরদিন পূজ্য হইয়া রহিয়াছে। আর ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলেও বেদ আমাদের সমাজের প্রাচীন ভাবনার

প্রাচীতম নিদর্শন। তাম্রপট্ট, শিলালেখ, মুদ্রা, পাত্র, প্রস্তরীভূত প্রাণীদেহ ইত্যাদি উপকরণ হইতে এই লিখিত প্রমাণের গুরুত্ব অনেক বেশী। জগতে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া যদি কিছু থাকে ত সে বেদ। এই বেদে যে ধর্ম বীজরূপে ছিল তাহা বাড়িতে বাড়িতে বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে আর অবশেষে তাহাতে গীতারূপ দিব্য মধুর ফল ধরিয়াছে। ফল ছাড়া গাছের আমরা কী খাইতে পারি? বৃক্ষে ফল ধরিলেই না বৃক্ষ হইতে খাওয়ার বস্তু মিলে। বেদ-ধর্মের সারের সার এই গীতা।

প্রাচীন কাল হইতে এই যে বেদ-ধর্ম চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে নানা যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, বিবিধ তপশ্চর্যা, বহুবিধ সাধনার কথা আছে। এই সব কর্মকাণ্ড যদিও নিরর্থক নয় তবুও তাহার অধিকারী হইতে হয়। ঐ সব কর্মকাণ্ড সকলের পক্ষে সুলভ ছিল না। উচ্চ নারিকেল বৃক্ষে উঠিয়া কে নারিকেল ফল পাড়ে, কে ছাড়ায়, কে ভাঙ্গে? আমার যতই ক্ষুধা লাগুক না কেন ঐ উচ্চ বৃক্ষের নারিকেল আমি পাইব কি উপায়ে? নীচ হইতে আমি নারিকেল দেখি, উপর হইতে নারিকেল আমাকে দেখে। তাহাতে কি পেটের ক্ষুধা মিটে? যতক্ষণ না ঐ নারিকেল আমার হাতে আসে, ততক্ষণ সবই বৃথা। বেদের নানা ক্রিয়াতে অতি সূক্ষ্ম বিচার সমূহ নিহিত। সাধারণ লোকে তাহা বুঝিবে কিরূপে? বেদমার্গ ছাড়া মোক্ষ নাই। কিন্তু বেদের অধিকারও ত সকলের নাই, তবে অপর সকলের কাজ চলে কিভাবে? তাই ত কৃপাসিন্ধু সন্ত পুরুষগণ অগ্রসর হইয়া বলেন, "এই নাও বেদের সার নিষ্কাশন করে দিচ্ছি। সংক্ষেপে বেদের সারসঙ্কলন করে, জগতের কাছে ধরছি।" তুকারাম মহারাজ বলিয়াছেন:

বেদ অনন্ত বোললা। অর্থ ইতুকা চি সাধলা॥

'বেদে অনন্ত জ্ঞানের কথা আছে কিন্তু তাহা হইতে সার রূপে কেবল এই অর্থ পাওয়া গিয়াছে।' সে অর্থ কি? হরিনাম। হরিনাম বেদের সার। রামনামের দ্বারা মোক্ষ নিশ্চিত লভ্য হইয়াছে। স্ত্রী, শিশু, শূদ্র, বৈশ্য, অশিক্ষিত, দুর্বল, রোগী, পঙ্গু সকলের পক্ষে মোক্ষ সুলভ হইয়া গিয়াছে। বেদরূপী আলমারিতে আবদ্ধ মোক্ষ ভগবান রাজপথে আনিয়া দিয়াছেন। মোক্ষের কেমন সহজ সরল পথ! যাহার যেরূপ সহজ জীবন,

যাহা স্বধর্মের-কর্ম, সেবা-কর্ম তাহাকেই যজ্ঞময় করিয়া দাও না কেন ? অন্ত যাগযজ্ঞের আর দরকার কি ? আপনার দৈনন্দিন সহজ সেবা-কর্মকেই যজ্ঞের রূপ দাও। ইহাই রাজমার্গ।

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।

ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

এই মার্গে চক্ষু বুজিয়া দৌড়াইয়া গেলেও পতনের ভয় নাই। দ্বিতীয় মার্গ **ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া**-র ন্যায়। তার তুলনায় তরবারির ধারও সম্ভবতঃ ভোঁতা। বৈদিক মার্গ এমনি দুরূহ মার্গ। তার তুলনায় রামের গোলাম হইয়া থাকার পথ সহজ ! ইঞ্জিনীয়ার ক্রমশঃ উঁচু করিতে করিতে রাস্তা উচ্চে লইয়া যায় এবং আমাদের উচ্চ শিখরে পৌঁছাইয়া দেয়। এত উপরে যে উঠিতেছি তাহা টেরও পাওয়া যায় না। ইঞ্জিনীয়ারের এই বিশেষত্বের মতই রাজমার্গের বিশেষত্ব। মানুষ যেখানে বসিয়া যে কর্ম করিতেছে সেখানে থাকিয়াই সেই কর্ম করিতে করিতে সে ভগবানকে পাইতে পারে। এইরূপ এই মার্গ।

পরমেশ্বর কি কোথাও লুকাইয়া আছেন ? কোন গুহায়, কোন গলিতে, কোন নদীতে কিম্বা কোন স্বর্গে কি তিনি আত্মগোপন করিয়া বসিয়া আছেন ? হীরা-মাণিক্য, সোনারূপা পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকে। মোতি-প্রবাল রত্নাকর সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকে। তেমনই কি পরমেশ্বররূপ 'লালরতন' কোথাও লুকাইয়া আছেন ? ভগবানকে কোথাও হইতে কি খুঁড়িয়া বাহির করিতে হইবে ? তিনি ত সব সময়ে আমাদের সকলের সামনে সর্বত্র বিরাজমান। এই যে সব লোক সকলেই ত ভগবানের মূর্তি। ভগবান বলেন, "এই যে মানবরূপে প্রকটিত হরিমূর্তি ইহার অবমাননা করো না ভাই। ঈশ্বরই চরাচর রূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে খোঁজার জন্য কৃত্রিম উপায়ের কি প্রয়োজন ? উপায় সহজ সরল। তুমি যেসব সেবা-কার্য কর সে সবের সম্বন্ধ ভগবানের সহিত জুড়িয়া দাও। উহাই যথেষ্ট। তুমি রামের গোলাম হইয়া যাও। ঐ কঠিন বেদমার্গ, ঐ যজ্ঞ, স্বাহা, স্বধা, ঐ শ্রাদ্ধ; ঐ তর্পণ—সবই মোক্ষের দিকে লইয়া যাইবে। কিন্তু অধিকারী-অনধিকারীর সমস্যা সেখানে উপস্থিত

হয়। ও সবে আমাদের দরকার নাই। যাহা কিছু কর সব ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া দাও। এইটুকু মাত্র কর। তোমার প্রতিটি কর্মের সম্বন্ধ ঈশ্বরের সহিত জুড়িয়া দাও। ইহাই নবম অধ্যায়ের শিক্ষা। সেই জন্য ভক্তের নিকট ইহা অত্যন্ত প্রিয়।

॥ ৪৩ ॥ অধিকার-ভেদের ঝঞ্ঝাট নাই

কৃষ্ণের সারা জীবনে তাঁর বাল্যকালই সর্বাপেক্ষা মধুর। লোকে বাল-কৃষ্ণের বিশেষ উপাসনা করিয়া থাকে। গোপ-বালকদের সহিত সে গরু চরায়, তাহাদের সহিত খায়-দায়, তাহাদের সহিত হাসে-খেলে। গোপ বালকেরা যখন ইন্দ্রের পূজা করিতে যায় তখন সে তাহাদের বলিল, "ইন্দ্রকে কে দেখেছে? কী উপকার সে করে? কিন্তু এই গোবর্দ্ধন পর্বত আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখি। সেখানে গরু চরে। সেখান থেকে জলের স্রোত নেমে আসে। তারই পূজা কর।" এইরূপ শিক্ষা তিনি তাহাদের দিতেন। যে গোপ-বালকদের সহিত তিনি খেলিতেন, যে গোপীদের সহিত তিনি হাসি-ঠাট্টা করিতেন, যে গরু-বাছুরকে তিনি আদর করিতেন তাহাদের সকলের জন্য তিনি মোক্ষের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-ভগবান আপন প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা এই সহজ মার্গ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার সম্বন্ধ ছিল গরু-বাছুরের সহিত, বড় হওয়ার পর ঘোড়ার সহিত। মুরলীর ধ্বনি কানে আসিতেই গাভীরা আহ্লাদে গদ গদ হইয়া যাইত, আর কৃষ্ণ হাত বুলাইতেই ঘোড়া পুলকিত হইয়া উঠিত। সেই গরু-বাছুর, সেই রথের ঘোড়া, একেবারে কৃষ্ণময় হইয়া যাইত। 'পাপযোনি' বলিয়া বিবেচিত ঐ পশুদেরও যেন মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিত। মোক্ষে কেবল মানুষেরই অধিকার নহে, পশুপক্ষীরও আছে—একথা শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। নিজের জীবনে তিনি একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

যে অনুভূতি ভগবানের সেই অনুভূতি ব্যাসদেবেরও হইয়াছিল। কৃষ্ণ ও ব্যাস দুইই একরূপ। উভয়ের জীবনের সারও এক। মোক্ষ বিদ্যাবত্তার উপর নির্ভর করে না, কর্মকাণ্ডের উপরও নয়। উহার জন্য সহজ সরল ভক্তিই পর্যাপ্ত। 'আমি-আমি'-বড়াইকারী জ্ঞানী কোথায় পিছনে

পড়িয়া রহিয়াছে আর শ্রদ্ধাপরায়ণা সরলা নারী আগাইয়া গিয়াছেন। চাই পবিত্র মন আর সরল শুদ্ধ ভাব। তখন আর মোক্ষ দুর্লভ থাকে না। মহাভারতে জনক-সুলভা-সংবাদ নামে একটি প্রকরণ আছে। উহাতে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত জনক রাজা এক নারীর কাছে গিয়াছিলেন, ব্যাসদেব এইরূপ রচনা করিয়াছেন। বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার আছে কি-না আপনারা এই তর্ক জুড়িবেন। কিন্তু এখানে সুলভা জনক রাজাকে প্রত্যক্ষ-ভাবে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। সে এক সামান্যা নারী আর জনক কত বড় মহান্ রাজা! কত বিদ্যায় তিনি পারঙ্গম! কিন্তু সেই মহাজ্ঞানী জনকের মোক্ষের অধিকার ছিল না। তাই ব্যাসদেব তাঁহাকে সুলভার চরণ প্রান্তে পাঠাইলেন। তুলাধার বৈশ্যও তেমনি। জাজলি ব্রাহ্মণ তাঁহার কাছে জ্ঞানের জন্য উপস্থিত। তুলাধার বলিতেছেন, "পাল্লার দাঁড়ি সমান রাখাতেই আমার সব কিছু জ্ঞান।" ব্যাধের কথাও সেইরূপ। ব্যাধ ত কসাই। পশুহত্যা দ্বারা সমাজের সেবা করিত। কোন অহঙ্কারী ব্রাহ্মণকে তাহার গুরু ঐ ব্যাধের কাছে যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণের আশ্চর্য ঠেকিল, ভাবিলেন—কসাই আমাকে কী জ্ঞান দিবে? ব্রাহ্মণ ব্যাধের কাছে গেল। ব্যাধ কি করিতেছিল? মাংস কাটিতেছিল, ধুইতেছিল, বিক্রীর জন্য পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছিল। সে ব্রাহ্মণকে বলিল, "এ কাজকে যতটা ধর্মময় করা যায় তাহা আমি করি। এই কাজে মন-প্রাণ যতটা ঢেলে দেওয়া যায় ঢেলে দিয়ে আমি এ কাজ করি, আর বাবা-মার সেবা করি।" এই ভাবে ঐ ব্যাধের চরিত্রে ব্যাসদেব আদর্শ কর্মযোগীর মূর্তি খাড়া করিয়াছেন।

মোক্ষের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একথা প্রতিপাদনের জন্যই মহাভারতে এই সব নারী, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদির প্রসঙ্গ অবতারণা করা হইয়াছে। ঐ কাহিনীগুলির তত্ত্ব নবম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ঐ সব কাহিনীর উপরে শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রামের সেবক হইয়া থাকার মধ্যে যে মধুরতা, ব্যাধের জীবনে তাহাই প্রকট হইয়াছে। তুকারাম মহারাজ অহিংসার সাধক ছিলেন। কিন্তু সজন কসাই কসাইয়ের কাজ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়া-

ছিলেন একথা তিনি মহা আগ্রহে বর্ণনা করিয়াছেন। আর এক জায়গায় তুকারাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভগবান, পশু-হত্যাকারীর গতি কী হবে?" কিন্তু; **সজন কসায়া বিকুঁ লাগে মাংস।**

"সজন কসাইয়ের সঙ্গে মাংস বেচে।"—

এই চরণ লিখিয়া তিনি একথাই বলিয়াছেন যে ভগবান সজন কসাইয়ের সহায়তা করেন। যে ভগবান নরসী মেহতার হুণ্ডি চুকাইয়া দিয়াছিলেন, একনাথের জলভরা বাঁক বহিয়া আনিয়াছিলেন, দামাজীর জন্য 'মহার' হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ জনাবাইকে ধান-ভানায় সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই ভগবান সজন কসাইকেও তেমনই প্রেমে সহায়তা করেন, একথা তুকারাম বলিয়াছেন। সারাংশ, পরমেশ্বরের সহিত সকল কর্মের সম্বন্ধ জুড়িতে হইবে। কর্ম যদি শুদ্ধ ভাবনা হইতে নিষ্পন্ন হয়, সেবাময় হয়, তবে তাহা যজ্ঞ।

॥ ৪৪ ॥ ভগবানকে কর্মফল অর্পণ

এই বিশেষ কথা নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই দুইয়ের মধুর মিলন ঘটিয়াছে। কর্মযোগের মানে কর্ম করিবে কিন্তু তার ফল ত্যাগ করিবে। ফলের বাসনা চিত্ত স্পর্শ না করে এভাবে কাজ করিবে। তাহা যেন আখরোটের গাছ বসানো। আখরোট গাছে পঁচিশ বৎসরে ফল ধরে। যে লাগায় তার ভাগ্যে ফল খাওয়া ঘটে না। তবু লোকে তাহা লাগায় ও যত্নের সঙ্গে গোড়ায় জল দেয়। কর্মযোগ মানে গাছ লাগানো আর ফলের প্রত্যাশা না রাখা। ভক্তিযোগ মানে কি? ভাবপূর্বক ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাওয়া ভক্তিযোগ। রাজযোগে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ একত্র মিশিয়া গিয়াছে। নানা লোকে রাজযোগের নানা ব্যাখ্যা করিয়াছে। কিন্তু সংক্ষেপে রাজযোগ মানে কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের মধুর-মিলন, ইহাই আমার ব্যাখ্যা।

কর্ম ত করিতে হইবেই। কিন্তু ফল ত্যাগ করা নয়। তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। ফল ত্যাগ কর বলিলে ফল নিষিদ্ধ হইয়া যায়। অর্পণে তাহা নাই। তাহা এক অতি উত্তম ব্যবস্থা। তাহাতে অপূর্ব মাধুর্য বিদ্যমান! ফলত্যাগের অর্থ এই নয় যে ফল কেহই লইবে না।

কেহ না কেহ তাহা নিশ্চয়ই পাইবে। এখানে তর্ক উঠিতে পারে, যে পাইবে সে পাওয়ার উপযুক্ত কি-না। দ্বারে ভিখারী আসিলে আমরা চট্ করিয়া বলিয়া বসি, "বেশ মোটাসোটা চেহারা, ভিক্ষে করা শোভা পায় না। পথ দেখ।" তার ভিক্ষা চাওয়া উচিত কি অনুচিত সে বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হই। বেচারা ভিখারী লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যায়। তার প্রতি আমাদের অন্তরে সহানুভূতি আদৌ নাই। তবে আর ভিখারীর পাত্রতা আমরা কিরূপে নির্ধারণ করিব? ছেলেবেলায় আমি মার কাছে এরূপ সংশয় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন আজও তাহা আমার কানে ধ্বনিত হয়। মাকে বলিয়াছিলাম, "এ-ত বেশ হৃষ্টপুষ্ট। একে ভিক্ষা দেওয়ার অর্থ ব্যসন ও আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া।" গীতা হইতে 'দেশে কালে চ পাত্রে চ' শ্লোকটির নজিরও দেখাইয়াছিলাম। মা বলিয়াছিলেন, "যে ভিখারী এসেছে সে ত পরমেশ্বরই। কর এবার পাত্রাপাত্রের বিচার। ভগবান কি অপাত্র? পাত্রাপাত্র বিচারে তোমার আমার কী অধিকার? আর অধিক বিচার করার প্রয়োজনই বা কি? আমার কাছে সে ভগবানেরই মূর্তি।" মায়ের এই কথার প্রত্যুত্তর আজও আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

অন্যকে খাওয়ানোর কথায় পাত্রাপাত্রের কথা আমরা বিচার করি। কিন্তু নিজেরা যখন খাই তখন ভুলেও কি ভাবি যে খাওয়ার অধিকার আমাদের আছে কি-না? দ্বারে উপস্থিত ভিখারীকে অন্যায়কারী মনে করি কেন? যাঁহাকে দিতেছি তিনি ভগবান্ একথা মনে করি না কেন? রাজযোগ বলে, "তোমার কর্মের ফল কেউ না কেউ ত লাভ করবেই, সুতরাং তা ভগবানকেই দিয়ে দাও। তাঁকে অর্পণ কর।" রাজযোগ যোগ্য স্থান দেখাইয়া দিতেছে। ফলত্যাগস্বরূপ নিষেধাত্মক কর্ম ইহাতে নাই, আর ভগবানকে যখন অর্পণ করিতে হইবে তখন পাত্রাপাত্রের প্রশ্নও নাই। ভগবানে সমর্পিত দান ত সর্বদা শুদ্ধ হইবেই। তোমার কর্মে যদি দোষও থাকে ত তাঁহার হাতে পড়িবামাত্র তাহা পবিত্র হইয়া যাইবে। দোষ দূর করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন তবুও দোষ কিছু থাকিয়া যায়ই। তাহা হইলেও যতটা শুদ্ধভাবে কর্ম করা যায়

ততটা শুদ্ধ ভাবে উহা করা আমাদের কর্তব্য। বুদ্ধি ঈশ্বরের দান। উহাকে অত্যন্ত শুদ্ধভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। উহা না করিলে অপরাধ হইবে। অতএব পাত্রাপাত্র বিচারও করা চাই। কিন্তু ভগবদ্‌ভাবনা থাকিলে কাজ সোজা হইয়া যায়।

ফলের বিনিয়োগ চিত্তশুদ্ধির জন্য করা চাই। যে কর্ম যেমনটি হইবে তেমনটি ভগবানকে অর্পণ করিবে। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া যেই ঘটিবে অমনি উহা ভগবানে অর্পণ করিয়া মনস্তুষ্টি লাভ করিবে। ফল ত্যাগ করা নয়, ভগবানকে উহা অর্পণ করিতে হইবে। কেবল তাহাই নয়, মনে যে সব বাসনা জন্মে সে সব ত বটেই, এমন কি কামক্রোধাদির বিকার পর্যন্ত ভগবানকে সমর্পণ করিয়া মুক্তি পাওয়া চাই।

কাম-ক্রোধ আম্হীঁ বাহিলে বিঠ্‌ঠলীঁ

"কাম-ক্রোধ আমি প্রভুর চরণে অর্পণ করে দিয়েছি"। এখানে না আছে সংযমাগ্নিতে জ্বলিতে থাকা না আছে আগুনে ঝলসানো। যেমনি অর্পণ তেমনি ছুটি। নাই কাউকে দমন করা, নাই কাউকে মারা।

রোগ জায় দুধেঁ সাখরেঁ। তরী নিঁব কাঁ পিয়াবা॥

"রোগ মরে দুধে চিনিতে। কি কাজ তবে তেতো নিমে॥"

ইন্দ্রিয়সমূহও সাধন। তাহাদিগকে ঈশ্বরার্পণ কর। বলা হয়—কান বশ মানে না। তাই বলিয়া কি শোনা-ই বন্ধ করিয়া দিবে? না, শুনিবে। কিন্তু কেবল হরিকথা শুনিবে। না-শোনা বড় কঠিন। কিন্তু কানে হরিকথা-রূপ শ্রবণের বিষয় দেওয়া কানের অনেক বেশী সহজ, রুচিকর ও হিতকর ব্যবহার। তোমার কান তুমি রামকে দিয়া দাও। মুখে রামনাম কর। ইন্দ্রিয়গুলি শত্রু নয়, উহারা সহায়ক। উহাদের অনেক সামর্থ্য। ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে কাজ আদায় করাই রাজমার্গ। ইহাকেই 'রাজযোগ' বলে।

॥ ৪৫ ॥ বিশিষ্ট ক্রিয়ার আগ্রহ নয়

এইরূপ নয় যে কোন বিশেষ ক্রিয়া ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে। কর্মমাত্রই তাঁহাকে সমর্পণ কর। শবরীর ঐ কুল! রাম কত প্রেমের সঙ্গে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের আরাধনা করার জন্য গুহায় যাওয়ার দরকার নাই। তুমি যেখানে যে কর্মই করনা কেন, উহা ভগবানকে অর্পণ করিয়া দাও। মা সন্তানের সেবা করেন, তাহা

ভগবানেরই সেবা করেন। সন্তানকে স্নান করান তা যেন মহেশ্বরের রুদ্রাভিষেক। সন্তান ভগবানের দয়ার দান এই ভাব হইতে ভগবান জ্ঞানে শিশুর লালন-পালন করা মায়ের কাজ। কি প্রেমভরেই না কৌশল্যা রামচন্দ্রের ও যশোদা কৃষ্ণের কথা ভাবিতেন! উহার বর্ণনা করিতে গিয়া শুক, বাল্মীকি, তুলসীদাস নিজেদের কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। এই কর্মে তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। মাতার ঐ সেবারূপ ক্রিয়া অতি মহান। ঐ যে শিশু সে ত পরমেশ্বরেরই মূর্তি। ঐ মূর্তির সেবা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের আর কি থাকিতে পারে? এই ভাবনা হইতে যদি আমরা একে অন্যের সেবা করি তবে আমাদের কর্মে কি পরিবর্তনই না দেখা দিবে! যাহার কাছে যে সেবা কর্ম উপস্থিত তাহাই ঈশ্বরের সেবা একথা আমাদের অনুক্ষণ মনে রাখিতে হইবে।

কৃষক বলদের সেবা করে। এই বলীবর্দ কি তুচ্ছ? না। বেদে বামদেব সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত শক্তিরূপী যে বৃষের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ঐ কৃষকের বলদের মধ্যেও ব্যাপ্ত।

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্যাং আবিবেশ॥

যার চারিটি শিং, তিনখানি পা, দুইটি মাথা, সাতখানি হাত, তিন স্থানে যে বাঁধা, মহান্ তেজস্বী হইয়া যে সকল জাগতিক বস্তুতে ব্যাপ্ত, বিশ্বব্যাপী এইরূপ গর্জনকারী যে বলীবর্দ কৃষক তাহারই পূজা করে। টীকাকারেরা এই একটি শ্লোকের পাঁচ-সাত রকম পৃথক পৃথক অর্থ করিয়াছেন। আর এই বলদও বিচিত্র! আকাশে গর্জন করিয়া যে বলদ বৃষ্টিপাত করে, সে-ই ক্ষেতে মলমূত্র বর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনকারী বলীবর্দরূপে কৃষকের নিকট বিদ্যমান। কৃষক যদি এই উচ্চ ভাবনা হইতে বলদের সেবা করে, যত্ন করে তবে এই সাধারণ বলদের সেবাই ঈশ্বরার্পণ হইয়া যাইবে।

তেমনি যে গৃহলক্ষ্মী রান্নাঘরটি লেপিয়া-পুঁছিয়া ঝকঝকে রাখেন, উনুন ধরাইয়া সেখানে শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার্য প্রস্তুত করেন এবং আমার রান্না খাইয়া সকলে তুষ্ট হোক্, পুষ্ট হোক—এইভাব পোষণ করেন, তাঁর ঐ সব কর্ম যজ্ঞই বটে। উনুন নয়, মা যেন ক্ষুদ্রায়তন যজ্ঞাগ্নিই প্রজ্বলিত করেন। পরমেশ্বরের তৃপ্তিবিধান করার ভাবনা হইতে আহার্য যে কত শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া উঠিবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। এই গৃহলক্ষ্মীর মনে যদি এইরূপ উচ্চ ভাবনা থাকে ত তাঁহাকে ভাগবতের ঋষিপত্নীর তুল্য মর্যাদা দিতে হইবে। ঐরূপ কত মাতাই না সেবা করিতে করিতে তরিয়া গিয়া থাকিবেন। আর 'আমি-আমি'-বড়াইকারী জ্ঞানী ও পণ্ডিত কোথায় কোন্ কোনে পড়িয়া রহিয়াছে!

॥ ৪৬ ॥ সমগ্র জীবন হরিময় হইতে পারে

আমাদের দৈনন্দিন জীবন, প্রতিক্ষণের জীবন দেখিতে সাধারণ হইলেও বস্তুত সাধারণ নহে। উহাতে মহান্ অর্থ ভরা রহিয়াছে। সমস্ত জীবনটাই এক মহান্ যজ্ঞকর্ম। তোমার নিদ্রা, তাহাও এক সমাধি। সর্বপ্রকারের ভোগ যদি ঈশ্বরার্পণ করিয়া আমরা নিদ্রা যাই তবে তাহা সমাধি নয় ত কি? স্নান করার সময় পুরুষসূক্ত আবৃত্তি করার রীতি আছে। স্নান-ক্রিয়ার সহিত এই পুরুষসূক্তের সম্বন্ধ কি? খুঁজিলে সম্বন্ধ অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে। সহস্র যাহার বাহু, সহস্র যাহার চক্ষু সেই বিরাট পুরুষের সহিত স্নানের কি সম্বন্ধ? সম্বন্ধ এই—ঘটি ভরিয়া যে জল তুমি মাথায় ঢালিতেছ তাহাতে হাজার হাজার জলবিন্দুর সমষ্টি। সেই বিন্দু বিন্দু জল তোমার মাথা ধুইতেছে, তোমায় নিষ্পাপ করিতেছে। যেন তোমার মস্তকে উহা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছে। ভগবানের সহস্র হাত হইতে যেন সহস্র ধারা তোমার উপর বর্ষিত হইতেছে। বিন্দুরূপে স্বয়ং ভগবান যেন তোমার মস্তকাভ্যন্তরের ময়লা দূর করিতেছেন। এইরূপ দিব্য ভাবনা ঐ স্নানে যদি আরোপ কর তবে ঐ স্নান অন্য কিছু হইয়া যাইবে। উহাতে অনন্ত শক্তি আসিয়া যাইবে।

কর্মমাত্রই ঈশ্বরের—এই ভাবনা হইতে কাজ করিলে সাধারণ কর্মও পবিত্র হইয়া যায়। ইহা অনুভবসিদ্ধ কথা। আমাদের বাড়ীতে যিনি আসিয়াছেন তিনি ঈশ্বরেরই রূপ একথা একবার মনে করুন দেখি। সাধারণ ভাবে কোন বড় মানুষ আসিলে আমরা ঘরদুয়ার কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করি, কেমন ভাল আহার্য প্রস্তুত করি। আর যদি মনে করা হয় যে স্বয়ং ভগবান আমার ঘরে আসিয়াছেন তবে সেই কর্মে কত পার্থক্য দেখা যাইবে! কবীর কাপড় বুনিতেন আর উহাতে তন্ময় হইয়া গান করিতেন :

ঝীনী ঝীনী, বীনী চদরিয়া

এই পদ গাহিতে গাহিতে এপাশে-ওপাশে ঝুঁকিতেন। যেন ভগবানকে পরাইবেন বলিয়া চাদর বুনিতেছেন। ঋগ্‌বেদের ঋষি গাহিয়াছেন :

বস্ত্রেব ভদ্রা সুকৃতা।

সুন্দর হাতে বোনা বস্ত্রের মত আমার এই স্তোত্র আমি ঈশ্বরকে পরাইতেছি। কবি স্তোত্র রচনা করেন ঈশ্বরের জন্য, তাঁতি কাপড় বোনেন সেও ঈশ্বরেরই জন্য। কেমন হৃদয়গ্রাহী কল্পনা! কিরূপ চিত্তশুদ্ধকারী হৃদয়-উদ্বেলকারী এই ভাব! এইরূপ ভাব জীবনে যদি একবার আসে তবে জীবন কতই না নির্মল হইয়া যায়! অন্ধকারে বিদ্যুৎ খেলিলে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার আলো হইয়া যায়। ঐ অন্ধকার কি আস্তে আস্তে আলো হয়? না। এক মুহূর্তেই সমস্ত ভিতর-বাহিরের পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। তেমনি প্রত্যেক ক্রিয়া ঈশ্বরের সহিত জুড়িয়া দেওয়ামাত্র জীবনে অভূত-পূর্ব শক্তি আসে। প্রতিটি ক্রিয়া তখন বিশুদ্ধ হইতে থাকে। জীবনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। আজ আমাদের জীবনে উৎসাহ কোথায়? মরি না, তাই বাঁচিয়া আছি। সর্বত্র উৎসাহের অভাব। কলাহীন, কান্নায় ভরা জীবন। কিন্তু সকল কাজ ঈশ্বরের সহিত জুড়িব এই ভাবনা মনে আন দেখি। তখন দেখিবে তোমার জীবন কেমন রমণীয় হইয়াছে, নমনীয় হইয়াছে।

ইহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই যে, পরমেশ্বরের নাম লওয়ামাত্র হঠাৎ পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। একথা বলিও না রাম নাম করিলে

কি হয়। নাম করিয়া দেখ। মনে কর দিনের কাজ শেষ করিয়া কৃষক সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরিতেছে। পথে এক পথিকের সহিত দেখা। তাহাকে সে বলে—

চাল ঘরা উভ্যা রাহেঁ নারায়ণা।

"হে পথিক নারায়ণ! একটু থাম। রাত হয়ে এল। দেব, আমার ঘরে চল।" ঐ কৃষকের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইতে দাও আর তারপর দেখ, ঐ পথিকের রূপ বদলাইয়া যায় কিনা। ঐ পথিক যদি ডাকাত কিম্বা বাটপাড় হয় তবুও সে পবিত্র হইয়া যাইবে। ভাবনাহেতু এই পার্থক্য হয়। ভাবনাতেই সব কিছু নিহিত। জীবন ভাবনাময়। বিশ বৎসর বয়স্ক পরের ছেলে ঘরে আসে। পিতা তাহাকে কন্যা দান করেন। বরের বয়স কুড়ি আর কন্যার পিতার বয়স পঞ্চাশ। তবুও কন্যার পিতা বরের পা ছোঁন। এ কি ব্যাপার? কন্যা অর্পণ করার ঐ কার্য কত পবিত্র! কন্যা যাহাকে অর্পণ করা হয় তাহাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা হয়। জামাতার প্রতি, বরের প্রতি এই যে ভাব পোষণ করা হয় তাহা আরও উর্ধ্বে লইয়া যাও, অগ্রসর করিয়া দাও।

কেহ হয়ত বলবেন, এরূপ বাজে কল্পনা করিয়া কী লাভ? আমি বলি প্রথমেই সত্যি-মিথ্যার প্রশ্ন তুলিও না। প্রথমে অভ্যাস কর, অনুভব কর, তারপর সত্য-মিথ্যা বুঝা যাইবে। ঐ কন্যাদান-ক্রিয়াতে বর সত্যসত্যই ভগবান একথা মুখে নয় হৃদয়ে অনুভব কর, তার-পর দেখ কত ব্যবধান হইয়া গিয়াছে। এই পবিত্র ভাবনার প্রভাবে বস্তুর পূর্বরূপ ও উত্তররূপে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি হইবে। কুপাত্র সুপাত্র হইয়া যাইবে। দুষ্ট শিষ্টে পরিণত হইবে। এই ভাবেই বাল্যা ভিলের (দস্যু রত্নাকর) জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল না কি? বীণার তারে অঙ্গুলি নাচিতেছে, মুখে নারায়ণের নাম জপ চলিতেছে, আর মারিতে আসিলেও শান্তি ভঙ্গ হইতেছে না, পক্ষান্তরে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেছেন—বাল্যা এরূপ দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই। তার কুড়াল দেখিয়া হয় লোকে ভয়ে পালাইয়াছে,

নয় ত তাকে আক্রমণ করিয়াছে—এতকাল ইহাই সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ ক্ষেত্রে সে দেখিল নারদ আক্রমণও করিলেন না পালাইয়াও গেলেন না। শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাল্যার কুড়াল থামিয়া গেল। নারদের ভ্রূ কাঁপিল না। চক্ষু মুদিত হইল না। মধুর ভজন একই ভাবে চলিতে লাগিল। নারদ বাল্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুড়ুল থামালে কেন? বাল্যা বলিল, "তোমাকে শান্ত দেখে।" নারদ বাল্যাকে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। ঐ রূপান্তর সত্য ছিল কি মিথ্যা?

বাস্তবিক পক্ষে জগতে কে দুষ্ট কে দুষ্ট নয় তাহা নির্ণয় করিবে কে? সত্যসত্যই যদি কোন দুষ্ট লোক সামনে আসে তাহা হইলেও মনে কর যে সে ভগবান। তাহা হইলে দুষ্ট হইলেও সে সাধু হইয়া যাইবে। তবে মিছামিছি মন্দ ভাবিতে যাওয়া কেন? জিজ্ঞাসা করি, সে যে দুষ্ট একথা কে জানে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "সজ্জনেরা নিজেরা ভাল তাই জগতও ভাল দেখিয়া থাকেন, আসলে তা নয়।" তাহা হইলে তোমার কাছে যেরূপ দেখায় তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? সৃষ্টির সম্যকজ্ঞান আহরণের উপকরণ যেন একমাত্র দুষ্টদের হাতেই রহিয়াছে! একথাই বা কেন বলা হইবে না যে জগৎ ভাল, কিন্তু তুমি নিজে দুষ্ট, তাই তোমার কাছে জগৎ সেই রূপেই দেখা দেয়। আসলে সৃষ্টি হইল দর্পণ। তুমি যেরূপ সম্মুখের সৃষ্টিতে তোমার সেইরূপ প্রতিবিম্বই দেখা দিবে। যেমন আমাদের দৃষ্টি, তেমনই সৃষ্টির রূপ। অতএব মনে কর, এই সৃষ্টি ভাল। এই জগৎ পবিত্র। নিজেদের সাধারণ কর্মেও এই ভাবের সঞ্চার কর। তখন দেখিবে কি অঘটন ঘটে। স্বয়ং ভগবান এই কথা বুঝাইতে চান:

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

—তুমি যাহা কিছু কর তাহা ঠিক তেমন অবস্থায়ই ভগবানকে অর্পণ করিয়া দাও।

আমার মা ছোটবেলায় একটি গল্প বলিতেন। গল্পটি মজার। কিন্তু উহার তাৎপর্য অত্যন্ত মূল্যবান। এক ছিল স্ত্রীলোক। সে নিশ্চয় করিয়াছিল, যাহা কিছু করিবে তাহাই কৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া দিবে। সে করিত

কি, না, হেঁসেলের উনুন প্রভৃতি নিকানোর পরে অবশিষ্ট গোবর-মাটি গোল্লা পাকাইয়া ছুড়িয়া ফেলিত আর বলিত— 'কৃষ্ণার্পণমস্তু'। আর হইত কি—সেই গোবর-মাটি তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে গিয়া মন্দিরের মূর্তির মুখে আটকাইয়া যাইত। মূর্তি ধুইয়া ধুইয়া পূজারী আর পারে না। কি করে? অবশেষে সে বুঝিতে পারিল যে এই কাণ্ডের গুরু হইতেছে ঐ স্ত্রীলোকটি। কাজেই স্ত্রীলোকটি যতদিন জীবিত থাকিবে মূর্তিও ততদিন পরিষ্কার রাখা সম্ভব হইবে না। একদিন স্ত্রীলোকটির অসুখ হইল। অন্তিম সময় উপস্থিত। মৃত্যুকেও সে কৃষ্ণার্পণ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ের মূর্তি ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। স্ত্রীলোকটিকে লইয়া যাওয়ার জন্য আকাশ হইতে বিমান আসিল। বিমানকেও সে কৃষ্ণার্পণ করিল। বিমান মন্দিরে গিয়া ধাক্কা খাইল। বিমানও চুরমার হইয়া গেল। কৃষ্ণ ভক্তির কাছে স্বর্গও তুচ্ছ।

তাৎপর্য হইল ভালমন্দ যে কোন কার্য আমরা করি তাহা ঈশ্বরার্পণ করিয়া দিলে তাহাতে এক সামর্থ্যের সৃষ্টি হয়। জোয়ারের দানা ঈষৎ পীতাভ, রক্তাভ অবস্থায় উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভাজিলে তাহা হইতে কেমন সুন্দর ধবধবে সাদা আট-কোনা খই হয়। জোয়ারের ঐ দানার পাশে সুদৃশ্য ঐ খৈ রাখিয়া দেখ। কত ব্যবধান! কিন্তু এই দানারই যে ঐ খৈ তাহাতে সংশয় নাই। এই ব্যবধানের মূলে একমাত্র অগ্নি। আবার ঐ শক্ত দানা জাঁতায় পিষিলে, হইয়া যাইবে মসৃণ আটা। আগুনের সংস্পর্শে খৈ, জাঁতার চাপে মোলায়েম আটা। ঠিক তেমনি আমাদের ছোটখাটো প্রত্যেক ক্রিয়াতে যদি হরিস্মরণরূপ সংস্কার সংযোগ করা হয় তবে তাহা অপূর্ব হইয়া যায়। ভাবনা হেতু মূল্য বাড়িয়া যায়। সাধারণ ঐ উপেক্ষিত ঘেঁটু ফুল, ঐ বেলপাতা, ঐ তুলসী মঞ্জরী, ঐ দুর্বা—ইহাদের তুচ্ছ মনে করিও না।

তুকা ম্হণে চবী আলেঁ। জেঁ কা মিশ্রিত বিঠ্ঠলেঁ।

তুকারাম বলে রামের সংযোগ হইলেই সকল বস্তু স্বাদিষ্ট হয়।

প্রতিটি ব্যাপারের সহিত ভগবানকে যুক্ত কর। তারপর অনুভব কর রামরূপী এই মসলার মত আর কোন মসলা আছে কি? এই দিব্য

মসলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন্ মসলা তুমি আনিবে? প্রত্যেক কাজে ঈশ্বররূপ মসলা মিশাইয়া দাও, দেখিবে সব কিছু সুন্দর ও রুচিকর হইয়া গিয়াছে।

রাত্রি আটটায় যখন মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে, চারিদিক ধূপ-গন্ধে ভরিয়া উঠে, দীপ জ্বলে, ঠাকুরের আরতি হয় তখন সত্যসত্যই মনে হয় আমরা দেবতার দর্শন করিতেছি। ভগবান সারাদিন জাগিয়া-ছিলেন এখন তাঁর শয়নের সময় হইয়াছে। ভক্ত গাহে:

সুখ নিন্দিয়া অব সোও গোপাল

"এখন সুখে নিদ্রা যাও গোপাল।" কিন্তু সংশয়ী বলে, আরে ভগবান আবার ঘুমায় নাকি? ভগবান কী না করে? তোমার কেমন বুদ্ধি! ভগবান ঘুমায় না, জাগে না, ঘুমায় আর জাগে বুঝি ঐ পাথর? ভাই, ভগবানই ঘুমান, ভগবানই জাগেন আর ভগবানই পান-আহার করেন। তুলসীদাসজী ভোরে ভগবানকে জাগান, মিনতি করেন:

জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁবর পঞ্ছী বন বোলে

নিজের ভাই-বোনদের, নর-নারীদের রামচন্দ্রের মূর্তি মনে করিয়া তিনি বলেন, "হে মোর রামচন্দ্র, এখন ওঠ।" কেমন সুন্দর ভাবধারা। ইহার বিপরীত কোন বোর্ডিঙের কথা ধরুন। জাগানোর সময়ে সেখানে তাড়নার স্বরে বলা হয়, "উঠবে কি উঠবে না?" ভোরের মঙ্গল-বেলা; সে সময় রূঢ় কথা মানায় কি? রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আশ্রমে নিদ্রাগত। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে জাগাইতেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে এই বর্ণনা আছে:

রামেতি মধুরাং বাণীং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দুল পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে॥

"বৎস রাম, এবার ওঠ।" —এমন মধুর সম্বোধনে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে জাগাইতেছেন। কত মাধুর্যে ভরা এই কর্ম। আর বোর্ডিঙের ঐ জাগানো কত কর্কশ! বেচারা নিদ্রামগ্ন ছেলেদের মনে হয়, জন্ম-জন্মা-ন্তরের শত্রু যেন শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে কোমল কণ্ঠে ডাক, পরে আর একটু জোরে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কঠোরতা, কর্কশতা

আদৌ নয়। যদি সঙ্গে সঙ্গে না জাগে ত দশ মিনিট পর জাগাও। আজ ওঠে নাই, কাল (শীঘ্র) উঠিবে এই আশা রাখ। ঘুম ভাঙ্গানোর মধুর স্বরে প্রভাতী গাও, স্তোত্র আবৃত্তি কর। ঘুম ভাঙ্গানো সাধারণ কাজ। কিন্তু তাহা আমরা কতই না কাব্যময়, প্রেমময় ও মাধুর্য-মণ্ডিত করিতে পারি ! যেন ভগবানকেই জাগাইতে হইবে। পরমেশ্বরের মূর্তি-কেই ধীরে ধীরে জাগাইতে হইবে। নিদ্রা হইতে কিরূপে জাগাইবে তাহাও যেন এক শাস্ত্র !

সকল কর্মে, সকল আচরণে এই ভাব আন। শিক্ষা শাস্ত্রে এই ভাব ত অবশ্যই আনা চাই। বালক, সে ত প্রভুরই প্রতিমূর্তি—গুরুর মনে এই ভাবনা থাকা চাই। আমি দেবতার পূজা করিতেছি, এই মনোভাব গুরুর থাকা চাই। সে ক্ষেত্রে "যা বাড়ী যা, দাঁড়িয়ে থাক এক ঘণ্টা, হাত উঁচু কর, কাপড় কি ময়লা, নাকে কত শিকনি—এরূপ কথা শিক্ষকের মুখে আসিবে না। বরং স্নেহ-কোমল হাতে তিনি তখন শিশুর নাক পরিষ্কার করিয়া দিবেন, ময়লা কাপড় ধুইয়া দিবেন, ছেঁড়া জামা সেলাই করিয়া দিবেন। শিক্ষক যদি এরূপ করেন ত তাহার দ্বারা কত উত্তম ফল লাভ হইবে ! মারধর করিয়া কি কোন ভাল ফল পাওয়া যায় ? বালকেরও কর্তব্য অনুরূপ দিব্য ভাবনা হইতে গুরুকে দেখা। গুরু মনে করিবেন বালক হরিমূর্তি, আর বালক মনে করিবে গুরু হরিমূর্তি। এই ভাবনা হইতে যদি পরস্পরের প্রতি আচরণ করা হয় তবে বিদ্যা তেজস্বী হইবে। ছাত্রও ভগবান আর শিক্ষকও ভগবান। ছাত্র যদি মনে ভাবে গুরু নয় তিনি সাক্ষাৎ শঙ্করের মূর্তি, আমরা তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানা-মৃত পান করিতেছি, তাঁহার সেবা করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতেছি, তাহা হইলে শিক্ষকের প্রতি তাহাদের আচরণ কিরূপ হইবে ?

॥ ৪৭ ॥ পাপের ভয় নাই

হরি সর্বত্র বিরাজমান এই ভাব যদি অন্তরে জন্মে, চিত্তে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি আমাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, সেই নীতিজ্ঞান স্বতঃই আমাদের অন্তঃকরণে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। শাস্ত্র অধ্যয়নের দরকারই থাকিবে না। তখন দোষ দূর হইয়া যাইবে। পাপ

পলায়ন করিবে। পাপজনিত অজ্ঞানতা অপসৃত হইবে। তুকারাম বলেন :

চাল কেলাসী মোকলা। বোল বিঠ্ঠল বেলোবেলঁ।
তুজ পাপ চি নাঁহী ঐসেঁ। নাম ঘেতাঁ জবলী বসে॥

—"যা তোকে মুক্তি দিলাম, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে বিঠ্ঠলের নাম নে। নাম নেওয়ার পর আর কোন পাপ তোর কাছে থাকতে পারবে না।"

তুমি এখন মুক্ত। যত খুশি পাপ কর। পাপ করিতে করিতে তুমি হয়রান হও, কি পাপ মোচন করিতে করিতে হরি হয়রান হন তাহা আমি দেখিব। এমন দুরন্ত উদ্দাম পাপ কী থাকিতে পারে যাহা হরিনামের সামনে তিষ্ঠিবে?

"যত ইচ্ছে পাপ কর"—পাইলে ঢালা অনুমতি। চলুক হরিনামে আর তোমার পাপে কুস্তি! আরে, এই নামে কেবল এই জন্মেরই নয়, অনন্ত জন্মের পাপ মুহূর্তে নাশ করার শক্তি আছে। গুহায় অনন্ত যুগের অন্ধকার জমিয়া থাকে। একটি কাঠি ধরাও, অমনি অন্ধকার অদৃশ্য। ঐ অন্ধকারই আলো হইয়া যায়। পাপ যত পুরাতন তত সহজে তাহা নষ্ট হয়; কারণ মরিবার জন্যই পাপের জন্ম। পুরাতন কাঠ দেখিতে দেখিতে ছাই হইয়া যায়।

রামনামের কাছে পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। ছোটরা বলে না কি, "রামনামে ভূত পালায়।" ছোটবেলা আমরা রাত্রে শ্মশান ঘুরিয়া আসিতাম। বাজি রাখিয়া শ্মশানে খুঁটা পুঁতিতাম। চারিদিক অন্ধকার। কাঁটা ফোটার, সাপে কামড়ানোর ভয় ত ছিলই, তবুও মনে কিছু হইত না। ভূতের সাক্ষাৎ কখনও মিলে নাই। ভূত ত কল্পনার সৃষ্টি। দেখা যাইবে কোথা হইতে? একটি দশ বছরের বালকের রাত্রিকালে একাকী শ্মশানে যাইয়া ঘুরিয়া আসার সামর্থ্য কোথা হইতে আসিত? আসিত রামনাম হইতে। ঐ শক্তি ছিল সত্যস্বরূপ পরমাত্মার। হরি পাশে রহিয়াছেন এই ভাব অন্তরে থাকিলে সমস্ত জগৎ উল্টিয়া গেলেও হরির দাস ভয় পায় না। তাহাকে খাইবে এমন রাক্ষস কোথায়? রাক্ষসে তাহার দেহ খাইয়া হজম করিতে পারে, কিন্তু সত্যকে হজম করার শক্তি তাহার নাই।

সত্য পরিপাক করিতে পারে এমন শক্তি জগতে নাই। ঈশ্বরের নামের সামনে পাপ টিঁকিতে পারে না। তাই ঈশ্বরে মন বসাও। তাঁহার কৃপা লাভ কর। সকল কর্ম তাঁহাকে অর্পণ কর। তাঁহারই হইয়া যাও। সর্ব কর্মের নৈবেদ্য প্রভুকে অর্পণ করিব—এই ভাব উত্তরোত্তর তীব্র করিয়া চল ত ক্ষুদ্র জীবন দিব্য হইবে, মলিন জীবন স্বচ্ছ হইবে।

॥ ৪৮ ॥ অল্প ও মধুর

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" যাহাই হোক না, তাহার সঙ্গে ভক্তি মিলে ত যথেষ্ট। কতটা দিলে, কতটা উৎসর্গ করিলে তাহা বিচার্য নয়। বিচার্য কি ভাব হইতে দিলে। একবার কোন অধ্যাপকের সহিত আমার আলোচনা চলিতেছিল। শিক্ষা ছিল আলোচনার বিষয়। আমাদের দুই জনের দৃষ্টিভঙ্গী মিলিতেছিল না। শেষটায় অধ্যাপক বলিলেন, "ভাই, আমি আঠারো বছর ধরে এই কাজ করছি।" অধ্যাপকের কর্তব্য ছিল যুক্তিতে আমাকে খণ্ডন করা। তাহা না করিয়া তিনি বলিলেন,—আমি এত বৎসর শিক্ষকতা করিতেছি। পরিহাসচ্ছলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "কোন বলদ যদি আঠারো বছর ধরে কোন যন্ত্রের পিছনে ঘোরে তবে সে কি যন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞাতা হয়ে যাবে?" যন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ এক জিনিস আর যন্ত্রের চারিদিকে চোখ বন্ধ করে ঘোরা অন্য জিনিস। শিক্ষাশাস্ত্রী এক জিনিস, আর শিক্ষার ভার বহনকারী অন্য জিনিস। শিক্ষাশাস্ত্রী ছয় মাসে এরূপ জ্ঞান আহরণ করিয়া লইবে যাহা মোটবাহী মজুরের মগজে আঠার বৎসরেও দাগ কাটিবে না। তাৎপর্য, অধ্যাপক বড়াই করিয়া তাহার অভিজ্ঞতার বয়স দেখাইলেন—আমি এত বছর অধ্যাপনা করিয়াছি। কিন্তু বড়াইয়ে সত্য প্রমাণিত হয় না। তেমনি পরমেশ্বরের সম্মুখে কত দ্রব্য স্তূপীকৃত করা হইয়াছে গুরুত্ব তাহার নয়। ওজন বা আকারের মূল্য বিচার্য নয়—মূল্য ভাবনার। কতটা অর্পণ করিলে তাহা বিচার্য নয়, বিচার্য কি ভাব হইতে করিলে তাহা। গীতায় মাত্র সাত শত শ্লোক আছে। বস্তু বড় হইলেই যে তার কার্যকারিতা বেশী হয় তাহা নয়। বিচার্য, বস্তুতে কতটা তেজ, কতটা সামর্থ্য আছে। জীবনে কত ক্রিয়া করা হইল গুরুত্ব তাহার নয়। কিন্তু ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি হইতে যদি একটি ক্রিয়াও করা হয় তবে সেই এক

ক্রিয়া হইতেই পূর্ণ উপলব্ধি লাভ হয়। কখনও কখনও কোন এক পবিত্র মুহূর্তে এরূপ উপলব্ধি আমাদের হয় যাহা বার বৎসরেও মিলে না।

তাৎপর্য, জীবনের সাধারণ কর্ম, সাধারণ ক্রিয়া পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়া দাও। তাহা হইতে জীবনে সামর্থ্য আসিবে। মোক্ষ হাতের মুঠায় আসিয়া যাইবে। কর্ম ত করিতে হইবেই আর তাহার ফল ত্যাগ না করিয়া ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে ইহাই রাজযোগের কথা। এই রাজযোগ কর্মযোগ অপেক্ষা এক পা বেশী আগাইয়া গিয়াছে। কর্মযোগের বিষয়—"কর্ম কর ও ফল ত্যাগ কর। ফলের আশা রেখো না।" এখানেই কর্মযোগের শেষ। রাজযোগ বলে,—'কর্মের ফল ছেড়ো না। সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর। ঐ ফুলও তোমাকে এগিয়ে দেওয়ার উপকরণ। ঐ ফুল বিগ্রহের মাথায় অর্পণ কর।' একদিক হইতে কর্ম, অন্যদিক হইতে ভক্তি, এই দুইয়ের মিলন ঘটাইয়া জীবন সুন্দর করিতে থাক। ফল ত্যাগ করিও না। ফল ফেলিয়া দেওয়ার নয়, ফল ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া দাও। কর্মযোগে ফেলিয়া দেওয়া ফল রাজযোগে জুড়িয়া দেওয়া হয়। বোনা আর ছুড়িয়া ফেলা এক জিনিস নয়, অনেক পার্থক্য। যাহা বপন করা হয় তাহা তুচ্ছ হইলেও বাড়িয়া অনন্তগুণ ফল দান করে। ছুড়িয়া ফেলিলে যেখানে পড়ে সেখানেই নষ্ট হইয়া যায়। যে কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা হয় তাহা বপন করা হইয়াছে এইরূপ মনে করিও। তাহার ফলে জীবন অনন্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিবে, জীবনে অপার পবিত্রতা আসিবে।

রবিবার, ১৭-৪-১৯৩২

দশম অধ্যায়

বিভূতি-চিন্তন

॥ ৪৯ ॥ গীতার পূর্বার্ধে দৃষ্টিপাত

বন্ধুগণ,

গীতার পূর্বার্ধ শেষ হইয়াছে। এখন উত্তরার্ধে প্রবেশ করিব। তাহার পূর্বে সমাপ্ত ভাগের সার সংক্ষেপে দেখিয়া লওয়া ভাল। প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে—মোহ নাশ ও স্বধর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য গীতার অবতারণা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবনের সিদ্ধান্ত – কর্মযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞের দর্শন আমাদের হইয়াছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কর্মের অর্থ স্বধর্মের আচরণ। স্বধর্মাচরণের বাহ্য কর্ম চলিতে থাকা কালে তার সহায়তার জন্য মানসিক যে কর্ম করা হয় তাহা বিকর্ম। কর্ম ও বিকর্ম একরূপ হইয়া যখন চিত্ত পূর্ণ শুদ্ধ হয়, সকল ময়লা ধুইয়া যায়, বাসনা ক্ষীণ হয়, বিকার শান্ত হয়, ভেদ-ভাব মিটিয়া যায়, ত সে অবস্থাকে অকর্ম দশা বলে। এই অকর্ম দশার রূপ দুই—একথাও বলা হইয়াছে। দিনরাত কাজ করিয়াও যেন লেশমাত্র কর্ম করিতেছি না এরূপ মনে হওয়া অকর্মের এক রূপ। দ্বিতীয় রূপ ইহার উল্টা—কিছু না করিয়াও সর্বদা কর্ম করিয়া যাওয়া। এই ভাবে দুই প্রকারে অকর্মদশার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। এই দুই প্রকার দেখিতে পৃথক হইলেও সম্পূর্ণরূপে একই। ইহাদের কর্মযোগ ও সন্ন্যাসরূপ পৃথক নামকরণ করা হইলেও ভিতরের বস্তু দুইয়েরই এক। অকর্মদশা অন্তিম সাধ্য, শেষ লক্ষ্য। এই স্থিতিকেই 'মোক্ষ' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অতএব গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে জীবনের সমগ্র শাস্ত্রার্থ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তার পরে অকর্মরূপ লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য বিকর্মের যে নানা মার্গ, মনকে ভিতর হইতে শুদ্ধ করার যে নানা সাধন রহিয়াছে, সেই সকলের প্রধান প্রধান বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে চিত্তের

একাগ্রতার জন্য ধ্যানযোগের কথা বলিয়া উহার সহিত অভ্যাস ও বৈরাগ্য জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে বিশাল ভক্তিরূপ উচ্চ সাধনের কথা বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের কাছে প্রেমভাব হইতেই যাও, জিজ্ঞাসু বুদ্ধি হইতেই যাও, বিশ্বকল্যাণের ব্যাকুলতা হইতেই যাও অথবা ব্যক্তিগত কামনা লইয়াই যাও—যে কোন ভাবেই হোক, একবার তাঁর দরবারে যাও ত। এই অধ্যায়ের নাম আমি দিয়াছি 'প্রপত্তিযোগ' অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণ লওয়ার প্রেরণাদায়ী যোগ। সপ্তমে 'প্রপত্তিযোগের' কথা বলিয়া অষ্টমে 'সাতত্য-যোগের' কথা বলা হইয়াছে। আমি যে সব নাম দিতেছি তাহা কোন পুস্তকে আপনারা পাইবেন না। নিজের জন্য যে নাম আমার উপযোগী মনে হইয়াছে সেই নাম দিতেছি। সাতত্যযোগ মানে অন্তিম দিন পর্যন্ত নিজের সাধনা সতত চালু রাখা। যে রাস্তায় একবার বাহির হইয়াছি তাহা ধরিয়া সতত আগাইয়া যাওয়া। একদিন চলিলাম, একদিন চলিলাম না—এভাবে চলিলে গন্তব্যে পৌঁছনোর আশা আদৌ থাকে না। আর কতকাল সাধনা করিব এরূপ নিরাশ বা ক্লান্ত হইলেও কাজ হয় না। যতদিন ফল না মিলিবে ততদিন সাধনা চলিতে থাকা চাই।

এই সাতত্যযোগের কথা বলার পরে নবম-অধ্যায়ে ভগবান একটি নিতান্ত সাধারণ কথা বলিয়াছেন। কথাটি সাধারণ কিন্তু জীবনের সবটা রং তাহা বদলাইয়া দেয়। তাহা হইতেছে রাজযোগ। নবম অধ্যায় বলে, অনুক্ষণ যে সকল কর্ম হইতেছে তাহা সবই ঈশ্বরার্পণ কর। এই একটি কথায় সর্ব শাস্ত্রসাধন, সকল কর্ম-বিকর্ম ডুবিয়া গিয়াছে। সকল কর্মসাধনা এই সমর্পণযোগে বিলীন হইয়া গিয়াছে। 'সমর্পণযোগ'কেই রাজযোগ বলে। এখানে সমস্ত সাধন নিঃশেষ হইয়াছে। এই যে ব্যাপক ও সমর্থ ঈশ্বরার্পণ রূপী সাধনা উহা দেখিতে খুব সহজ ও সরল কিন্তু হইয়া গিয়াছে কঠিন। এই সাধন সহজ কারণ ইহা নিতান্ত অজ্ঞ লোক হইতে মহা বিদ্বান ব্যক্তি পর্যন্ত যে কেহ নিজের ঘরে বসিয়া বিশেষ আয়াস ছাড়াই অভ্যাস করিতে পারে। কিন্তু সহজ হইলেও এই সাধনার জন্য মহা পুণ্যের দরকার।

বহুতা সুকৃতাঁচী জোড়ী। ম্‌হণুনী বিঠ্‌ঠলীঁ আবডী॥

"অনেক সুকৃতি সঞ্চয় হইয়াছে তাই বিঠ্‌ঠলের প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে।"

অনন্ত জন্মের পুণ্য সঞ্চিত হইলেই না ঈশ্বরে রুচি জন্মে। কিছু একটু হইলে চোখ হইতে দরদর ধারা বহিতে থাকে। কিন্তু ভগবানের নাম নিতে চক্ষুর কোণে দুই ফোঁটা জল ত কখনও দেখা দেয় না। ইহার উপায় কি? সন্তদের কথানুসারে একদিক হইতে এই সাধনা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু অন্যদিক হইতে উহা কঠিন আর বর্তমানকালে ত আরও বেশী কঠিন হইয়া গিয়াছে।

আজকাল ত জড়বাদের পর্দায় আমাদের চোখ আচ্ছন্ন। ঈশ্বর কোথাও আছে কি? ইহা লইয়াই আজকাল আলোচনা আরম্ভ করা হয়। তিনি কোথাও কাহারও কাছে প্রতীতই হন না। সারা জীবন বিকারময়, বিষয়লোলুপ আর বিষমতায় ভরা। উচ্চাতিউচ্চ চিন্তাশীল তত্ত্বজ্ঞানীদেরও চিন্তা কি করিলে সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। এই একমাত্র চিন্তা। ইহার অধিক আর অগ্রসর হয় না। ইহাতে তাহাদের দোষ নাই। কারণ অনেকে খাইতেই পায় না, ইহাই বর্তমান স্থিতি। অন্ন আজিকার বড় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করিতেই সকল বুদ্ধি উজাড় হইয়া যায়। সায়ণাচার্য রুদ্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন:

বুভুক্ষমাণঃ রুদ্ররূপেণ অবতিষ্ঠতে

অন্নহীন মানুষ রুদ্রের অবতার। তাহাদের ক্ষুধাশান্তির জন্য নানা তত্ত্বজ্ঞানের, নানা বাদের, নানা রাজনীতির উদ্ভব হইয়াছে। এইসব সমস্যা হইতে মাথা উঠাইয়া দেখার অবসরই কাহারও নাই। পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদ না করিয়া শান্তিতে কিরূপে দু মুঠো অন্ন পাওয়া যায় সেই দিকেই আজ আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। এইরূপ অদ্ভুত আজিকার সমাজ-ব্যবস্থা। এমতাবস্থায় ঈশ্বরার্পণের মত সহজ সরল কথাও যদি কঠিন মনে হয় ত তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে? ঈশ্বরার্পণযোগ কিভাবে আয়ত্ত করা যায়, সরল করা যায়, সেই কথাই দশম অধ্যায়ে আজ আলোচনা করিব।

॥ ৫০ ॥ ঈশ্বরদর্শনের সহজ পদ্ধতি

ছোট শিশুদের লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য যে উপায় আমরা অবলম্বন করি, ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করার উপায়ও তাহাই। এই কথাই দশম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। শিশুদের দুই ভাবে অক্ষর শিখানো হয়। প্রথমে

অক্ষরগুলি বড় বড় করিয়া লিখিয়া দেখানো হয়। পরে ঐ বড় অক্ষরই ছোট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয়। সেই 'ক', সেই 'গ'। পূর্বে ছিল বড়, এখন হইয়াছে ছোট। এই এক পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রথমে অযুক্ত সরল অক্ষর শিখান হয় আর জটিল যুক্তাক্ষর শিখান হয় পরে। ভগবানকেও সেই ভাবেই দেখিতে শেখা চাই। প্রথমে স্থূল রূপে ভগবানকে দেখুন। সমুদ্র, পর্বত ইত্যাদি মহান্ বিভূতিতে প্রকাশমান ভগবান তাড়াতাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরূপ বৃহৎ আকার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে ত জলবিন্দুতে, মাটির কণাতেও যে তিনি আছেন তাহা পরে বুঝা যাইবে। বড় 'ক' আর ছোট 'ক' এই দুইয়ে কোন পার্থক্য নাই। যে স্থূলে, সে-ই সূক্ষ্মে। এই এক পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতি বলে, অ-জটিল সরল সহজ ভগবানকে আগে দেখিয়া লও। তার পরে দেখ তাহার অপেক্ষাকৃত জটিল রূপ। শুদ্ধ ঈশ্বরীয় আবির্ভাবের সহজ অভিব্যক্তি শীঘ্রই মন কাড়িয়া লয়, যেমন কাড়িয়া লয় রামের মধ্যে প্রতিভাত ঈশ্বরীয় আবির্ভাব। রাম সরল অক্ষর। বিনা ঝঞ্ঝাটের ভগবান। কিন্তু রাবণ? যুক্তাক্ষর। তাহাতে কিছুটা খাদ আছে। রাবণের তপস্যা মহান্, কর্মশক্তিও প্রচণ্ড। কিন্তু তাহাতে ক্রূরতা মিশ্রিত। প্রথমে রাম এই সরল অক্ষর শেখ। দয়া আছে, বাৎসল্য আছে, প্রেম আছে—এইরূপ যে রাম তিনি হইতেছেন সরল পরমেশ্বর। তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বুঝা যায়। রাবণের মধ্যে যে পরমেশ্বর বর্তমান তাঁহাকে বুঝিতে একটু সময় লাগিবে। প্রথমে সরল অক্ষর, পরে যুক্তাক্ষর। প্রথমে সজ্জনের মধ্যে ভগবানকে দেখিয়া শেষে দুর্জনের মধ্যেও তাঁহাকে দেখার অভ্যাস করিতে হইবে। সমুদ্রে বিরাজমান বিশাল পরমেশ্বরই জলের ক্ষুদ্র বিন্দুতেও বিরাজিত। রামচন্দ্রে বিদ্যমান পরমেশ্বর রাবণের মধ্যেও বিদ্যমান। বৃহতেও যিনি সূক্ষ্মেও তিনি, সহজেও যিনি কঠিনেও তিনি! এই দুইভাবে সংসাররূপী গ্রন্থ আমাদের পড়িতে হইবে।

এই অপার সৃষ্টি যেন ঈশ্বর রূপী পুস্তক। পুরু ছানিতে চক্ষু আচ্ছন্ন তাই এই পুস্তক আমাদের কাছে বন্ধ মনে হয়। এই সৃষ্টিরূপী গ্রন্থে সুন্দর অক্ষরে পরমেশ্বর সর্বত্র ব্যক্ত হইয়া আছেন। কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না। ঈশ্বরের দর্শন লাভের পক্ষে এক বড় বাধা আছে, তাহা এই: সহজ-সরল নিকটের ঈশ্বরস্বরূপ মানুষ হৃদয়ে ঠাঁই পায় না, আর দূরের

প্রখর রূপ সহ্য হয় না। যদি বলা হয় তোমার মায়ের মধ্যে ঈশ্বর দেখ, সে বলিবে ঈশ্বর কি এতই সহজ, এতই সুলভ? কিন্তু প্রখর পরমাত্মা যদি প্রকট হন ত তাঁহার তেজ কি তোমার সহ্য হইবে? কুন্তীর মনে হইয়াছিল দূরের সূর্য নিকটে আসিয়া মিলুক। কিন্তু নিকটে আসিতে থাকিলেই সে জ্বলিতে লাগিল। সহ্য হইল না। ঈশ্বর যদি সকল ঐশ্বর্য লইয়া আসিয়া দাঁড়ান ত সহ্য করা যায় না। মায়ের সৌম্যরূপে আসিলে মনে স্থান পান না। পেড়া-সন্দেশ সহ্য হয় না, সাধারণ দুধ রোচে না। ইহা দুর্ভাগ্যের কথা, মৃত্যুর লক্ষণ। এই রুগ্ন মনঃস্থিতি ঈশ্বরদর্শনের পক্ষে মহা বিঘ্ন। এই স্থিতি দূর করা চাই। প্রথমে নিকটের স্থূল ও সহজ পরমাত্মাকে অধ্যয়ন কর, পরে সূক্ষ্ম ও জটিল পরমাত্মার অধ্যয়ন করিও।

॥ ৫১ ॥ মানুষের মধ্যে ভগবান

ভগবানের সবচাইতে নিকটতম মূর্তি যাহা আমাদের কাছে আছে তাহা হইতেছে স্বয়ং আমাদের মা। বেদ বলে, **"মাতৃদেবো ভব।"** জন্মিবামাত্র মা ছাড়া শিশু আর কাহাকে দেখে? ভগবানের সেই স্নেহ-রূপিনী মাতৃ-মূর্তিই সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ মাতারই ব্যাপকরূপ আমরা বাড়াইয়া লই আর **'বন্দে মাতরম্'** বলিয়া দেশমাতার ও পরে অখিল ভূ-মাতা পৃথিবীর বন্দনা করি। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ভগবানের সর্বাপেক্ষা মধুর রূপ শিশুর সামনে আসে মায়ের রূপ ধরিয়া। মায়ের আরাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ অসম্ভব নয়। মায়ের আরাধনা মানে বাৎসল্য রূপে দণ্ডায়মান ভগবানেরই পূজা। মা ত নিমিত্ত মাত্র। ভগবান তাঁহার মধ্যে নিজ বাৎসল্য ঢালিয়া দিয়া লীলা করেন। বেচারা মা ভাবিয়াই পায় না তাহার অন্তর হইতে এত মায়া মমতা কেমন করিয়া উৎসারিত হয়! বৃদ্ধাবস্থায় কাজে আসিবে এই হিসাব করিয়া কি সে শিশুর লালন-পালন করে? না-না! ঐ সন্তান সে জন্ম দিয়াছে। প্রসব বেদনা সে ভুগি-য়াছে। সেই বেদনাই তাহাকে শিশুর জন্য পাগল করিয়া দেয়। ঐ বেদনা তাহাকে বাৎসল্যের মূর্তি করিয়া গড়িয়া তুলে। ভাল না বাসিয়া তাহার উপায় নাই। সে থাকিতেই পারে না। মা মানে অপরিসীম সেবার মূর্তি

মাতৃপূজা ভগবানের সর্বোৎকৃষ্ট পূজা। ঈশ্বরকে মা নামেই ডাক। মা অপেক্ষা অধিক মহৎ শব্দ আর কিছু আছে কি? মা-ই প্রথম স্থূল অক্ষর। তাঁহাতে ঈশ্বর দেখিতে শেখ। তারপর পিতা, গুরু এঁদের মধ্যেও দেখ। গুরু শিক্ষা দেন। তিনি আমাদের পশু হইতে মানুষ বানান। অপার তাঁহার অনুগ্রহ! প্রথমে মাতা, পরে পিতা, পরে গুরু, তার পরে দয়ালু সাধু-সন্ত। অতীব স্থূলরূপে বিদ্যমান এই ভগবানকে প্রথমে দেখ। এখানে যদি ভগবানকে দেখিতে না পাও তবে দেখিবে কোথায়?

মাতা, পিতা, গুরু ও সাধু—এঁদের মধ্যে ভগবানকে দেখ। এইভাবে ছোট বালকদের মধ্যেও যদি পরমাত্মাকে দেখিতে পাও ত কতই না মজা পাইবে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নচিকেতা, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার—সকলেই ছোট বালক ছিলেন। কিন্তু বালক হইলেও, তাহাদের যে কোথায় রাখিবেন, কি করিবেন তাহা পুরাণকারগণ ও স্বয়ং ব্যাস প্রভৃতিও ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শুকদেব ও শঙ্করাচার্য বাল্যকাল হইতেই বৈরাগ্যসম্পন্ন ছিলেন। জ্ঞানদেবও ছিলেন তাহাই। সকলেই বালক। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভগবান যতটা শুদ্ধরূপে প্রকট হইয়াছিলেন অন্য কোথাও ততটা হন নাই। যীশু বালকদের খুব ভালবাসিতেন। এক সময়ে তাঁহার শিষ্যরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি ত সর্বদাই ভগবানের রাজ্যের কথা বলেন। কিন্তু ঐ রাজ্যে যাওয়ার অধিকারী কে?" পাশেই ছিল এক শিশু। যীশু তাহাকে টেবিলের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন, "যারা এই শিশুর মত হবে তারাই সেখানে যেতে পারবে।" যীশুর কথা সম্পূর্ণ সত্য ছিল। রামদাস-স্বামী একবার বালকদের সঙ্গে খেলিতে-ছিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তদের কেহ কেহ আশ্চর্য বোধ করিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এ আপনি কী করছেন আজ?" সমর্থ বলিলেন:

বয়েঁ পোর তে থোর হোউন গেলে।
বয়েঁ থোর তে চোর হোউন ঠেলে॥

"বয়সে যারা ছোট ছিল তারা বড় হয়ে গেল, আর বয়সে যারা বড় ছিল তারা চোর প্রমাণিত হলো।"

৯

বয়স বাড়ে, শিং গজায়। তখন আর ঈশ্বরের কথা মনে ঠাঁই পায় না। শিশুদের মনে কোন ছোপ নাই। তাহাদের বুদ্ধি নির্মল। শিশুদের আমরা বলি, "মিথ্যা বলো না।" তারা জিজ্ঞাসা করে, "মিথ্যা কাকে বলে?" তখন তাহাদের সত্যের কথা বুঝানো হয়, "কথা যেমন তেমনই বলা চাই।" বালক ধাঁধায় পড়ে। যাহা যেমন তাহা তেমন বলা ছাড়া বলার অন্য রীতি আছে কি? যাহা যেমন নয় তাহা তেমন বলে কিভাবে? চৌকোণকে চৌকোণ বলিবে, গোল বলিবে না—এ যেন তাই। বালকের আশ্চর্য লাগে। শিশু, সে ত শুদ্ধ পরমাত্মার মূর্তি। বয়স্কেরা তাদের ভুল শিক্ষা দেয়। সারাংশ, মা, বাবা, গুরু, সাধু, শিশু এদের মধ্যে যদি পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাই তবে তাহাকে দেখিব কোন্ রূপে? ইহা অপেক্ষা ভগবানের উৎকৃষ্টতর রূপ আর নাই। পরমেশ্বরের এই সহজ সৌম্যরূপ প্রথমে জান। এদের মধ্যে পরমেশ্বর স্পষ্ট ও মোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছেন।

॥ ৫২ ॥ সৃষ্টিস্থিত পরমেশ্বর

প্রথমে আমরা মানুষের সৌম্য ও পবিত্র মূর্তিতে যেন ঈশ্বরকে দর্শন করিতে শিখি। ঐরূপ ভাবে সৃষ্টির মধ্যে যে সকল বিশাল ও মনোহর রূপ বিদ্যমান তাহাদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে শিখিব।

উষার কথাই ধরুন! সূর্যোদয়ের পূর্বেকার ঐ দিব্য প্রভা। ঐ উষা-দেবীর গান গাহিতে গাহিতে মত্ত হইয়া ঋষিরা নাচিতে থাকিতেন— "হে উষে, তুমি পরমেশ্বরের সন্দেশবাহী দিব্য দূতিকা, তুমি হিমকণায় স্নান করে এসেছ, তুমি অমৃতলোকের পতাকা। উষার এরূপ ভব্য ও হৃদয়-গ্রাহী বর্ণনা ঋষিরা করিয়াছেন। বৈদিক ঋষি বলেন, "তুমি পরমেশ্বরের সন্দেশবাহিকা, তোমায় দেখেও যদি ঈশ্বরের পরিচয় আমি না পাই, তাঁর স্বরূপের জ্ঞান না হয় তবে ভগবানের স্বরূপ আমায় আর কে বুঝিয়ে দেবে?" এমন দিব্য রূপে সজ্জিত হইয়া উষা আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মানা, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সেদিকে যায়, তবে না?

তেমনি ঐ সূর্যকে দেখ। তার দর্শন নয় ত পরমাত্মার দর্শন। সে আকাশে নানা রঙ বেরঙ-এর চিত্র আঁকে। চিত্রকর মাসের পর মাস তুলি

বুলাইয়া সূর্যোদয়ের চিত্র আঁকিতে থাকেন। কিন্তু প্রভাতে উঠিয়া পরমেশ্বরের ঐ শিল্পকলা একবার দেখ ত! ঐ দিব্য কলার, অনন্ত সৌন্দর্যের উপমা মেলে কি? কিন্তু দেখে কে? ওদিকে ঐ সুন্দর ভগবান দাঁড়াইয়া আছেন আর এদিকে লেপে মুখ ঢাকিয়া আমরা ঘুমাইয়া থাকি। সূর্য বলে, "ওরে কুঁড়ে, তুই ত পড়ে আছিস্, কিন্তু আমি তোকে জাগাব।" এই বলিয়া সে তার জীবনদায়ী কিরণ জানালা দিয়া পাঠাইয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলে।

"সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"

সূর্য সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা। চরাচরের আধার। ঋষিরা তাহাকে 'মিত্র' আখ্যা দিয়াছেন।

"মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবাণো
মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥"।"

'এই মিত্র মানুষকে ডাকে, তাদের কাজে লাগায়। স্বর্গ ও পৃথিবীকে সে ধারণ করে আছে।' সূর্য সত্যসত্যই জীবনের আধার। তাহাতে পরমাত্মা দর্শন কর।

আর ঐ পাবন গঙ্গা! কাশীতে যখন ছিলাম, গঙ্গার তীরে গিয়া বসিতাম। যাইতাম রাত্রের নীরবতায়। কেমন সুন্দর ও নির্মল ঐ প্রবাহ। সেই দিব্য গম্ভীর ধারা আর তাহাতে প্রতিবিম্বিত অনন্ত তারকা। মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। শঙ্করের জটাজুট হইতে অর্থাৎ হিমালয় হইতে বহমানা গঙ্গা! রাজ্যপাট তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া রাজারা যার তীরে তপশ্চর্যার জন্য আসিত—সেই গঙ্গা দেখিয়া মনে আমি অসীম শান্তি অনুভব করিতাম। সে শান্তির বর্ণনা কিরূপে করিব? ভাষা সেখানে সীমিত হইয়া যায়। মৃত্যুর পরে অস্থি যেন গঙ্গায় বিসর্জিত হয়—হিন্দুমাত্রেই কেন যে এই কামনা করে তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম! হাসিবেন? হাসুন। তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমার কাছে এই ভাবনা একান্ত পবিত্র, সঞ্চয় করিয়া রাখার মত। মরণকালে মুখে দুই

ফোঁটা গঙ্গাজল দেওয়া হয়। দুই ফোঁটা জল ত নয়, যেন স্বয়ং ভগবান মুখে অবতীর্ণ। ঐ গঙ্গাকে পরমেশ্বর মনে করুন। উহা পরমেশ্বরেরই বহমানা করুণা। আমাদের অন্তর্বাহ্য সমস্ত ধূলাময়লা গঙ্গা মা ধুইয়া চলিয়াছেন। এই গঙ্গা-মাতায় যদি পরমেশ্বরের প্রকাশ না দেখি ত দেখিব কোথায়? সূর্য, নদী, সোঁ সোঁ করিয়া উত্তাল হইয়া পড়া ঐ বিশাল সমুদ্র—এসব পরমেশ্বরেরই মূর্তি !

আর ঐ হাওয়া। কোথা হইতে আসে, কোথায় যায় তার ঠিকঠিকানা নাই। হাওয়া ভগবানেরই দূত। ভারতবর্ষে হাওয়ার এক প্রবাহ আসে স্থির হিমাচল হইতে আর এক প্রবাহ আসে গম্ভীর সাগর হইতে। এই পবিত্র হাওয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। আমাদের জাগ্রত করে। আমাদের কানে গুঞ্জরণ তোলে। কিন্তু এই হাওয়া যে সন্দেশ বহন করিয়া আনে তাহা শোনে কে? জেলার যদি আমাদের কাছে লেখা পত্রখানি না দেয় ত আমাদের বিরক্তির অবধি থাকে না। আরে অভাগা, কি আছে ঐ চিঠিতে? পরমেশ্বরের এই যে প্রেম-বার্তা প্রতি মুহূর্তে হাওয়া বহিয়া আনিতেছে তাহা শোন।

বেদে অগ্নির উপাসনার কথা আছে। অগ্নি মানে নারায়ণ। কেমন দেদীপ্যমান তাহার মূর্তি! দুইখানি কাঠ ঘষিলেই তাহার প্রকাশ। কে জানে আগে কোথায় লুকাইয়া ছিল? কেমন উত্তপ্ত, কেমন তেজস্বী। অগ্নির উপাসনা করিতে গিয়াই বেদের প্রথম ধ্বনি উৎসারিত হইয়াছিল :

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥"

যে অগ্নির উপাসনা দ্বারা বেদের আরম্ভ সেই অগ্নির দিকে তাকাও। উহার ঐ জ্বলন দেখিয়া জীবাত্মার ছটফটানির কথা আমার মনে পড়িয়া যায়—ঐ অশান্ত শিখা ঘরের উনুনেরই হউক আর বনের দাবাগ্নিরই হউক। বৈরাগীর ঘর সংসার থাকে না। যেখানেই শিখা, সেখানেই যেন মহা ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। তার ছটফটানির বিরাম নাই। ঐ শিখা উপরে উঠার জন্য সর্বদা অধীর-অস্থির। বিজ্ঞানবিদ্

আপনারা বলিবেন ঐ শিখা ইথরের ক্রিয়ায়, হাওয়ার চাপে ছটফট করে। কিন্তু সে যাহাই হউক, আমি এই অর্থে তাহা দেখি: উপরে যে পরমাত্মা আছেন, ঐ যে তেজঃসমুদ্র সূর্যনারায়ণ রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য উহা নিরন্তর উর্ধ্বে লাফঝাঁপ মারিতেছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত উহার এইরূপ ছটফটানি চলে। সূর্য অংশী আর এই সব প্রজ্বলিত শিখা উহার অংশ। অংশ অংশীর কাছে যাওয়ার জন্য ছটফট্ করিতেছে। নিবিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ঐ জ্বালার বিরাম নাই। সূর্য হইতে আমরা অনেক দূরে আছি, এ কথাও উহার মনে হয় না। উহা কেবল জানে নিজশক্তি অনুযায়ী উছলিয়া লাফাইয়া পৃথিবী হইতে উপরের দিকে যাইতে। এই অগ্নিশিখা যেন জ্বলন্ত বৈরাগ্যেরই প্রতিমূর্তি। সেইজন্য বেদের প্রথম নিঃসৃত ধ্বনি ছিল—"**অগ্নিমীলে**"।

॥ ৫৩ ॥ প্রাণীস্থিত পরমেশ্বর

আর ধরুন আমাদের গৃহপালিত পশুর কথা! ঐ গো-মাতা। কেমন বৎসল, কত তার মমতা, কত তার প্রেম! নিজের বাছুরের জন্য দুই-দুই তিন-তিন মাইল দূরবর্তী (চড়িবার) জঙ্গল হইতে সে ছুটিয়া আসে। পাহাড়-পর্বত হইতে কুলকুল প্রবাহিত নদী দেখিয়া বৈদিক ঋষিদের মনে পড়ে হাম্বা রবে আপন বৎসের জন্য ধাবমান পয়স্বিনী গাভীর কথা। নদীকে সম্বোধন করিয়া ঋষি বলেন "হে দেবি, দুগ্ধের মত পবিত্র মধুর জীবনদায়ী পানীয় তুমি বয়ে আন—গাভী যেমন আপন বৎসের জন্য স্তনভরা দুধ নিয়ে জঙ্গল থেকে ফিরে আসে। বাচ্চাকে ছেড়ে গাভী যেমন বনে থাকতে পারে না তেমনি তোমরাও পাহাড়ে থাকতে পার না। ছুটতে ছুটতে পিপাসায় কাতর সন্তানদের কাছে দৌড়ে আস।"

বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ

বৎসল গাভীরূপে ভগবান দ্বারে দণ্ডায়মান।

আর ঐ ঘোড়া! কেমন সুন্দর, বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত! ঘোড়া আরববাসীদের কতই না প্রিয়! সেই আরবের গল্প তোমরা জান কি? বিপদে পড়িয়া কোন আরবের লোক হয়ত ঘোড়া বেচিতে যায়। হাতে মোহরের থলি লইয়া সে আস্তাবলে প্রবেশ করে। তাহার নজর পড়ে ঘোড়ার গম্ভীর,

প্রেমভরা চোখের দিকে। টাকার থলি সে ফেলিয়া দেয় ও বলে, 'জীবন যায় যাবে। ঘোড়া বেচব না। যা হয় হবে। খেতে না পাই ক্ষতি নেই। দেখবেন খোদা।' পিঠে থপ্ থপ্ করিয়াছ ত ঘোড়া প্রেমে অধীর হয়, পুলকিত হয়। কেমন সুন্দর তার ঘাড়ের কেশ! ঘোড়াতে সত্যসত্যই অমূল্য গুণ বিদ্যমান। ঐ সাইকেলে কি আছে? দলাইমলাই কর ত ঘোড়া তোমার জন্য জীবন দেবে। তোমার সাথী হইয়া যাইবে। আমার এক বন্ধু ঘোড়ায় চড়া শিখিতেছিল। ঘোড়া তাহাকে ফেলিয়া দিত। সে আমার কাছে আসিয়া বলিল, "ঘোড়া পিঠে বসতেই দেয় না।" তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম, "ঘোড়ার পিঠেই বসতে যাও, কোন সেবা তার কর কি? সেবা করে অপরে, আর তুমি যাও পিঠে বসতে। তা কি হয়? তুমি নিজে তাকে দানা-পানি দাও, দলাইমলাই কর। তারপর বস।" বন্ধু তাহাই করিতে লাগিল। দিন কয়েক পরে সে আসিয়া বলিল, "ঘোড়া এখন আর ফেলে দেয় না।" ঘোড়া ত পরমেশ্বর। ভক্তকে সে ফেলিতে পারে কি? বন্ধুর ভক্তি দেখিয়া ঘোড়া নরম হইয়া গিয়াছিল। ঘোড়া জানিতে চায় এই ব্যক্তি ভক্ত কি-না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোড়া দলাই-মলাই করিতেন, নিজের পীতাম্বরের কোঁচড় হইতে দানা খাওয়াইতেন। রাস্তায় ঢিপি, খাল, কাদা পড়ে ত সাইকেল অচল। কিন্তু ঘোড়া লাফ দিয়া পার হইয়া যায়। সুন্দর এই প্রেমময় ঘোড়া পরমেশ্বরেরই মূর্তি।

ঐ সিংহের কথা ধরুন। আমি তখন বরোদায় ছিলাম। ভোরে তার গম্ভীর গর্জন শুনিতাম। ঐ শব্দ এমন গুরুগম্ভীর ও মন্থর যে হৃদয় আন্দোলিত হইত। মন্দিরের গর্ভগৃহে যেমন শব্দ গুম গুম করে তেমনি গম্ভীর উহার হৃদয়-গহ্বরের ধ্বনি। সিংহের ঐ ধীর উদাত্ত ও নির্ভীক মুদ্রা! তার ঐ রাজকীয় চালচলন, বাদশাহী বৈভব, ঐ ভব্য সুন্দর কেশর! বনরাজের উপর যেন চামর দোলানো হইতেছে। বরোদার এক বাগানে ঐ সিংহ ছিল। স্বাধীন মুক্ত সেখানে সে ছিল না। খোয়াড়ের মধ্যে চলাফেরা করিত, চক্ষে তার ক্রূরতার লেশও ছিল না। তার মুদ্রা ও দৃষ্টি ছিল করুণাভরা। জগতে যেন তাহার কোন চিন্তাই ছিল না। মনে হইত, নিজের ধ্যানে সে নিমগ্ন। সত্যসত্যই মনে হইত, সিংহ পরমেশ্বরের

এক পবিত্র বিভূতি। বাল্যকালে এণ্ডোক্লিস্ ও সিংহের গল্প পড়িয়াছিলাম। কেমন সুন্দর সে কাহিনী! ঐ ক্ষুধার্ত সিংহ এণ্ডোক্লিসের পূর্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাহার বন্ধু হইয়া গেল, পা চাটিতে লাগিল। কী এই ব্যাপার! এণ্ডোক্লিস সিংহে বিরাজমান পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। সিংহ সর্বদা শঙ্করের কাছে থাকে। সিংহও ভগবানের দিব্য বিভূতি।

আর ঐ বাঘই কি কিছু কম! উহাতে বিশেষ করিয়া ঐশ্বরিক তেজ পরিস্ফুট। উহার প্রতি বন্ধুভাব পোষণ করা অসম্ভব নয়। ভগবান পাণিনি অরণ্যে শিষ্যদের পড়াইতেছিলেন। এমন সময় বাঘ আসিল। ছাত্ররা ভয়ে চেচাইয়া উঠিল—"ব্যাঘ্রঃ ব্যাঘ্রঃ"। পাণিনি বলিলেন, "আচ্ছা, ব্যাঘ্র মানে কি? ব্যাজিঘ্রতীতি ব্যাঘ্রঃ—যার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তীব্র সে ব্যাঘ্র।" ছাত্ররা ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইয়াছিল কিন্তু ভগবান পাণিনির কাছে বাঘ ছিল এক নিরুপদ্রব আনন্দময় শব্দ মাত্র। বাঘ দেখিয়া ব্যাঘ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি তিনি বলিতে লাগিলেন। বাঘ পাণিনিকে খাইয়া ফেলিল। কিন্তু তাহাতে হইল কি? সে পাণিনির দেহের মিষ্ট গন্ধ পাইয়াছিল—তাহার শরীর চিড়িয়া খাইয়া ফেলিল। কিন্তু পাণিনি সেখান হইতে পালাইলেন না। কেননা তিনি তো ছিলেন শব্দব্রহ্মের উপাসক। তাঁহার কাছে সব কিছু অদ্বৈতময় হইয়া গিয়াছিল। ব্যাঘ্রে তাঁহার শব্দব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছিল। পাণিনির এই মহনীয়তার জন্য শাস্ত্রকারদের ভাষ্যে যেখানেই তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানেই পূজ্যভাব হইতে তাঁহাকে "ভগবান পাণিনি" বলা হইয়াছে দেখা যায়। পাণিনির কাছে তাঁহারা মহা কৃতজ্ঞ।

অজ্ঞানান্ধস্য লোকস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥

এইরূপে ভগবান পাণিনি ব্যাঘ্রে পরমাত্মার দর্শন করিয়াছিলেন। জ্ঞানদেব বলিয়াছেন:

ঘরা যেবো পাং স্বর্গ। কাং বরি পডো ব্যাঘ্র।
পরী আত্মবুদ্ধীসী ভঙ্গ।। কদা নোহে॥

ঘরের মধ্যে স্বর্গই আসিয়া প্রবেশ করুক অথবা ব্যাঘ্রই আসিয়া হানা

দিক একাত্মবুদ্ধিতে কোন পরিবর্তন হইবে না। এইরূপ হইয়া গিয়াছিল মহর্ষি পাণিনির অবস্থা। তিনি বুঝিয়াছিলেন ব্যাঘ্রও দৈব বিভূতির অন্যতম।

সাপের কথাও তাহাই। লোকে সাপকে অত্যন্ত ভয় করে। কিন্তু সে যেন শুচি-শুদ্ধ কর্মঠ ব্রাহ্মণ! কেমন পরিষ্কার, কেমন সুন্দর। অপরিচ্ছন্নতার লেশমাত্রও তাহার কাছে অসহ্য। নোংরা ব্রাহ্মণ তবুও দেখা যায়, কিন্তু অপরিচ্ছন্ন সাপ কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? যেন একান্তবাসী ঋষি! নির্মল, চকচকে, মনোহর হারের মত ঐ সাপ। তাহাকে আবার ভয়? আমাদের পূর্বজেরা ত উহার পূজার বিধান দিয়া গিয়াছেন। আপনারা বলিবেন, হিন্দুধর্মে কত যে আজেবাজে জিনিস আছে! তাহা হউক, নাগ পূজার বিধান উহাতে ত আছেই। বাল্যকালে মাকে চন্দন দিয়া নাগ বানাইয়া দিতাম। মাকে বলিতাম, "মা, বাজারে ভাল নাগের চিত্র পাওয়া যায়।" মা বলিতেন, "না, ওগুলি ভাল নয়। ওতে আমার দরকার নেই। নিজের ছেলের তৈরী চিত্রই ভাল।" তারপরে নাগের পূজা হইত। এ কি পাগলামি? একটু ভাবিয়া দেখুন। ঐ সাপ শ্রাবণ মাসে অতিথিরূপে আমাদের ঘরে আসে। শ্রাবণের ধারায় ঐ বেচারার গর্ত জলে ভরিয়া যায়। সে তখন কি করে? দূরে একান্তবাসী ঋষি সে। অযথা আপনার অসুবিধা না হয় তাই চালের নীচে চেলা কাঠের মধ্যে চুপচাপ পড়িয়া থাকে। যত পারে কম জায়গা সে নেয়। কিন্তু আমরা লাঠি লইয়া তাড়া করি। সঙ্কটে পড়িয়া অতিথি ঘরে আশ্রয় লইলে কি তাকে মারিতে আছে? সেণ্ট ফ্রান্সিস্ সম্বন্ধে কথিত আছে—জঙ্গলে সাপ দেখিলেই তিনি বলিতেন, "এস ভাই, এস।" সাপ তাঁহার কোলে খেলিত, গায়ে এদিকে-ওদিকে চলাফেরা করিত। ইহাকে বাজে কথা মনে করিবেন না। প্রেমে এই শক্তি অবশ্যই আছে। বলা হয় সাপ বিষধর। কিন্তু মানুষের বিষ কি কম? সাপে কখনও কখনও কামড়ায়। বিনা কারণে সে কামড়ায় না। শতকরা নব্বইটি সাপ বিষধর নয়। সে আপনার ক্ষেত রক্ষা করে। ক্ষেত নাশ করে এমন অসংখ্য কীট ও প্রাণী খাইয়া সে বাঁচিয়া থাকে। এইরূপ উপকারী, শুচি-শুদ্ধ, উজ্জ্বল-শ্রী, নির্জনতা-প্রিয় সর্প,

সে ভগবানের রূপ নয় ত কি? আমাদের সকল দেবতার শরীরে কোথাও না কোথাও সাপ আছেই। গণেশকে আমরা দিয়াছি সাপের কোমরপাটা। শঙ্করের গলায় সাপ জড়ানো। আর ভগবান বিষ্ণু ত নাগশয্যায়ই শায়িত। ইহার মাধুর্য লক্ষ্য করুন। নাগে ঈশ্বরের মূর্তি ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই এই সকলের তাৎপর্য। সর্পস্থ পরমেশ্বরের পরিচয় লাভ করুন।

এইরূপ কত উদাহরণ দিব? কল্পনার পরিচয় দিতেছি মাত্র। এইরূপ মনোরম কল্পনাতেই রামায়ণের যত কিছু মাধুর্য। রামায়ণে পিতা-পুত্রের প্রেম, মা-ছেলের প্রেম, ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেম, স্বামী-স্ত্রীতে প্রেম—এসবই আছে। কিন্তু এই কারণে রামায়ণ আমার প্রিয় নয়। বানরের সহিত রামের বন্ধুত্ব হইয়াছিল এ কারণেই রামায়ণ আমার ভাল লাগে। আজকাল বলা হয় যে বানরেরা ছিল নাগ-জাতির মানুষ। ঐতিহাসিকের কাজই হইল পুরাতত্ত্বের গবেষণা করা, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নাই। কিন্তু রাম সত্যসত্যই বানরের সহিত বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাতে অসম্ভব কি আছে? রামের সহিত বানরের বন্ধুত্ব হইয়াছিল এখানেই ত রামের যথার্থ মাধুর্য। গাভীর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধও সেইরূপ। কৃষ্ণপূজার তাহা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কৃষ্ণের যে কোন ছবি লউন, দেখিবেন তাঁহার আশেপাশে রহিয়াছে সবৎসা গাভী। গোপাল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হইতে গাই সরাইয়া নিন, কৃষ্ণের আর থাকে কি? সেইরূপ রাম হইতে বানর সরাইলে কি রামে রামত্ব থাকে? রাম বানরের মধ্যে পরমাত্মা দর্শন করিয়াছিলেন ও তাহাদের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইয়া ছিলেন। ইহাই হইল রামায়ণ বুঝিবার চাবি। এই চাবি ছাড়িলেন অমনি রামায়ণের মাধুর্য খোয়াইলেন। পিতা-পুত্রের, বা মাতা-পুত্রের ভালবাসা অন্যত্রও পাওয়া যাইবে। কিন্তু নর-বানরের অনন্যমধুর মৈত্রী কেবল রামায়ণেই পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়। বানরে স্থিত ভগবানকে রামায়ণ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। বানরদের দেখিয়া ঋষিরা আনন্দ অনুভব করেন। মাটিতে পা না ছোঁয়াইয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইয়া ঝাপাইয়া ঐ বানরেরা রামটেক হইতে কৃষ্ণাতট পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইত, খেলিত। ঐ নিবিড়-ঘন বন আর তাহাতে খেলায় মত্ত বানরদের দেখিয়া ঐ সহৃদয় ঋষিদের মনে কাব্যের স্ফুরণ জাগিয়া উঠিত।

আনন্দে তাঁহারা বিভোর হইতেন। ব্রহ্মার চক্ষু কিরূপ ? একথা বলিতে গিয়া উপনিষদে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মার চক্ষু বানরের মত। বানরের চোখ চঞ্চল। চারিদিকে নজর। তেমনি হওয়া চাই ব্রহ্মার চোখ। ঈশ্বরের চোখ স্থির থাকিলে চলে না। আপনি-আমি ধ্যানস্থ হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু ঈশ্বর ধ্যানে বসিলে সৃষ্টির উপায়! তাই ঋষিরা বানরের মধ্যে সকলের কল্যাণকামী ব্রহ্মার দৃষ্টি দেখেন। বানরে পরমাত্মা দেখিতে শিখুন।

আর ঐ ময়ূর! মহারাষ্ট্রে ময়ূর বেশী নাই। গুজরাটে অনেক আছে। আমি গুজরাটে ছিলাম। দশ-বার মাইল হাঁটা আমার অভ্যাস। বেড়াই-বার সময় পথে ময়ূর দেখিতাম। আকাশে যখন মেঘ জমে, রঙ যখন কৃষ্ণ-কাল হয়, বৃষ্টি যখন পড়-পড় হয়, ময়ূর তখন ডাকিতে থাকে। তার হৃদয় নিঙড়ানো সেই কেকা রব শোনেন ত বুঝিবেন। আমাদের সমগ্র স্বরগ্রাম ময়ূরের এই কেকা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ময়ূরের কেকাই "ষড়্‌জং রৌতি।" এই প্রথম ষড়্‌জ ময়ূরের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। আর তাহা কমাইয়া-বাড়াইয়া অন্যান্য স্বর আমরা সৃষ্টি করিয়াছি। মেঘে নিবদ্ধ উহার ঐ দৃষ্টি, উহার ঐ গম্ভীর ধ্বনি, আর মেঘের গুড়্‌গুড়্‌ গর্জন শোনামাত্র উহার ঐ পুচ্ছ বিস্তার! আহা! ঐ পুচ্ছের কাছে মানুষের সকল ঐশ্বর্য ম্লান হইয়া যায়। রাজা বেশভূষা করে। কিন্তু ময়ূরের পুচ্ছের কাছে সে আর কি সাজিবে? কেমন অপরূপ ঐ পুচ্ছ! ঐ অজস্র চক্ষু, ঐ বিচিত্র রঙের খেলা, ঐ অনন্ত ছটা, ঐ অদ্ভুত সুন্দর মৃদু রমণীয় রচনা, ঐ বিচিত্র কারুকার্য! দেখুন ঐ পুচ্ছ, আর উহার মধ্যে পরমাত্মাকেও দেখুন। এভাবেই এই সারা সৃষ্টি সাজিয়া রহিয়াছে। সর্বত্র ভগবান দর্শন দেওয়ার জন্য বিরাজমান। কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। এমনই আমরা অভাগা! তুকারাম বলিয়াছেন:

দেব আহে সুকাল দেশীঁ, অভাগ্যাসী দুর্ভিক্ষ।

"প্রভু সর্বত্র সম্পদশীল, অভাগার দৃষ্টিতে সর্বত্র দুর্ভিক্ষ।" সন্তদের পক্ষে সর্বত্র সমৃদ্ধি। কিন্তু আমাদের অভাগাদের পক্ষে সব জায়গায় আকাল।

আর ঐ কোকিলকেই বা কিরূপে ভুলিব? কাহাকে সে ডাকে? গ্রীষ্মকালে নদী-নালা সব শুকাইয়া যায়। কিন্তু বৃক্ষে বৃক্ষে নব পল্লব অঙ্কুরিত হইতে থাকে। কে দিল ঐ বৈভব, কোথায় আছেন সেই বৈভবদাতা, একথাই কি সে জিজ্ঞাসা করে? কেমন তীব্র মধুর কণ্ঠস্বর! হিন্দু-ধর্মে ত কোকিল-ব্রতের বিধানই আছে। স্ত্রীলোকেরা ব্রত লয়, কোকিলের কুহু রব না শোনা পর্যন্ত আহার গ্রহণ করিবে না। এই ব্রত কোকিলের রূপে প্রকাশমান পরমাত্মাকে দর্শন করিতে শিখায়। কোকিল কী সুন্দর ধ্বনি করে! যেন উপনিষদই গান করে। উহার কুহু-কুহু ধ্বনি কানে আসে, কিন্তু উহাকে দেখা যায় না। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ উহার জন্য পাগল হইতেন, উহার খোঁজে বনে বনে ঘুরিতেন। ইংলণ্ডের মহান্ কবি কোকিলকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন আর ভারতের সাধারণ ঘরের বৌ কোকিল না দেখিয়া অন্ন গ্রহণ করে না। এই কোকিল-ব্রতের দ্বারা ভারতীয় নারী মহান্ কবির মর্যদা লাভ করিয়াছেন। যে কোকিল পরম আনন্দময় মধুর কুহুধ্বনি শোনায় তাহার রূপের মধ্যে যেন সুন্দর পরমাত্মাই প্রকাশমান!

কোকিল সুন্দর আর কাক কি অসুন্দর? কাকেরও সমাদর করুন। আমার ত কাক খুব ভাল লাগে। তার কাল কুচকুচে রঙ, ঐ তীব্র আওয়াজ! উহা কি খারাপ? না, উহাও মিষ্ট। পাখা নাড়িয়া যখন সে কাছে আসে, কেমন ভাল লাগে। শিশুদের চিত্ত সে মুহূর্তে হরণ করিয়া লয়। ঐ কাক, ঐ চড়াই বলিয়া উহাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দেওয়া হয়। কাক ভালবাসে বলিয়া শিশুরা কি পাগল? না না, উহারাই জ্ঞানের আকর। কাকরূপে ব্যক্ত পরমেশ্বরের সহিত উহারা একরূপ হইয়া যায়। মা ভাতে দই দেন, গুড় মাখেন। শিশুদের সেদিকে লক্ষ্য নাই। কাক ডানা ফড় ফড় করে, মুখ-ভঙ্গী করে—উহাতেই তাহাদের আনন্দ। সৃষ্টির প্রতি শিশুদের এই যে মহা আকর্ষণ তাহা অবলম্বনেই ঈশপের গল্প রচিত। ঈশপ্ সর্বত্র ঈশ্বর দেখিতেন। আমার প্রিয় গ্রন্থের তালিকায় সর্বাগ্রে ঈশপের গল্পের নাম করিতে আমার কখনও দ্বিধা হইবে না। ঈশপের রাজ্যে কেবল দুই-হাত আর দুই-পা বিশিষ্ট মানুষের কথাই আছে

তাহা নয়। সেখানে শিয়াল-কুকুর, হরিণ-খরগোশ, কাক-কচ্ছপ ইত্যাদি সকল প্রকার প্রাণী আছে। সকলেই কথা কয়, হাসে, কাঁদে। তাহা এক মহা সম্মেলনই বটে! সমস্ত চরাচর ঈশপের সহিত কথা বলিত। তাঁহার দিব্য দর্শন লাভ হইয়াছিল। রামায়ণও এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই দৃষ্টি হইতে রচিত। তুলসীদাস রামের বাল্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। রাম উঠানে খেলিতেছে। একটি কাক সামনে আসে। রাম চুপি চুপি তাহাকে ধরিতে যায়। কাক একটু দূরে সরিয়া যায়। অবশেষে রাম ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু একটা উপায় রামের মাথায় আসে। হাতে মিঠাইয়ের টুক্‌রা লইয়া সে কাকের কাছে যায়। রাম টুক্‌রাটা একটু আগাইয়া ধরে। কাক নিকটে আসে। এরূপ বর্ণনায় তুলসীদাসের ক্লান্তি নাই। কারণ ঐ কাক পরমেশ্বর। রামের মূর্তির অংশ ঐ কাকেও বিদ্যমান। রাম ও কাকের ঐ পরিচয় যেন পরমাত্মার সহিত পরমাত্মার পরিচিতি।

॥ ৫৪ ॥ দুর্জনের মধ্যেও পরমেশ্বর দর্শন

সারাংশ, এইরূপে সমগ্র সৃষ্টিতে বিবিধ রূপে—পবিত্র নদীরূপে, বিশাল পর্বতরূপে, গম্ভীর সাগররূপে, বৎসল গাভীরূপে, সুদর্শন ঘোড়া-রূপে, বৈভবশালী সিংহরূপে, মধুর কোকিলরূপে, সুন্দর ময়ূররূপে, পরিচ্ছন্ন একান্তপ্রিয় সর্পরূপে, ডানা ফড়ফড়কারী কাকরূপে, অশান্ত অগ্নিশিখারূপে, প্রশান্ত তারকারাজিরূপে—সর্বত্র পরমাত্মা বিরাজমান। চোখকে ঐ রূপ দেখার অভ্যাস করিতে হইবে। প্রথমে স্থূল সরল অক্ষর, তারপরে সূক্ষ্ম যুক্তাক্ষর শিখিতে হইবে। যুক্তাক্ষর না শেখা পর্যন্ত পাঠের অগ্রগতি হইবে না। পদে পদে যুক্তাক্ষর আসিবে। দুর্জনের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাকেও দেখিতে শেখা চাই। রামকে ভগবানরূপে বুঝা যায়, কিন্তু রাবণকেও বুঝিতে হইবে। প্রহ্লাদকে ভাল লাগে কিন্তু হিরণ্যকশিপুকেও ভাল লাগিতে হইবে। বেদে বলা হইয়াছে:

নমো নমঃ স্তেনানাং পতয়ে নমো নমঃ
নমঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যো নমো নিষাদেভ্যঃ।
ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা
ব্রহ্মেবেমে কিতবাঃ।

"ঐ ডাকাত সর্দারদের নমস্কার; ঐ ক্রূরদের, ঐ হিংসাকারীদের নমস্কার। এই ঠগ, এই চোর, এই ডাকাত—সকলই ব্রহ্মময়। ইহাদের সবাইকে নমস্কার।"

ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে সরল অক্ষর শিখিয়াছি, এবার কঠিন অক্ষর শিখিতে হইবে। গ্রন্থকার কারলাইল 'বিভূতি-পূজা' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি নেপোলিয়ানকেও বিভূতি বলিয়াছেন। এখানে পরমাত্মা শুদ্ধ-পরমাত্মা নহেন, মিশ্র পরমাত্মা। কিন্তু এই যে পরমেশ্বর তাঁহাকেও স্বীকার করা চাই। তাই তুলসীদাস রাবণকে রামের বিরোধী ভক্ত বলিয়াছেন। এই ভক্তের ধরণ-ধারণ একটু আলাদা। আগুনে পা পোড়ে, ফোসকা পড়ে। কিন্তু যে স্থানে ফোসকা পড়িয়াছে তাহাতে গরম সেঁক দিলে তবে ফোসকা দূর হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেখাইলেও রাম ও রাবণে একই পরমেশ্বরের আবির্ভাব।

স্থূল ও সূক্ষ্ম, সরল ও মিশ্র, সহজ অক্ষর ও যুক্তাক্ষর—সব শেখ। আর সব শেষে, পরমেশ্বর ছাড়া কোন স্থান নাই এরূপ অনুভব কর। অণু-রেণুতে তিনি মিশিয়া আছেন। পিঁপড়া হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সর্বত্র পরমাত্মাই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সকলকে যিনি সমান চোখে দেখেন সেই দয়ালু, জ্ঞানমূর্তি, স্নেহশীল, সমর্থ, পাবন, সুন্দর—পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন।

রবিবার, ২৪-৪-১৯৩২

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন

॥ ৫৫ ॥ বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জুনের উৎকণ্ঠা

বন্ধুগণ,

গত সপ্তাহে এই বিশ্বের অনন্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত পরমাত্মাকে কিভাবে চেনা যায়, এই যে বিরাট্ প্রদর্শনী আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজমান তাহা কিভাবে উপলব্ধি করা যায় সেকথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমে স্থূল পরে সূক্ষ্ম, প্রথমে সরল পরে মিশ্র, এইরূপে সর্ব বস্তুতে ভগবানকে দেখিতে হইবে, সর্বত্র তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে, অহর্নিশি যত্ন করিয়া সমস্ত বিশ্বকে আত্মরূপে দেখিতে শিখিতে হইবে—পূর্ব অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

আজ একাদশ অধ্যায়ের আলোচনা করা যাইতেছে। এই অধ্যায়ে ভগবান নিজ প্রত্যক্ষ রূপ দেখাইয়া অর্জুনের প্রতি পরম কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্জুন ভগবানকে বলিলেন, "ভগবান, তোমার ঐ পূর্ণরূপ দেখতে চাই—যে রূপে তোমার সকল মহান্ বিভূতির প্রকাশ সে রূপ নিজের চোখে দেখতে আমার বাসনা।" অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমরা 'বিশ্ব', 'জগৎ', ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি। এই 'জগৎ' বিশ্বের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই ছোটখাটো টুকরার ধারণাই আমরা সম্যক্ করিয়া উঠিতে পারি না, আমাদের কাছে এই জগৎ কতই বিশাল। কিন্তু বিশ্বের তুলনায় ইহা কতই না তুচ্ছ! রাত্রিকালে আকাশের দিকে একবারটি তাকান ত দেখিতে পাইবেন—অনন্ত অগ্নি-গোলক। আকাশের আঙ্গিনায় ঐ যে আলপনা, ঐ যে সব ছোট ছোট সুন্দর ফুল, ঐ যে লক্ষ লক্ষ তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে তাহাদের স্বরূপ জানেন কি? ঐ ছোট ছোট তারকা মহা প্রচণ্ড। উহাদের মধ্যে অনন্ত সূর্যের সমাবেশ হইয়া যায়। দাউ দাউ জলন্ত ধাতুর পিণ্ড ঐগুলি। ঐ যে অনন্ত পিণ্ড তাহার হিসাব কে করিবে? না আছে উহাদের অন্ত, না আছে কোন সীমা। খালি চোখেই হাজার হাজার দেখা যায়। দূরবীন দিয়া দেখিলে কোটি কোটি দেখা যাইবে। আরও বড় দূরবীন দিয়া দেখিলে পরার্ধ পর্যন্ত দেখা যাইবে।

আর শেষটায়, ইহার অন্ত যে কোথায় ও কিসে সে ধারণা করা যাইবে না। এই যে অনন্ত সৃষ্টি উপরে নীচে পরিব্যাপ্ত, ইহার অতি ক্ষুদ্র এক টুকরা আমাদের এই পৃথিবী—উহাকেই কত বিশাল মনে হয়!

এই বিশাল সৃষ্টি পরমেশ্বরের স্বরূপের এক দিক। উহার অপর দিকও দেখুন। তাহা হইতেছে কাল। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইতিহাসের সীমার মধ্যে বড় জোর দশ হাজার বছর পর্যন্ত পাওয়া যায়। তার আগেকার কালের কল্পনা করা যায় না। ইতিহাস-কাল দশ হাজার বছরের আর আমাদের নিজেদের জীবনকাল বড়জোর শত বর্ষের হইবে। বস্তুতপক্ষে কালের বিস্তার অনাদি—অনন্ত। কত কাল অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার অনুমান করা যায় না। সম্মুখে কত কাল পড়িয়া আছে তাহারও ধারণা করা সম্ভব নয়। আমাদের জগৎ যেমন বিশ্বের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ, তেমনই ঐতিহাসিক দশ হাজার বছরও অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নয়। অতীতকাল অনাদি, ভবিষ্যৎকাল অনন্ত। আর এই ক্ষুদ্র বর্তমান কাল দেখিতে দেখিতে অতীতের গর্ভে লীন হইয়া যায়। বর্তমানকাল ঠিক ঠিক কোথায় আছে তাহা নির্ণয় করার চেষ্টা করিতেছেন ত ইতিমধ্যেই উহা অতীতে মিলিয়া যায়। এইরূপ একান্ত অস্থির বর্তমানকালের আমরা কর্তা! এই আমি কথা বলিতেছি। শব্দ মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই তাহা অতীতে বিলীন হইয়া গেল। এমনি করিয়া এই মহান্ কাল-নদী একটানা বহিয়া চলিয়াছে। না উহার উদ্‌গমের ধারনা আছে, না অন্তের। মধ্যেকার একটু প্রবাহমাত্র আমরা দেখিতে পাই।

এই প্রকারে এক দিকে স্থলের বিশাল বিস্তার ও অপর দিকে কালের প্রচণ্ড প্রবাহ—এই দুই দিক হইতে সৃষ্টির দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে কল্পনাশক্তিকে যতই খাটাই না কেন ইহার কোনও কূলকিনারা পাওয়া যাইবে না। পরমেশ্বরের যে বিরাট্ রূপ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তিনকালে, উপর-নীচ-মধ্য তিন স্থলে ব্যাপ্ত, ঠিক সেইরূপে পরমেশ্বরকে একই সময়ে আর একই বারে দেখার সাধ অর্জুনের হইল। আর ঐ বাসনা হইতে একাদশ অধ্যায়ের সূচনা।

অর্জুন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কিরূপ প্রিয়? এতটা যে দশম অধ্যায়ে কোন্ কোন্ স্বরূপে তাঁর ধ্যান করা চাই এই কথা বলিতে গিয়া ভগবান বলিয়াছেন, "পাণ্ডবদের মধ্যে যে অর্জুন তাঁর রূপে আমার ধ্যান কর।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।" ইহার অধিক প্রেমের পাগল, প্রেমোন্মাদনা কী হইতে পারে? স্নেহ যে কতদূর আবেগময় হইতে পারে—ইহা তাহার এক উদাহরণ। অর্জুনের প্রতি ভগবানের অপার প্রীতি। এই একাদশ অধ্যায় সেই প্রীতির প্রসাদ। অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়া ভগবান তাঁহার দিব্য রূপ দেখার বাসনা পূর্ণ করিলেন। অর্জুনকে প্রেমের প্রসাদ দিলেন।

॥ ৫৬ ॥ ক্ষুদ্র মূর্তিতেও পূর্ণ দর্শন হইতে পারে

সেই দিব্য সুন্দর রূপের বর্ণনা এই অধ্যায়ে আছে। এসব সত্ত্বেও এই বিশ্বরূপ দর্শনের ব্যাপারে আমার বিশেষ কোন লোভ নাই। আমি ক্ষুদ্র রূপেতেই তুষ্ট। যে ছোট খাটো সুন্দর প্রিয় রূপ চক্ষে ধরা পড়ে উহার মাধুরী অনুভব করিতে আমি শিখিয়াছি। পরমেশ্বর টুকরা নহেন। পরমেশ্বরের যে রূপ দেখিতেছি তাহা তাঁর এক টুকরা আর বাকী পরমেশ্বর বাহিরে আছেন এরূপ আমি মনে করি না। যে পরমেশ্বর বিরাট্ বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, তিনিই তাঁহার পূর্ণরূপে ছোট মূর্তিতেও, মাটির একটি কণাতেও ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, কম নহেন। অমৃতের সিন্ধুতে যে মিষ্টতা এক বিন্দুতেও সেই মিষ্টতা। অমৃতের যে ক্ষুদ্র বিন্দু আমি পাইয়াছি তাহার মধুরতা আমি চাখিতে থাকিব। ইহাই আমার বাসনা। ভাবিয়া-চিন্তিয়াই আমি অমৃতের দৃষ্টান্ত দিতেছি। জলের বা দুধের দিই নাই। এক বাটি দুধে যে স্বাদ, এক ঘটি দুধেও সেই স্বাদ। কিন্তু স্বাদ তেমন হইলেও পুষ্টি সমান নহে। এক বিন্দু দুধে যে পুষ্টি, এক বাটি দুধে তাহা অপেক্ষা অধিক পুষ্টি। কিন্তু অমৃতের বেলায় তাহা নয়। অমৃত-সিন্ধুর মিষ্টতা অমৃতের এক বিন্দুতেও থাকে, তা ছাড়া ততটাই তাহা পুষ্টিকরও বটে। এক বিন্দু অমৃত গলার নীচে গেলে উহাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়।

তেমনি যে দিব্যতা, যে পবিত্রতা পরমেশ্বরের বিরাট স্বরূপে বিরাজিত তাহা ছোটখাটো মূর্তিতেও বিরাজমান। এক মুষ্টি গম দেখিয়া যদি আমি গম চিনিতে না পারি ত বস্তাভরা গম আমার সামনে রাখিলেই কি তাহা চিনিতে পারিব? ঈশ্বরের ক্ষুদ্র নমুনা যাহা আমার চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা হইতে যদি ঈশ্বরকে আমি না চিনিলাম ত বিরাট্ পরমেশ্বরকে দেখিয়া কিরূপে চিনিব? ছোটবড়তে কি আছে? ছোটর পরিচয় হইলে বড়র পরিচয়ও হইয়া যায়। অতএব, ঈশ্বর আমাকে বিরাট্ রূপ দেখাক্—এই আগ্রহ আমার নাই। অর্জুনের মত বিশ্বরূপ-দর্শনের প্রার্থনা করার যোগ্যতাও আমার নাই। তা ছাড়া যাহা আমরা দেখি তাহা বিশ্বরূপের টুকরামাত্র, এমন ত নয়। ছবির কোন ছেঁড়া টুকরা হইতে গোটা ছবির ধারণা হয় না। কিন্তু পরমেশ্বর ত এরূপ টুকরায় তৈরী নন। পরমেশ্বর খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত নন। ছোটখাটো স্বরূপেও ঐ অনন্ত পরমেশ্বর পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত আছেন। ছোট ফটো আর বড় ফটোতে পার্থক্য কি? বড় ফটোতে যাহা, ছোট অপেক্ষা ছোট ফটোতেও তাহাই। ছোট ফটো মানে বড় ফটোর এক টুকরা মাত্র নহে। অক্ষর আকারে ছোট হইলেও অর্থ সেই একই হয়। বড় টাইপের অক্ষর হইলেও সেই অর্থ। বড় টাইপে বড় অর্থ, আর ছোট টাইপে ছোট অর্থ এমন ত নয়।

এই বিচার-পদ্ধতি মূর্তিপূজার আধার। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে অনেক আক্রমণ হইয়াছে। বাহিরের এবং এখানকারও অনেক সমালোচক মূর্তিপূজাকে দোষের বলিয়াছেন। কিন্তু যতই আমি এ বিষয়ে চিন্তা করি ততই মূর্তিপূজার দিব্য ভাবনা আমার কাছে স্পষ্ট হয়। মূর্তিপূজার অর্থ কী? কোন ছোট বস্তুতে সমগ্র বিশ্বকে অনুভব করার যে বিদ্যা তাহাই মূর্তিপূজা। কোন ক্ষুদ্র গ্রামে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দেখার শিক্ষা কি ভুল? ইহা কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা। বিরাট্ স্বরূপে যাহা আছে ছোট মূর্তিতে, এক কণা মাটিতেও তাহা আছে। ঐ মাটির ঢেলাতে আম, কলা, গম সোনা, তামা, রূপা সবই আছে। সমস্ত সৃষ্টি ঐ কণাতে আছে। কোন

ছোট নাটকের দলে যেমন একই লোক বার বার ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আসে পরমেশ্বরকেও সেইরূপ জানিও। যেমন কোন নাট্যকার নিজে নাটক লেখে আবার নিজেই অভিনেতার সাজে অভিনয় করে পরমাত্মাও তেমনি অনন্ত নাটক লেখেন আর নিজেই অনন্ত পাত্র-পাত্রী সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। এই অনন্ত নাটকের কোন এক পাত্রকে চিনিলে সমস্ত পাত্রের পরিচয় লাভ হয়।

কাব্যের উপমা-দৃষ্টান্তের যাহা আধার মূর্তিপূজারও তাহাই আধার। কোন সুডৌল বস্তু দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়। কারণ তাহাতে সুব্যবস্থার সৌন্দর্য্য রহিয়াছে। সুব্যবস্থিততাই ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বরের সৃষ্টি সর্বাঙ্গসুন্দর। উহাতে সব সুব্যবস্থিতভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। ঐ সুন্দর বস্তু মানে ঈশ্বরের সুব্যবস্থিত সুন্দর মূর্তি। কিন্তু জঙ্গলে উৎপন্ন আঁকাবাঁকা গাছও ত ঈশ্বরেরই মূর্তি। উহাতে রহিয়াছে ঈশ্বরের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ। ঐ বৃক্ষের কোন বন্ধন নাই। ঈশ্বরকে কে বন্ধনে বাঁধিতে পারে? সেই বন্ধনাতীত পরমেশ্বর ঐ আঁকাবাঁকা গাছে রহিয়াছেন। কোন সোজা সরল স্তম্ভ তাহা ঈশ্বরের ঋজুতার সাক্ষ্য। আর ঐ নক্সা-কাটা স্তম্ভ! তাহাও পরমেশ্বরেরই প্রতীক,—সেই পরমেশ্বরের যিনি তারকা দিয়া আকাশে বিচিত্র নক্সা আঁকেন। কাটা-ছাঁটা ব্যবস্থিত বাগানে ঈশ্বরের সংযমরূপ দেখা যায়। আর বিশাল বনে ঈশ্বরের ভব্যতা ও স্বতন্ত্রতার দর্শন পাওয়া যায়। জঙ্গলেও আনন্দ লাভ হয়, ব্যবস্থিত বাগানেও আনন্দ পাওয়া যায়। আমরা কি তবে পাগল? না, উভয়ের দ্বারাই আনন্দ লাভ হয়, কারণ উভয়ের ক্ষেত্রেই ঐশ্বরিক গুণের প্রকাশ ঘটিয়াছে। গোল-মসৃণ শালগ্রাম শিলাতে যে ঐশ্বরিক তেজ, এবড়ো-খেবড়ো ঐ গণপতিতেও তাহা বিদ্যমান। সুতরাং ঐ বিরাট্ রূপের দর্শন যদি আমার পৃথকভাবে লাভ না হয় তবে চিন্তার কিছু নাই। ভগবান সর্বত্র বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন গুণের মাধ্যমে প্রকাশিত। সেইজন্য আমাদের আনন্দ হয় আর ঐ বস্তুর সম্বন্ধে আত্মীয়তার ভাব জন্মে। আনন্দ যে হয় তাহা অকারণ নয়! আনন্দ কেন হয়? উহার সহিত আমাদের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে তাই হয়। সন্তানকে দেখা মাত্র মায়ের আনন্দ হয়। কারণ উহার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ।

এইরূপে প্রত্যেক বস্তুর সহিত ভগবানের সম্বন্ধ জুড়িয়া দাও। আমার-তোমার মধ্যে যে পরমেশ্বর আছেন ঐ বস্তুতেও তিনি আছেন। এইভাবে সম্বন্ধ বাড়ানো মানে আনন্দ বাড়ানো। আনন্দের আর যুক্তিসম্মত কোন কারণ নাই। সর্বত্র ভালবাসার সম্বন্ধ জুড়িতে থাকুন, দেখিবেন কি বিস্ময়কর উহার পরিণাম। তখন অনন্ত সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত পরমাত্মা অনুরেণুতেও দেখা দিবেন। একবার এই দৃষ্টি লাভ হইলে আর কি চাই? কিন্তু ইহার জন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে অভ্যস্ত করিতে হইবে। আমাদের ভোগবাসনা দূর হইয়া যখন প্রেমের পবিত্র দৃষ্টি লাভ হইবে তখন প্রত্যেক বস্তুতে ঈশ্বর দেখা দিবেন। আত্মার রঙ কিরূপ তার সুন্দর বর্ণনা উপনিষদে আছে। আত্মার রঙ কিরূপ ঋষি সপ্রেমে তাহা বলিতেছেন:

"যথা অয়ং ইন্দ্রগোপঃ"

এই যে লাল লাল রেশমমোলায়েম মৃগ-কীট আত্মার রূপ তাহারই মত। ঐ মৃগ-কীট দেখিলে কতই না আনন্দ হয়! কোথা হইতে আসে এই আনন্দ? আমাতে যে ভাব তাহাই ঐ ইন্দ্রোগোপে বিদ্যমান। উহার সহিত আমার সম্বন্ধ না থাকিলে আমার আনন্দ হইত না। আমার মধ্যে যে সুন্দর আত্মা ইন্দ্রগোপেও সেই আত্মা। তাই না উহার সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। উপমা কেন দিই? উহাতে আনন্দ হয় কেন? দুই বস্তুতে সাম্য থাকে বলিয়া আমরা উপমা দিই আর সেই কারণেই আনন্দ হয়। উপমেয় ও উপমান যদি একান্তই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হয় তবে আনন্দ হইবে না। লবণ-লঙ্কার মত একথা কেহ বলে ত তাহাকে আমরা নির্বোধ বলি। কিন্তু 'তারাগুলি ফুলের মত' একথা বলিলে উভয়ের মধ্যে সমতা আছে বলিয়া লোকের আনন্দ হয়। লবণ-ঝালের মত একথা বলিলে সাদৃশ্য অনুভূত হয় না। লবণে যে পরমাত্মা, ঝালেও সেই পরমাত্মা—এই দর্শন, এই বিশাল দৃষ্টি যাহার লাভ হইয়াছে,—'লবণ কিরূপ? না, লঙ্কার মত'—এই উক্তিতেও সে আনন্দ অনুভব করিবে। তাৎপর্য এই যে ঈশ্বরীয় রূপ প্রত্যেক বস্তুতে ওতপ্রোত ভরা আছে। তার জন্য বিরাট্ দর্শনের আবশ্যকতা নাই।

॥ ৫৭ ॥ বিরাট্ বিশ্বরূপ সহ্য হয় না

তাহা ছাড়া বিরাট্ দর্শন আমাদের সহ্য হইলে ত ? ছোট সগুণ রূপের প্রতি যে প্রেমের অনুভূতি, যে মমত্ব বোধ জাগে, যে মধুরতার আভাস আসে, বিশ্বরূপ দর্শনে তাহা কখনও হইবার নয়। ঠিক তাহাই হইয়াছিল অর্জুনের অবস্থা। থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অবশেষে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভগবান, তোমার পূর্বের সেই মনোহর রূপ দেখাও।" বিরাট্ স্বরূপ দেখার ইচ্ছা করিও না, নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অর্জুন একথা বলিতেছেন। ঈশ্বর যে তিন কাল ও তিন লোকে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তাহাই ভাল। ঐ সব তারকা মিলিয়া গিয়া জ্বলন্ত পিণ্ডের আকারে যদি আমাদের সম্মুখে আসে ত আমাদের দশা কি হইবে ? তারাগুলি দেখিতে কেমন শান্ত-স্নিগ্ধ ! মনে হয়, উহারা দূর হইতে আমাদের সহিত কথা বলিতেছে। কিন্তু চোখ-জুড়ানো ঐ তারকাই যদি নিকটে আসিয়া পড়ে ত তাহা হইবে একেবারে দাউ দাউ জ্বলন্ত আগুন। পুড়িয়া আমরা ছাই হইয়া যাইব। ঈশ্বরের এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেখানে যেমন সেখানে তেমনি থাকিতে দাও। ঐ সবকে এক জায়গায় জড় করায় আনন্দ কোথায় ? বোম্বাইয়ের ঐ কবুতর খানায় হাজার হাজার কবুতর থাকে। সেখানে তাদের কি স্বাধীনতা আছে ? অদ্ভুত লাগে ঐ দৃশ্য। আকাশ, পাতাল, পৃথিবী—এই তিন ভাগে সৃষ্টি বিভক্ত। মজা ত এখানেই। স্থলাত্মক সৃষ্টি সম্বন্ধে যেকথা, কালাত্মক সৃষ্টি সম্বন্ধেও সেই একই কথা। অতীতের স্মৃতি যে আমাদের থাকে না, আর ভবিষ্যতের জ্ঞান যে আমাদের নাই তাহা আমাদের ভালরই জন্য। যে সব বস্তুতে একমাত্র ভগবানের কর্তৃত্ব রহিয়াছে, মনুষ্য-প্রাণীর কর্তৃত্ব আদৌ নাই, কোরানে এইরূপ পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ আছে। 'ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান' তাহার একটি। আমরা অনুমান করিতে পারি, কিন্তু অনুমান জ্ঞান নহে। ভবিষ্যতের কথা যে জানি না তাহাতে আমাদেরই কল্যাণ। সেইরূপ অতীতকালের স্মৃতি যে থাকে না তাহাও বাস্তবিকই উত্তম। কোন দুর্জন লোক ভাল হওয়ার পরেও যদি আমাদের কাছে আসে ত তাহার অতীত স্মরণ করিয়া তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ভাব আসে না। যতই বলুক, তাহার অতীত পাপ আমরা সহসা ভুলিতে পারি

না। মরিয়া অন্ত রূপে আসিলেই কেবল সংসার তার ঐ পাপ ভোলে।

পূর্ব স্মৃতি হইতে বিকার বৃদ্ধি পায়। পূর্বের এই সকল জ্ঞানই যদি নষ্ট হইয়া যায় ত সব কিছুর শেষ। পাপ-পুণ্য ভুলিয়া যাওয়ার কোন পথ অবশ্যই থাকা চাই। সেই পথ মৃত্যু। এই জন্মের বেদনাই যখন অসহ্য বোধ হয় তখন পূর্ব পূর্ব জন্মের জঞ্জাল খুঁজিতে যাইব কেন? এই জীবনে কি জঞ্জাল কিছু কম আছে? নিজেদের বাল্যকালের কথাই আমরা অনেকটা ভুলিয়া যাই। এই বিস্মৃতি মঙ্গলদায়ক। অতীতের বিস্মৃতিই হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ। ঔরঙ্গজেব অত্যাচার করিয়াছিল সেকথা আর কতকাল রটনা করিতে থাকিব? গুজরাটী ভাষায় রতনবাঈয়ের একটি 'গরবা' গান আছে। এখানে তাহা বার বার শুনিতে পাই। গানের অন্তে বলা হইয়াছে, "সংসারে সকলের কীর্তিই অবশিষ্ট থাকবে। পাপের কথা লোকে ভুলে যাবে।" কাল ছাঁকুনির কাজ করিতেছে। ইতিহাসে যাহা ভাল কাজ তাহা গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহা পাপ তাহা ফেলিয়া দিতে হইবে। মন্দ ছাড়িয়া লোকে যদি কেবল ভাল জিনিসটাই দেখে ত কত ভালই না হয়! কিন্তু তাহা হয় না। তাই বিস্মরণের খুব প্রয়োজন আছে। সেই জন্যই ভগবান মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তাৎপর্য, জগৎ যেরূপে আছে, সেই রূপেই তাহা মঙ্গলময়। এই কাল-স্থলাত্মক জগৎকে এক জায়গায় একত্র করিতে যাইও না। অতি পরিচয়ে আনন্দ নাই। কোন কোন জিনিসের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইতে হয় এবং কিছু জিনিস দূরে রাখিতে হয়। গুরু হইলে নম্রতাপূর্বক দূরে বসি। মা হইলে কোলে গিয়া বসি। যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা দরকার, সেইরূপ করা চাই। ফুল আমরা কাছে আনিয়া রাখি, কিন্তু আগুন হইতে দূরে থাকি। তারকা দূর হইতে সুন্দর। সৃষ্টি সম্বন্ধেও সেই কথা। অতি দূরের ঐ সৃষ্টি অতি নিকটে আনিলে যে অধিক আনন্দদায়ক হইবে তাহা নয়। যে বস্তু যেখানে আছে সেখানেই তাহা থাকিতে দিন। তাহাতেই মাধুর্য। যে বস্তু দূর হইতে রমণীয় মনে হয় তাহা নিকটে আনিলে সুখদায়ক হইবে, একথা বলা যায় না। তাকে দূরে রাখিয়াই তাহার রস আস্বাদন

করিতে হইবে, বেপরোয়া হইয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া অতি পরিচিত হওয়ায় লাভ নাই !

সারাংশ, তিনকাল যে আমাদের সামনে একত্র উপস্থিত নাই তাহা ভালই। তিন কালের জ্ঞান লাভ হইলে আনন্দের কিম্বা কল্যাণের হইত একথা বলা চলে না। অর্জুন প্রেমবশে জিদ ধরিলেন, প্রার্থনা করিলেন, তখন ভগবান তাহা স্বীকার করিলেন। ভগবান আপন সেই বিরাট্ রূপ তাঁহাকে দেখাইলেন। কিন্তু আমার কাছে পরমেশ্বরের ক্ষুদ্র রূপই যথেষ্ট। এই ছোট রূপ ভগবানের টুকরা নয়। আর যদি টুকরাই হয় ত ঐ অখণ্ড বিশাল মূর্তির একখানি পা কিম্বা পায়ের একটি অঙ্গুলিই যদি দেখিতে পাই ত বলিব ধন্য আমি, ধন্য আমাব ভাগ্য। অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই জ্ঞান হইয়াছে। যমুনালালজী যখন ওয়ার্ধায় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হরিজনদের জন্য খুলিয়া দেন তখন আমি দর্শনের জন্য গিয়াছিলাম। পনের বিশ মিনিট সেই রূপ একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। সমাধি হওয়ার মত অবস্থা হইল। ভগবানের সেই মুখ, সেই বক্ষ, সেই বাহু দেখিতে দেখিতে চরণে আসিলাম। আর শেষটায় দৃষ্টি সেখানে স্থির হইয়া গেল, অবশেষে 'মধুর তোমার চরণসেবা' এই ভাব মনে থাকিয়া গেল। ঐ ক্ষুদ্র রূপে যদি মহান্ প্রভুর সমাবেশ করা না যায় তবে তাঁহার চরণ দর্শনই পর্যাপ্ত। অর্জুন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অধিকার ছিল বেশী। তাঁহার সহিত কত প্রেম, আর কত সখ্যভাব ছিল ! আমার কি আছে ? আমার পক্ষে ত চরণই যথেষ্ট। ততটুকুতেই আমার অধিকার।

॥ ৫৮ ॥ সর্বার্থ-সার

পরমেশ্বরের সেই দিব্যরূপের যে বর্ণনা আছে তাহার উপর বুদ্ধি খাটাইতে যাওয়ার ইচ্ছা আমার নাই। ওখানে বুদ্ধি চালনা করিতে যাওয়া পাপ। বিশ্বরূপের বর্ণনার ঐ পবিত্র শ্লোকগুলি যেন আমরা পড়ি আর প্রতিদিন পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করি। বুদ্ধি চালনা করিয়া পরমেশ্বরের ঐ রূপকে টুকরা করার সাধ আমার নাই। তাহা হইবে অঘোর উপাসনা। অঘোরপন্থীরা শ্মশানে গিয়া মৃতদেহ চেরাফাড়া করে—

তন্ত্রোপাসনা করে। এই কাজও সেইরূপই হইবে। ভগবানের ঐ দিব্য রূপ—

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো।
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ॥

এইরূপই সেই বিশাল অনন্তরূপ! সেই সব বর্ণনাত্মক শ্লোক গাহিতে হইবে, গাহিয়া গাহিয়া নিষ্পাপ হইতে হইবে, পবিত্র হইতে হইবে।

পরমেশ্বরের এই সমস্ত বর্ণনার কেবল এক জায়গায়ই বুদ্ধি বিচারে প্রবৃত্ত হয়। ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন, "অর্জুন, এরা সকল মরেই আছে, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও। যা কিছু করার আমিই করব।" এই ধ্বনি মনে গুঞ্জরিত হইতে থাকে। আমাকে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হইতে হইবে, এই ভাব যখন আসে তখন কি করিলে তাঁহার যন্ত্র হওয়া যাইবে, তাঁহার হাতের মুরলী হওয়া যাইবে, কি করিলে তিনি আমাকে ওষ্ঠে তুলিয়া আমার ভিতর হইতে মধুর সুর বাহির করিবেন, আমাকে বাজাইবেন, এই বিচারে বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়। মুরলী হওয়া মানে ফাঁপা হওয়া, শূন্য হওয়া। কিন্তু বিকার-বাসনায় আমি যে পূর্ণ হইয়া আছি! এই অবস্থায় আমার মধ্য হইতে মধুর সুর বাহির হইবে কিরূপে? আমার কণ্ঠ ত বন্ধ কারণ আমি নিরেট। আমার মধ্যে অহংকার ভরা। আমাকে অহংকারশূন্য হইতে হইবে। যখন আমি পূর্ণ মুক্ত, পূর্ণ শূন্য হইব কেবল তখনই ভগবান আমাকে বাজাইবেন। কিন্তু পরমেশ্বরের ওষ্ঠে মুরলী হওয়া বড়ই সাহসের কাজ। আর যদি আমি তাঁর পায়ের জুতা হইতে চাই তাহাও সহজ কাজ নয়। উহা এত মোলায়েম হওয়া চাই যে ভগবানের পায়ে যেন একটুও ব্যথা না লাগে, যেন ফোস্কা না পড়ে। ভগবানের পা ও কাঁটা-কঙ্কর এই দুইয়ের মাঝখানে আমাকে থাকিতে হইবে। আমার নিজেকে ক্ষয় করিতে হইবে। নিরন্তর নিজের চামড়া ক্ষয় করিয়া মোলায়েম হইতে হইবে। অতএব ভগবানের পায়ের জুতা হওয়াও সহজ কাজ নয়। ভগবানের হাতের হাতিয়ার হইতে চাই ত দশ সের ওজনের লোহার বল হইলে চলিবে না। তপস্যার নেহাইয়ে নিজেকে পিটাইয়া তীক্ষ্ণ ধারাল করিতে হইবে। ঈশ্বরের হাতে আমার

জীবনরূপী তরবারি যেন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে। এই বাণী আমার বুদ্ধিতে গুঞ্জরিত হইতে থাকে—ভগবানের হাতের যন্ত্র হইতে হইবে এই ভাবে বিভোর হইয়া যাই।

ইহা কিভাবে করা যায়, অন্তিম শ্লোকে ভগবান সেকথা নিজেই বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে এই শ্লোককে 'সর্বার্থ সার', অর্থাৎ সমস্ত গীতার সার বলিয়াছেন। কী সেই শ্লোক? উহা হইল:—

'মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

—"হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি সকল কর্ম আমাকে সমর্পণ করে, আমাতে পরায়ণ হইয়া থাকে, আমার ভক্ত হয়, আসক্তি ত্যাগ করে এবং প্রাণী-মাত্রের প্রতি দ্বেষ-রহিত হইয়া অবস্থান করে—সে আমাকে পায়।"

জগতে কাহারও সহিত যাহার বৈরভাব নাই, অনাসক্ত থাকিয়া যে জগতের নিরপেক্ষ সেবা করে, এবং সকল কর্ম আমাকে অর্পণ করে, আমার ভক্তিতে ওতঃপ্রোত, ক্ষমাশীল, নিঃসঙ্গ, বৈরাগ্যবান এবং প্রেমময়—এইরূপ ভক্ত ভগবানের হাতের হাতিয়ার হয়। এই শ্লোকের ইহাই মর্মার্থ।

রবিবার, ১. ৫. ১৯৩২

দ্বাদশ অধ্যায়

সগুণ ও নির্গুণ ভক্তি

॥ ৫৭ ॥ অধ্যায় ৬ হইতে ১১ : একাগ্রতা হইতে সমগ্রতা

বন্ধুগণ,

গঙ্গার প্রবাহ সর্বত্র পাবন ও পবিত্র। তবুও হরিদ্বার, কাশী ও প্রয়াগের মত স্থান অধিক পবিত্র। উহারা পবিত্র করিয়াছে সমস্ত জগতকে। ভগবদ্গীতার সম্বন্ধেও সেই কথা। ভগবদ্গীতা আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই পবিত্র। কিন্তু উহার মধ্যে কয়েকটি অধ্যায় এমন যেন তীর্থক্ষেত্র হইয়া আছে। আজ যে অধ্যায়ের আলোচনা করা হইবে তাহা অতি পবিত্র তীর্থস্বরূপ। স্বয়ং ভগবানই এই অধ্যায়কে 'অমৃতধারা' বলিয়াছেন,

"যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।"

অধ্যায়টি ছোট, মাত্র বিশটি শ্লোক; কিন্তু যেন অমৃতের ধারা! অমৃতের মত মধুর, অমৃতের মতই সঞ্জীবনী। এই অধ্যায়ে ভগবান নিজের মুখে ভক্তিরসের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

বস্তুত ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে ভক্তিতত্ত্ব আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত জীবনশাস্ত্রের প্রতিপাদন করা হইয়াছে। স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম, উহার জন্য সহায়ক মানসিক সাধনারূপ বিকর্ম, এই দুই প্রকার সাধনার দ্বারা সম্পূর্ণ কর্মভস্মকারী অন্তিম অকর্মের ভূমিকা—এই সবের বিচার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে করা হইয়াছে। ইহাতেই জীবনশাস্ত্রের আলোচনা সমাপ্ত। এখন ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ভক্তিতত্ত্বেরই বিচার চলিয়াছে—একথা বলা যায়। একাগ্রতা দিয়া শুরু হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে চিত্তের একাগ্রতা কিভাবে লাভ করা যায়। উহার সাধন কি কি, উহার আবশ্যকতাই বা কি? একাদশ অধ্যায়ে সমগ্রতার কথা বলা হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে একাগ্রতা হইতে সমগ্রতা পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ আমরা কিভাবে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।

চিত্তের একাগ্রতা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একাগ্রতা সিদ্ধ হইলে মানুষ যে কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে পারে। চিত্তের একাগ্রতার পরীক্ষা—আমার প্রিয় বিষয় গণিতের অধ্যয়ন দ্বারা হইতে পারে। উহাতে অবশ্যই ফল লাভ হইবে। কিন্তু চিত্তের একাগ্রতার উহা সর্বোত্তম

সাধন নয়। গণিতের অধ্যয়ন দ্বারা একাগ্রতার পূর্ণ পরীক্ষা হয় না। গণিতে বা ঐরূপ অন্য কোন জ্ঞানের ক্ষেত্রে চিত্তের একাগ্রতা হইতে সাফল্য লাভ ত হইবে, কিন্তু ইহা যথার্থ পরীক্ষা নয়। তাই সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে ভগবৎ চরণে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া চাই। অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে আমাদের চিত্ত ভগবানের চরণে যেন সতত একাগ্র থাকে। আমাদের বাণী, কর্ণ, চক্ষু যেন সতত তাঁহার চরণে নিবিষ্ট থাকে—আমরণ সেই চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে ইহাতে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

পড়িলেঁ বলণ ইন্দ্রিয়াঁ সকলাঁ।
ভাব তো নিরালা নাহীঁ দুজা॥

"সকল ইন্দ্রিয় অভ্যস্ত হইয়া গেলে অন্য ভাবনা থাকিবে না।" সকল ইন্দ্রিয়ের ভগবানের ধুনে মজা চাই।

সারা জীবনের চেষ্টায় ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের চরণাভিমুখী করিতে হইবে, যাহাতে পাশে কেহ বিলাপ করুক বা ভজন গান করুক, বাসনার জ্বালই বুনুক কিম্বা বিষয়বিরাগী সাধু-সজ্জনের সমাগমই হোক, সূর্য উঠুক বা অন্ধকারে ঘিরিয়া ফেলুক—যে কোন অবস্থায়ই চিত্ত যেন মরণকালে ভগবানকেই সামনে দেখিতে পায়। সাতত্যের এই শিক্ষা অষ্টম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে একাগ্রতা, সপ্তমে ঈশ্বরাভিমুখী একাগ্রতা অর্থাৎ 'প্রপত্তি', অষ্টমে সাতত্যযোগ, নবমে সমর্পণের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। দশমে ক্রমিকতা দেখানো হইয়াছে। এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া কিভাবে ঈশ্বরের রূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, পিঁপড়া হইতে ব্রহ্মদেব পর্যন্ত ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে কিভাবে ক্রমে ক্রমে একাত্ম করা যায় তাহা বলা হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে সমগ্রতা দেখানো হইয়াছে। বিশ্বরূপ দর্শনকে আমি সমগ্রতাযোগ বলি। বিশ্বরূপ দর্শন মানে সামান্য ধূলিকণাতেও সমগ্র বিশ্ব সমাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এই অনুভূতি। ইহাই বিরাট্ দর্শন। ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিরসকে এইভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

॥ ৬০ ॥ সগুণ উপাসক ও নির্গুণ উপাসক : মায়ের দুই ছেলে

এখন দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিতত্ত্বের সমাপ্তি করিতে হইবে। অর্জুন সমাপ্তি-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। জীবনবিষয়ক সমগ্র শাস্ত্রের বিচার সমাপ্ত হইলে পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন এখানেও তেমনই প্রশ্ন করিলেন। অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, কেউ বা সগুণের ভজনা করে আবার কেউ বা নির্গুণের উপাসনা করে। এই দু'য়ের মধ্যে কে আপনার প্রিয় ?"

ভগবান ইহার কি উত্তর দিবেন ? ইহা যেন কোন মাকে তাঁহার দুই ছেলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করার মত। দুইয়ের মধ্যে একটি ছোট। মা ছাড়া সে কিছু জানে না। মাকে দেখিলেই তাহার আনন্দ। চক্ষের আড়াল হইলেই সে ব্যাকুল হয়। মার কাছ হইতে সে দূরে থাকিতে পারে না। মাকে ছাড়িতেই পারে না। মা নাই ত সংসার তার কাছে শূন্য। এমনই এই ছোট ছেলে। অপরটি বড়। মায়ের প্রতি তাহারও তেমনই টান। কিছুটা বুঝিতে শিখিয়াছে। মার কাছ হইতে সে দূরে থাকিতে পারে। ছয় মাস, এক বছর মাকে না দেখিলেও চলে। সে মার সেবা করে। সকল দায়িত্ব মাথায় লইয়া কাজ করে। কাজকর্মে থাকে তাই মায়ের অদর্শন ব্যথা সহ্য হয়। সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং চারিদিকে তাহার নাম হইতেছে দেখিয়া মা খুশি। এইরূপ হইতেছে দ্বিতীয় পুত্র। এই প্রকার দুইটি ছেলের মাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন ত তিনি কি উত্তর দিবেন ? আপনি তাঁহাকে বলিলেন, "মা, দু'জনের একজন আপনাকে দেওয়া হবে, বলুন কাকে চাই ?" মা কি উত্তর দিবেন ? তিনি কাহাকে রাখিবেন, কাহাকে ছাড়িবেন ? দাঁড়িপাল্লায় কি তিনি উহাদের ওজন করিতে যাইবেন ? মায়ের মন দিয়া দেখুন। তাঁহার স্বাভাবিক উত্তর হইবে—"বিয়োগ যদি সইতেই হয় ত বড় ছেলেরই সইব।" ইহাই বেচারী মা বলিবেন। ছোট ছেলেকে তিনি বুকে করিয়া আছেন, তাহাকে তিনি কাছ ছাড়া করিবেন না। ছোটর প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ দেখা যাইবে এবং বড়টি গেলে তবুও চলিবে এইরূপ কোন উত্তর তিনি দিবেন। কিন্তু অধিক প্রিয় কে এই প্রশ্নের উত্তর ইহাকে বলা যায় না। কিছু একটা বলিতে হয় বলিয়া তাঁহার মুখ হইতে দুই-চারিটি শব্দ বাহির হইবে। কিন্তু ঐ

শব্দ হইতে যদি বিশেষ অর্থ বাহির করিতে যাই ত তাহা ঠিক হইবে না।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে মা যেমন অদ্ভুত অবস্থায় পড়েন ভগবানের মনের অবস্থাও ঠিক তেমনই হইয়াছিল। অর্জুন বলিতেছেন, "ভগবান, তোমার ভক্ত দু' রকমের। এক, তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, সতত তোমাকে স্মরণ করে। তার চক্ষুদ্বয় তোমার দর্শনপিয়াসী, কান তোমার গুণগান শুনিতে উৎসুক, হাত-পা তোমার সেবা-পূজা করার জন্ত উদগ্রীব। এই হচ্ছে এক জন। অপর, স্বাবলম্বী, সতত ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী, সর্বভূতের হিতে রত, সমাজের নিষ্কাম সেবায় দিনরাত এমন নিমগ্ন যে ভগবান তোমাকে স্মরণ করার মত ফুরসত্‌ও যেন তার নেই। এমনি অদ্বৈতময় তোমার দ্বিতীয় ভক্ত। এই দু'য়ের মধ্যে কে তোমার অধিক প্রিয়? আমায় বল।" অর্জুন ভগবানকে এই প্রশ্ন করিলেন। ঐ মা যেমন উত্তর দিয়াছিলেন, ভগবান অবিকল তেমনই উত্তর দিলেন, "ঐ সগুণ ভক্ত আমার প্রিয়। আর ঐ যে দ্বিতীয় সেও আমারই।" ভগবান দ্বিধায় পড়িয়াছিলেন। কিছু একটা উত্তর দিতে হয় তাই দিলেন।

আর প্রকৃতপক্ষে কথাও তাহাই। দুই ভক্তই অক্ষরে অক্ষরে সমান। উভয়ের যোগ্যতা একরূপ। উহাদের মর্যাদার তুলনা করিতে যাওয়া মানে সীমা লঙ্ঘন করা। পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মের সম্বন্ধে অর্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এখানেও ভক্তি সম্বন্ধে তেমনই প্রশ্ন করিলেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, কর্ম ও বিকর্মের সহায়তায় মানুষ অকর্মদশা প্রাপ্ত হয়। ঐ অকর্মাবস্থার প্রকাশ দুই প্রকার—এক, দিনরাত কর্ম করিয়াও লেশমাত্র কর্ম না-করা, আর দুই, চব্বিশ ঘণ্টা কোনও কর্ম না করিয়া যেন দুনিয়া তোলপাড় করিয়া বেড়ানো। এই দুই রূপেই অকর্মদশার প্রকাশ হয়। এই দুইয়ের তুলনা করিবেন? একই গোলকের দুই দিক। তুলনা কিরূপে করা যাইবে? দুই দিকই সমান, দুই দিকই একরূপ। অকর্মাবস্থার আলোচনা করিতে গিয়া ভগবান একটিকে বলিয়াছেন সন্ন্যাস, অপরটিকে বলিয়াছেন যোগ। শব্দ দুই কিন্তু অর্থ একই। সন্ন্যাস ও যোগ এই দুইয়ের মীমাংসা শেষটায় সরলতা ও সুগমতার ভিত্তিতেই করা হইয়াছে।

সগুণ-নির্গুণের প্রশ্নও তেমনি। এক—সগুণ ভক্ত ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা পরমেশ্বরের সেবা করে। দুই—নির্গুণ ভক্ত মন দিয়া বিশ্বের হিতচিন্তা করে। উপরে উপরে দেখা যায় যে প্রথমোক্ত বাহ্য সেবায় রত। কিন্তু ভিতরে তাহার অনুক্ষণ চিন্তন চলিতে থাকে। দ্বিতীয়কে প্রত্যক্ষ কোন সেবা করিতে দেখা যায় না, কিন্তু তাহার অন্তরেও মহাসেবা চলিতে থাকে। এই দুই প্রকার ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? দিনরাত কর্ম করিয়াও যে লেশমাত্র কর্ম করে না সে সগুণ ভক্ত। নির্গুণ উপাসক অন্তরে সকলের হিতের কথা চিন্তা করে। এই দুই ভক্ত ভিতরে ভিতরে একই রূপ। যদিও বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায় তবুও উভয়েই ভগবানের প্রিয়। কিন্তু সগুণ ভক্তি অধিকতর সুলভ। যে উত্তর ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ে দিয়াছেন এখানেও তিনি সেই উত্তরই দিলেন।

॥ ৬১ ॥ সগুণ সুলভ ও সুরক্ষিত

সগুণ-ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কাজ করাইয়া লওয়া যায়। ইন্দ্রিয়সমূহ সহায়ক সাধন, বিঘ্নস্বরূপ কিম্বা দুই-ই হইতে পারে। উহারা মারকও বটে, তারকও বটে—যে যেমন দেখে। মনে কর কাহারও মা মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছে। ছেলে তাঁহাকে দেখিতে যাইবে। পনের মাইল দূরের পথ। রাস্তা মোটর চলার যোগ্য নয়। পায়ে-হাঁটা ভাঙ্গাচুরা পথ। এই অবস্থায় ঐ পথ কি সাধন না বিঘ্ন? কেহ বলিবে, "কি বিশ্রী এই রাস্তাটা মাঝখানে এসে পড়ল! নয় ত কখন গিয়ে পৌঁছতাম মার কাছে।" এইরূপ মানুষের কাছে ঐ রাস্তা শত্রু। কোনরকমে সে চলে। রাস্তাকে সে গালাগালি দেয়। যাহাই হউক মাকে দেখিতে হইলে দ্রুত পদক্ষেপে তাহাকে যাইতেই হইবে। রাস্তাকে শত্রু মনে করিয়া সে যদি পথে বসিয়া যায় ত শত্রু বলিয়া বিবেচিত রাস্তারই জয় হইবে। কেবল দ্রুত চলিয়াই সে এই শত্রুকে হারাইতে পারে। অপর জন বলিবে, "এমন জঙ্গল তবুও চলার মত পথ ত আছে, তাই রক্ষা। কোনমতে মার কাছে পৌঁছে যাব। এ রাস্তা না থাকলে এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যেতাম কি করে?" এইকথা বলিয়া সে ঐ পথকে সহায়ক সাধন মনে করে এবং দ্রুতপদে আগাইয়া চলে। রাস্তার সম্বন্ধে তাহার মনে স্নেহ-ভাব। উহাকে সে মিত্র

মনে করে। রাস্তাকে শত্রু বা মিত্র, বিঘ্ন বা সহায়, যাহাই মনে কর, দ্রুত পা ফেলিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। রাস্তা বিঘ্নরূপ কিম্বা সাধনরূপ তাহা নির্ভর করে মনের অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর। ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও ঐ কথা। ইন্দ্রিয় বিঘ্ন কি সহায়ক তাহাও নির্ভর করিবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

সগুণ উপাসকের কাছে ইন্দ্রিয়সমূহ সাধনস্বরূপ। ইন্দ্রিয়গুলি যেন ফুল। তাহা ভগবানকে নিবেদন করিতে হইবে। চোখে হরির রূপ দেখে, কানে হরিকথা শোনে, জিভে হরিনাম করে, পায়ে তীর্থ ভ্রমণ করে, হাতে সেবাকার্য করে, এভাবে সকল ইন্দ্রিয় সে পরমেশ্বরকে অর্পণ করে। ইন্দ্রিয়-সমূহ তখন আর ভোগের সাধন থাকে না। ফুল ভগবানকে নিবেদন করার জন্য। ফুলের মালা নিজের গলায় পরার জন্য নয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যবহার ঈশ্বরের সেবার জন্য করিতে হইবে। ইহাই সগুণ উপাসকের দৃষ্টি। কিন্তু নির্গুণ উপাসকের কাছে ইন্দ্রিয়সমূহ বিঘ্নস্বরূপ মনে হয়। উহাদের সে বন্ধনে রাখে, সংযমে বাঁধে, খোরাক বন্ধ করিয়া দেয়। উহাদের উপর পাহারা বসায়। সগুণ উপাসকের এইসব করিতে হয় না। সে ইন্দ্রিয়সমূহকে হরিচরণে সমর্পণ করে। দুইটিই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের পথ। দুই-ই ইন্দ্রিয়দমনের উপায়। যেটিকেই আশ্রয় কর, ইন্দ্রিয়কে নিজ বশে রাখিতে হইবে। ধ্যেয় একই। ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়ের মধ্যে ঘোরা ফিরা করিতে দিতে নাই। এক পথ সহজ, অন্য পথ কঠিন।

নির্গুণ উপাসক সর্বভূতহিতে রত থাকে—ইহা সাধারণ কথা নয়। 'সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করিতে হইবে' একথা বলা সহজ, কিন্তু করা অত্যন্ত কঠিন। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ-চিন্তা যাহার চিত্তে, সে তাহা ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না। তাই নির্গুণ উপাসনা কঠিন। সগুণ উপাসনা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে নানাভাবে করা যায়। যেখানে আমাদের জন্ম হইয়াছে সেই ক্ষুদ্র গ্রামের সেবা করা কিম্বা পিতামাতার সেবা করা সগুণ-পূজা। ইহাতে কেবল এইটুকু খেয়াল রাখিতে হইবে যে, তোমার ঐ সেবা যেন বিশ্বহিতের বিরোধী না হয়। যত ছোট আকারেই সেবা কর না কেন, অপরের হিতের বিরোধী না হইলে, তাহা ভক্তির স্তরে উন্নীত হইবে। অন্যথায় সে সেবায় আসক্তি আসিবে। মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, সাধু-সন্ত—সকলকে পরমেশ্বর জ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। ইঁহারা সকলেই

পরমেশ্বরের মূর্তি একথা মনে করিয়া সন্তোষ মানিতে হইবে। এই সগুণ-পূজা সহজ। নির্গুণ পূজা কঠিন। অন্য সব বিষয়ে দুইয়েরই অর্থ এক। সুলভতার দৃষ্টিতে সগুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ—এইমাত্র।

সুলভতা ছাড়া আর এক দিকও আছে। নির্গুণ উপাসনায় ভয় আছে। নির্গুণ জ্ঞানময়। সগুণ প্রেমময়, ভাবনাময়। সগুণে আর্দ্রতা আছে। উহাতে ভক্ত অধিক সুরক্ষিত। নির্গুণে কিছুটা বিপদের ঝুঁকি আছে। এক সময়ে জ্ঞানের উপর আমার অধিক নির্ভরতা ছিল। কিন্তু এখন আমি বুঝিয়াছি যে কেবল জ্ঞান দ্বারা কাজ চলিবে না। মনের স্থূল ময়লা জ্ঞানে পুড়িয়া ছাই হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম ময়লা দূর করার শক্তি জ্ঞানে নাই। স্বাবলম্বন, বিচার, বিবেক, অভ্যাস, বৈরাগ্য—এই সকল সাধনের আশ্রয় লওয়া সত্ত্বেও মনের সূক্ষ্ম ময়লা মুছিয়া ফেলা যাইবে না। ভক্তির জল ছাড়া এই ময়লা ধোয়া যায় না। ভক্তি-জলের এই শক্তি আছে। ইহাকে পরাবলম্বন বলিতে হয় বলুন। কিন্তু 'পর'-এর অর্থ 'অপর' না করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ 'পরমাত্মার' অবলম্বন করুন। পরমাত্মাতে আশ্রয় লওয়া ব্যতীত চিত্তের ময়লা নষ্ট হইবার নয়।

কেহ হয়ত বলিবেন, "জ্ঞান শব্দের অর্থ এখানে সঙ্কুচিত করা হইল। জ্ঞানের দ্বারা চিত্তের ময়লা যদি ধোয়া না যায় ত জ্ঞানের স্থান দ্বিতীয় স্তরের সাব্যস্ত হয়।" এই অপবাদ আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে এই মাটির পুতুলে থাকাকালে শুদ্ধ জ্ঞান হওয়া কঠিন। এই দেহে বাসকালে উৎপন্ন জ্ঞান যতই শুদ্ধরূপ হউক না কেন, তবুও উহাতে কিছুটা অশুদ্ধি, বিকৃতি অথবা অপূর্ণতা থাকিবেই। এই দেহে উৎপন্ন জ্ঞানের শক্তি সীমাবদ্ধ হইবেই। কিন্তু যদি শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় ত সকল ময়লা তাহা ভস্ম করিয়া ফেলিবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। চিত্তের সঙ্গে জড়িত সমস্ত ময়লা ভস্ম করার শক্তি জ্ঞানের আছে। কিন্তু এই বিকারশীল দেহে জ্ঞানের তেজ কম। অতএব তাহা দ্বারা সূক্ষ্ম ময়লা দূর হয় না। ভক্তির আশ্রয় লওয়া ছাড়া সূক্ষ্ম ময়লা দূর করার উপায় নাই। তাই ভক্তিতে মানুষ অধিক সুরক্ষিত। এই 'অধিক' শব্দটি আমি জুড়িয়া দিতেছি। সগুণ ভক্তি সুলভ। ইহাতে ঈশ্বরাবলম্বন আছে। নির্গুণে রহিয়াছে স্বাবলম্বন।

এখানে 'স্ব'-এর অর্থই বা কি? স্বাবলম্বন মানে আপন হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মার অবলম্বন, ইহাই ঐ স্বাবলম্বনের অর্থ। কেবল বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হইয়াছে এরূপ কোন লোক পাওয়া যায় না। স্বাবলম্বন দ্বারা অর্থাৎ অন্তঃকরণস্থিত আত্মজ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ-জ্ঞান লাভ হইবে। সারাংশ, নির্গুণ ভক্তির স্বাবলম্বনের আধারও এই আত্মাই।

॥ ৬২ ॥ নির্গুণের অভাবে সগুণও দোষযুক্ত

আমি যেমন সগুণের পাল্লায় সুলভতা ও সুরক্ষিততারূপ বাটখারা চাপাইয়াছি, নির্গুণের বেলাও তেমনি চাপাইতে পারি। নির্গুণে এক প্রকারের সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণার্থ বলা যায়—আমরা নানা কর্মের জন্য, সেবার জন্য, সংস্থা স্থাপন করি। প্রথমে সংস্থা স্থাপিত হয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। ব্যক্তিই উহার মুখ্য আধার। সেইজন্য সংস্থা প্রথমে ব্যক্তিনিষ্ঠ থাকে। কিন্তু বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহার ব্যক্তিনিষ্ঠা তত্ত্বনিষ্ঠায় উন্নীত হওয়া উচিত। তত্ত্বনিষ্ঠা যদি না আসে তবে প্রেরণা দাতা সংস্থাপকের অবর্তমানের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সংস্থা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আমার প্রিয় উদাহরণ দিতেছি। চরখার মাল ছিঁড়িয়া গেলে সুতা কাটা ত দূরে থাক, সুতা গুটান পর্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। ব্যক্তির অবলম্বন চলিয়া গেলে এইরূপ সংস্থারও ঐ দশা হয়। তখন সংস্থা অনাথ হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি ব্যক্তিনিষ্ঠা হইতে তত্ত্বনিষ্ঠা (আদর্শ নিষ্ঠা) উৎপন্ন হয় তাহা হইলে এইরূপ হয় না।

নির্গুণের সহায়তা সগুণের চাই। কোন না কোন সময়ে ব্যক্তি হইতে, আকার হইতে বাহির হইয়া আসার অভ্যাস করিতেই হইবে। গঙ্গা হিমালয় হইতে, শঙ্করের জটাজুট হইতে বাহির হইয়া হিমালয়ের সেই গুহা-গহ্বর, উপত্যকা-অধিত্যকা ছাড়িয়া, বন-জঙ্গল পার হইয়া সমতলভূমিতে যখন কলকল, ছলছল করিয়া বহিতে লাগিল তখনই না গঙ্গা বিশ্বজনের কাজে লাগিল। সেইরূপ ব্যক্তির আধার নষ্ট হইলেও তত্ত্বরূপী সুদৃঢ় স্তম্ভের অবলম্বনের উপর দাঁড়াইয়া থাকার জন্য সংস্থাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। দালানে খিলান গাঁথার সময় ঠেক্‌না দেওয়া হয়; কিন্তু পরে তাহা সরাইয়া লওয়া হয়। ঠেক্‌না অপসারণের

পরেও যদি গাঁথুনি ঠিক থাকে তবে বুঝা যাইবে যে আধার ঠিক ছিল। প্রেরণার প্রবাহ প্রথমে সগুণ হইতে উৎসারিত হওয়াই ঠিক কিন্তু অন্তিম পরিপূর্ণতা তত্ত্বনিষ্ঠায়, নির্গুণে হওয়া চাই। ভক্তির উদর হইতে জ্ঞানের জন্ম হওয়া চাই। ভক্তিরূপী লতায় জ্ঞানের ফুল ফুটাইতে হইবে।

বুদ্ধদেব একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি তিন প্রকার নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। প্রথমে ব্যক্তিনিষ্ঠা, তাহা হইতে তত্ত্বনিষ্ঠা আর তত্ত্বনিষ্ঠা যদি শীঘ্র না আসে ত অন্ততঃপক্ষে সংঘনিষ্ঠা উৎপন্ন হওয়া চাই। যে শ্রদ্ধা একজন ব্যক্তির প্রতি ছিল তাহা দশ-পনের জনের প্রতি হওয়া চাই। সংঘের প্রতি যদি সামুদায়িক প্রেম না থাকে তবে পরস্পরের মধ্যে খটাখটি, ঝগড়াঝাঁটি দেখা দিবে। ব্যক্তি-শরণতা মিটিয়া সংঘ-শরণতা আসা চাই। আর তাহা হইতে সিদ্ধান্ত-শরণতা (আদর্শ-নিষ্ঠা)য় পৌঁছিতে হইবে। তাই বৌদ্ধধর্মে তিন প্রকার শরণাগতির কথা বলা হইয়াছে।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

প্রথমে ব্যক্তির প্রতি প্রীতি। তারপরে সংঘের প্রতি প্রীতি। কিন্তু এই দুই নিষ্ঠাই অস্থির। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত (আদর্শ) নিষ্ঠা উৎপন্ন হওয়া চাই। তবেই সংস্থা সার্থক হইবে। প্রেরণার স্রোত সগুণ হইতে উৎপন্ন হইলেও নির্গুণসাগরে গিয়া মিলিত হওয়া চাই। নির্গুণের অভাবে সগুণ দোষযুক্ত হইয়া যায়। নির্গুণের সীমাবদ্ধতা সগুণকে সমতুল রাখে। এজন্য সগুণ নির্গুণের কাছে কৃতজ্ঞ।

হিন্দু, খ্রীস্টান, ইসলাম আদি সকল ধর্মে কোন না কোন রূপে মূর্তিপূজা প্রচলিত আছে। যদিও উহাকে গৌণ রূপে স্বীকার করা হইয়াছে তবুও উহা অবশ্যই স্বীকৃত হইয়াছে, আর তাহা মহান্ও বটে। কিন্তু যতক্ষণ মূর্তিপূজা নির্গুণের সীমার মধ্যে থাকে ততক্ষণই তাহা নির্দোষ। এই সীমা লঙ্ঘন করিলেই সগুণ দোষ-যুক্ত হইয়া যায়। নির্গুণের এই সীমা-বন্ধন না থাকায় সকল ধর্মের সগুণ অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্বে যাগ-যজ্ঞে পশুহত্যা হইত। শক্তিদেবীর

কাছে আজও বলি দেওয়া হয়। ইহা মূর্তিপূজার বাড়াবাড়ি। মূর্তিপূজা উহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ভুল পথে চলিয়া গিয়াছে। নির্গুণনিষ্ঠার সীমার মধ্যে থাকিলে এই আশঙ্কা থাকিত না।

॥ ৬৩ ॥ একে অন্যের পূরক : রামচরিত্রের দৃষ্টান্ত

সগুণ সুলভ ও সুরক্ষিত। কিন্তু নির্গুণ ছাড়া সগুণের চলে না। সগুণের বিকাশের জন্য তাহাতে নির্গুণের, তত্ত্বনিষ্ঠার মুকুল আসা চাই। নির্গুণ ও সগুণ একে অন্যের পূরক, বিরোধী নয়। সগুণের গন্তব্য নির্গুণে সমাপ্ত হওয়া চাই। আর নির্গুণেরও চিত্তের সূক্ষ্ম ময়লা ধোয়ার জন্য সগুণের আর্দ্রতা আবশ্যক। একটি আর একটির দ্বারা সুশোভিত।

এই দুই প্রকারের ভক্তি রামায়ণে অতি সুন্দররূপে দেখানো হইয়াছে। অযোধ্যা-কাণ্ডে ইহাদের সুন্দর রূপ দেখা যায়। এই দুই ভক্তির বিশদ আলোচনা রামায়ণে আছে। ভরতের ভক্তি প্রথম প্রকারের আর লক্ষ্মণের ভক্তি দ্বিতীয় প্রকারের। এই দুই উদাহরণ হইতে সগুণ-ভক্তি ও নির্গুণ-ভক্তির স্বরূপ বুঝা যাইবে।

বনবাসে যাওয়ার সময় রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইতে চান নাই। সঙ্গে নেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে এরূপ তাঁহার মনে হয় নাই। লক্ষ্মণকে তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মণ, আমি বনে যাচ্ছি ; আমার প্রতি বাবার এইরূপই আদেশ। তুমি বাড়ী থাক। আমার সঙ্গী হয়ে মা-বাবার দুঃখ বাড়িয়ো না। মা-বাবা ও প্রজাদের সেবা কর। তুমি তাঁদের কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব। তুমি আমার প্রতিনিধিরূপে থাক। আমি বনে যাচ্ছি, তার মানে এ নয় যে আমি কোন সংকটে পড়েছি। বরং আমি যাচ্ছি ঋষিদের আশ্রমে।" রামচন্দ্র এইভাবে লক্ষ্মণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ এক শব্দে রামের সব কথা উড়াইয়া দিলেন। এক ঘায়ে দুই টুকরা করিয়া দিলেন। তুলসীদাস উহার চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, "তুমি আমায় উৎকৃষ্ট নিগম-নীতি বললে। এই নীতি অনুসারে আমার বস্তুত চলাও উচিত। কিন্তু এই রাজনীতির বোঝা বহন করা আমার সাধ্যের

বাইরে। তোমার প্রতিনিধি হওয়ার শক্তি আমার নেই। আমি বালক মাত্র।"

"দীন্‌হি মোহি সিখ নীকি গোসাঁঈ।
লাগি অগম অপনী কদরাঈ॥
নরবর ধীর ধরম-ধুর-ধারী।
নিগম-নীতিকে তে অধিকারী॥
মৈঁ সিসু প্রভু-সনেহ-প্রতিপালা।
মন্দর-মেরু কি লেহিঁ মরালা॥

"হংস কি মেরুমন্দরের ভার বইতে পারে? ভ্রাতঃ রামচন্দ্র, আমি তোমার স্নেহে প্রতিপালিত হয়ে এসেছি। তোমার এই রাজনীতি অন্যকে শিখাইও। আমি তো বালক মাত্র।" ইহা বলিয়া লক্ষ্মণ রামের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়া দিলেন।

মাছ যেমন জল ছাড়া থাকিতে পারে না লক্ষ্মণের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। রাম হইতে দূরে থাকার শক্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার রোমে-রোমে সহানুভূতি পরিব্যাপ্ত ছিল। রাম ঘুমাইয়া পড়িলেও তিনি জাগিয়া থাকিতেন, সেবা করিতেন। ইহাতেই তাঁহার আনন্দ ছিল। আমাদের চোখে কেহ কাঁকড় ছুঁড়িলে সঙ্গে সঙ্গে হাত চোখে উঠিয়া আসে ও তাহা ঠেকায়। লক্ষ্মণ ছিলেন রামের সেইরূপ হাতের মত। রামের উপর কোন আঘাত আসিলে লক্ষ্মণ আগাইয়া আসিয়া তাহা সামলাইতেন। তুলসীদাস লক্ষ্মণের প্রসঙ্গে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—পতাকা উড়িতেছে, বন্দনা-গান সবই ঐ পতাকার। উহার রং আকার ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ঐ যে দণ্ড সিধা খাড়া হইয়া আছে উহার কথা কে বলে? রামের খ্যাতিরূপ যে পতাকা তাহার দণ্ডস্বরূপ আধার ছিলেন লক্ষ্মণ। একেবারে সোজা খাড়া। পতাকা-দণ্ডের নত হইতে নাই। রামের খ্যাতিরূপ পতাকা-দণ্ড লক্ষ্মণ, তিনি কখনও নত হন নাই। খ্যাতি কাহার? খ্যাতি রামের। জগৎ পতাকাকেই দেখে, দণ্ডের কথা মনে রাখে না। লোকে মন্দিরের কলস দেখে, ভিত্‌ দেখে না। রামের যশ জগতে ছড়াইয়াছে; লক্ষ্মণের কোন পাত্তা নাই। চৌদ্দ বছর এই দণ্ড সোজা খাড়া রহিয়াছে, একটুও অবনমিত হয় নাই। নিজে পিছনে থাকিয়া রামের খ্যাতি সে উচ্চে

তুলিয়া ধরিয়াছে। রাম বড় বড় দুরূহ কার্য লক্ষ্মণকে দিয়া করাইয়াছেন। সীতাকে বনে রাখিয়া আসার কাজও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণের উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। বেচারা লক্ষ্মণ সীতাকে বনে রাখিয়া আসিলেন। তাঁহার যেন স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই ছিল না। তিনি হইয়া গিয়াছিলেন রামের চোখ, রামের হাত-পা, রামের মন। নদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া যায় লক্ষ্মণও তেমনি রামের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিলেন। তিনি রামের ছায়া হইয়া গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণের এই ভক্তি ছিল সগুণ।

ভরত ছিলেন নির্গুণ ভক্তির অনুসরণকারী। তাঁহারও সুন্দর ছবি তুলসীদাস আঁকিয়াছেন। রাম যখন বনে যান তখন ভরত অযোধ্যায় ছিলেন না। ভরত আসিলেন। তার আগেই দশরথের মৃত্যু হইয়াছিল। গুরু বশিষ্ঠ তাঁহাকে রাজকার্য পরিচালনা করিতে বলিলেন। ভরত বলিলেন, "রামচন্দ্রের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে।" রামের সহিত দেখা করার জন্য তিনি মনে মনে ছটফট করিতেছিলেন। কিন্তু সে অবস্থায়ও তিনি রাজকার্যের বিধি-ব্যবস্থা করিতেছিলেন। রাজ্য রামেরই আর উহার ব্যবস্থা করাও রামেরই কাজ করা, ইহাই ছিল তাঁহার ভাবনা। সব সম্পত্তি মালিকের তার ব্যবস্থা করাই আমার কর্তব্য—এইরূপ তিনি মনে করিলেন। লক্ষ্মণের মত ভরত মুক্ত হইতে পারিতেছিলেন না। এই ছিল ভরতের অবস্থা। রামকে ভক্তি করা মানে রামের কাজ করা। নয় ত সে ভক্তি কোন্ কাজে লাগিবে? রাজ্যব্যবস্থার সমস্ত কাজ ঠিক করিয়া ভরত রামের সহিত দেখা করার জন্য বনে গেলেন। "ভাই, এ রাজ্য তোমার। তুমি..." এটুকু বলিতেই রাম তাঁহাকে বলিলেন, "ভরত, তুমিই রাজকার্য চালাও।" ভরত সসঙ্কোচে দণ্ডায়মান। বলিলেন, "তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য।" রামের কথা মান্য। ভরত সব কিছু রামে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তিনি ফিরিয়া গেলেন এবং রাজকাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু মজা দেখুন—অযোধ্যা হইতে দুই মাইল দূরে ভরত তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্বী থাকিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে রাম যখন ভরতের সহিত মিলিত হইলেন, তখন চেনা কঠিন হইল কে আসল বনবাসী তপস্বী—রাম না ভরত। দুজনের চেহারা এক, বয়সের ব্যবধান সামান্য। চোখে-মুখে সেই তপস্যার ছাপ। দুজনের কাহাকেও দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল

না—কে রাম আর কে ভরত। এইরূপ চিত্র যদি কোন শিল্পী আঁকিতেন তাহা কতই না পবিত্র দৃশ্য হইত! ভরত দেহে রামের কাছ হইতে দূরে ছিলেন বটে কিন্তু মনে মনে রামের নিকটে হইতে ক্ষণেকের জন্যও দূরে ছিলেন না। যদিও তিনি যথারীতি রাজকার্য করিয়া যাইতেছিলেন তথাপি মনে মনে রামের সান্নিধ্যেই ছিলেন। নির্গুণে সগুণ-ভক্তি পরিপূর্ণ ভরা ছিল। অতএব সেখানে মুখ হইতে বিয়োগের ভাষা আসিবে কিরূপে? তাই ভরতের মধ্যে রামের বিয়োগ-বোধ ছিল না। তিনি আপন প্রভুর কাজ করিয়া যাইতেছিলেন।

আজকালকার যুবকদের বলিতে শোনা যায়, "রামনাম, রামভক্তি, রাম উপাসনা—এসব আমরা বুঝি না। আমরা ভগবানের কাজ করব।" ভগবানের কাজ কিরূপে করিতে হয় তাহার নমুনা ভরত দেখাইয়া গিয়াছেন। ভগবানের কাজ করিতে করিতে ভরত ভগবানের বিয়োগ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ভগবানের কাজ করিতে করিতে ভগবানের বিয়োগ অনুভব করার সময় পর্যন্ত না পাওয়া এক কথা আর ভগবানের ধার যাহারা ধারে না তাহাদের কথা অন্য। ভগবানের কাজ করিতে করিতে সংযমপূর্ণ জীবন যাপন করা অত্যন্ত দুর্লভ। যদিও ভরতের নির্গুণ রূপেই কাজ করার বৃত্তি ছিল, তথাপি সেখানে সগুণের আধার ভাঙ্গিয়া যায় নাই। "প্রভু রাম, তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য। তোমার কোন কথায় আমার সংশয় নাই।"—ইহা বলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াও ভরত পিছনে ফিরিলেন এবং রামকে বলিলেন, "প্রভু, সমাধান ত হল না, কোথায় যেন একটু ত্রুটি রয়ে গেছে।" রাম বুঝিলেন ও বলিলেন, "এই পাদুকা নিয়ে যাও।" শেষ পর্যন্ত সগুণের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলই। নির্গুণকে সগুণ শেষ পর্যন্ত আর্দ্র করিয়া দিল। ঐ পাদুকাতে লক্ষ্মণের সমাধান হইত না। তাঁহার দৃষ্টিতে উহা হইত দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটানোর মত। ভরতের ভূমিকা ইহা হইতে অন্যরূপ ছিল। বাহ্যত তিনি দূরে থাকিয়া কার্য করিতেছিলেন কিন্তু মনে মনে ছিলেন রামময়। রামের কাজ করাকেই ভরত রামভক্তি মনে করিতেন। কিন্তু তবুও তিনি পাদুকার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। ঐ পাদুকা না হইলে তিনি রাজকার্য চালাইতে পারিতেন না। ঐ পাদুকার আজ্ঞা শিরোধার্য জ্ঞানে তিনি কর্তব্য করিয়া

যাইতেছিলেন। লক্ষ্মণ যেমন রামের ভক্ত ছিলেন, ভরতও তেমনই রামের ভক্ত ছিলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে দুজনের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ভরত কর্তব্যনিষ্ঠও ছিলেন, তত্ত্বনিষ্ঠও ছিলেন। তবুও তাঁহার তত্ত্বনিষ্ঠার পক্ষে পাদুকার আর্দ্রতার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল।

॥ ৬৪ ॥ একে অন্যের পূরক : কৃষ্ণচরিত্রের দৃষ্টান্ত

হরিভক্তিরূপ আর্দ্রতা অবশ্য থাকা চাই। তাই ত ভগবান অর্জুনকে বার বার বলিতেছেন, **ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ**—"অর্জুন আমাতে আসক্ত থাক, আমার আসক্তির আশ্রয় লও এবং কাজ করিতে থাক।" যে আসক্তি শব্দে ভগবদ্গীতার অনাদর, অরুচি, যে ভগবদ্গীতা পুনঃ পুনঃ বলে—অনাসক্ত থাকিয়া কর্ম কর, রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া কর্ম কর, নিরপেক্ষ থাকিয়া কর্ম কর; অনাসক্তি ও নিঃসঙ্গতা যে ভগবদ্গীতার ধ্রুপদ বা ধুয়া, সেই ভগবদ্গীতাই বলে—"অর্জুন আমাতে আসক্তি রাখ।" কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ভগবানে আসক্তি রাখা অতীব উচ্চ বস্তু। তাহা কোন পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তির মত আদৌ নয়। সগুণ ও নির্গুণ একে অন্যেতে গাঁথা। সগুণ নির্গুণের আশ্রয় পুরাপুরি ছিন্ন করিতে পারে না, আর নির্গুণের চাই সগুণের আর্দ্রতা। নিরন্তর কর্তব্য কর্ম যে করে, কর্মরূপে সে পূজাই করে। কিন্তু পূজাতে আর্দ্রতা থাকা চাই। **মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ**—"আমাকে স্মরণে রাখিয়া কর্ম কর।" কর্ম নিজেই পূজা, কিন্তু অন্তরে ভাবনা জাগ্রত থাকা চাই। কেবল ফুল ছিটাইলেই পূজা হয় না। উহাতে ভাবনা থাকা চাই। পুষ্পাঞ্জলি পূজার এক প্রকার। সৎ কর্মের দ্বারা অর্চনা করা পূজার আর এক প্রকার। কিন্তু উভয় স্থলেই ভাবের আর্দ্রতা থাকা চাই। ভাবনাহীন পুষ্পার্পণ পাথরের উপর ফুল ছিটানরই সামিল। অতএব আসল কথা হইল ভাবনা। সগুণ ও নির্গুণ, কর্ম ও প্রীতি, জ্ঞান ও ভক্তি—এ সবই একরূপ। উভয়ের অন্তিম অনুভবও একই।

উদ্ধব ও অর্জুনের দৃষ্টান্ত দেখুন। রামায়ণ হইতে এক লাফে মহাভারতে আসিয়া পড়িলাম। সে অধিকার আমার আছে। কারণ রাম ও কৃষ্ণ একই রূপ। ভরত ও লক্ষ্মণ যেমন, উদ্ধব ও অর্জুনও তেমনই। যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই উদ্ধব। কৃষ্ণের বিয়োগ উদ্ধবের কাছে মুহূর্তের

জন্যও অসহ্য। সে সর্বদা কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত। কৃষ্ণ বিনা সারা জগৎ তাহার কাছে নীরস ও শুষ্ক। অর্জুনও কৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিলেন। কিন্তু তিনি থাকিতেন দূরে, দিল্লীতে। অর্জুন কৃষ্ণের কাজ করিতেন। কৃষ্ণ থাকিতেন দ্বারকায় আর অর্জুন থাকিতেন হস্তিনাপুরে! এইরূপ ছিল উভয়ের সম্বন্ধ।

কৃষ্ণের দেহত্যাগের সময় হইলে তিনি উদ্ধবকে বলিলেন, "উদ্ধব, এখন আমি চলে যাব।" উদ্ধব বলিলেন, "আমায় সঙ্গে নেবেন না? একসঙ্গেই দু'জনে যাব।" কৃষ্ণ বলিলেন, "তা আমার ইচ্ছা নয়। সূর্য যেমন নিজের তেজ অগ্নিতে রেখে যায়, তেমনি আমার তেজ আমি তোমাতে রেখে যাচ্ছি।" এইরূপে ভগবান শেষ সময়ের ব্যবস্থা করিলেন এবং উদ্ধবকে জ্ঞানদান করিয়া রওনা করাইলেন। অতঃপর যাত্রা পথে উদ্ধব মৈত্রেয় ঋষির কাছে জানিলেন যে ভগবান নিজধামে চলিয়া গিয়াছেন। উদ্ধবের মনে ঐ সংবাদের কোন প্রতিক্রিয়া হইল না। যেন কিছুই হয় নাই।

মরকা গুরু, রড়কা চেলা, দোহীঁচা বোধ বায়াঁ গেলা।

—"গুরু মরলো, চেলা কাঁদলো। দু'য়ের জ্ঞান ব্যর্থ হলো।" উদ্ধবের এইরূপ অবস্থা হইল না। বিয়োগই যেন হয় নাই। সারাজীবন তিনি সগুণ উপাসনা করিয়াছেন, পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে কাটাইয়াছেন। এখন তাঁহার নির্গুণে আনন্দ অনুভব হইতে লাগিল। এইভাবে নির্গুণের রাস্তা তাঁহাকে ধরিতে হইল। প্রথমে সগুণ কিন্তু পরে নির্গুণের ধাপ থাকা চাই। নতুবা পূর্ণতা লাভ হইবে না।

অর্জুনের অবস্থা হইল ইহার উল্টা। কৃষ্ণ তাঁহাকে কি করিতে বলিয়াছিলেন? তাঁহার অবর্তমানে সকল স্ত্রীদের রক্ষার ভার তিনি অর্জুনের উপর সঁপিয়াছিলেন। অর্জুন দিল্লী হইতে আসিলেন আর দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারস্থ স্ত্রীদের লইয়া চলিলেন। রাস্তায় হিসারের কাছে পাঞ্জাবের চোরেরা তাঁহাকে লুটিয়া লইল। যে অর্জুন সে সময় একমাত্র নর বলিয়া কথিত হইতেন, শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন, পরাজয় কি জানিতেন না বলিয়া যিনি 'জয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, সাক্ষাৎ শঙ্করের সহিত যিনি যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নতি স্বীকার করাইয়াছিলেন, সেই অর্জুন আজমীরের নিকটে পালাইতে পালাইতে বাঁচিলেন। কৃষ্ণ

চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মন কৃষ্ণবিয়োগের ব্যথায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাঁহার প্রাণই যেন উড়িয়া গিয়াছিল, পড়িয়াছিল কেবল নিস্ত্রাণ, নিষ্প্রাণ শরীর। সারাংশ, সতত কর্মকারী, কৃষ্ণ হইতে দূরে অবস্থানকারী, নির্গুণ উপাসক অর্জুনের পক্ষে এই বিয়োগ শেষ সময়ে দুঃসহ ও ভারী হইয়া উঠিল। তাঁহার নির্গুণ হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়োগের ভাষা স্ফুরিত হইল তাঁহার সমস্ত কর্মও যেন শেষ হইয়া গেল। তাঁহার নির্গুণের অবশেষে সগুণের অনুভূতি হইল। সারাংশ, সগুণের নির্গুণে যাইতে হয়। নির্গুণের সগুণে আসিতে হয়। এইভাবে একটির দ্বারা অপরটির পরিপূর্ণতা লাভ হয়।

॥ ৬৫ ॥ সগুণ-নির্গুণের একরূপতায় আপন অনুভব

সুতরাং সগুণ উপাসক ও নির্গুণ উপাসক এই দুইয়ের পার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া ভাষার গতি কুণ্ঠিত হইয়া যায়। সগুণ ও নির্গুণ শেষ পর্যন্ত এক হইয়া পড়ে। ভক্তির ধারা যদিও প্রথমে সগুণ হইতেই উৎসারিত হয় তবুও উহা শেষ পর্যন্ত নির্গুণে আসিয়া মিলিত হয়।

পুরানো দিনের কথা। আমি ভাইকম সত্যাগ্রহ দেখিতে গিয়াছিলাম। খেয়াল হইল শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান মালাবারের সন্নিকটে। মনে হইল যে দিকে যাইতেছিলাম তারই কাছাকাছি কোথাও ভগবান শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান 'কালড়ী' গ্রাম হইবে। সঙ্গী মলয়ালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "এখান থেকে দশ-বার মাইল হবে, যাবেন?" বলিলাম, "না।" আমি গিয়াছিলাম সত্যাগ্রহ দেখার জন্য। অতএব পথিমধ্যে আর কোথাও যাওয়া আমার সঙ্গত মনে হইল না। ঐ গ্রাম আর তখন দেখিতে যাই নাই। আজও আমার মনে হয় ঠিক কাজই করিয়াছিলাম। কিন্তু রাত্রিতে যখন শুইলাম তখন ঐ কালড়ী গ্রাম আর শঙ্করাচার্যের সেই মূর্তি আমার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। ঘুম আসিল না। সেই অনুভূতি আজও তেমনই সুস্পষ্ট আছে। শঙ্করাচার্যের জ্ঞানের সেই প্রভা, তাঁহার সেই দিব্য অদ্বৈতনিষ্ঠা, তাঁহার অলৌকিক জলন্ত বৈরাগ্য—যাহা দৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল, তাঁহার সেই উদাত্ত আহ্বান এবং আমার উপর তাঁহার যে অনন্ত উপকার সে সব কথা থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে আসিতে লাগিল।

রাত্রে সেই সব ভাবনা জাগ্রত হইয়া উঠিল। নির্গুণের মধ্যে সগুণ কিভাবে পূর্ণ হইয়া থাকে তাহা আমি অনুভব করিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষ দর্শনেও এত প্রেম জন্মিত না। নির্গুণের মধ্যে সগুণের পরমোৎকর্ষ ভাব ওতঃপ্রোত ভরা থাকে।

আমি কুশল-পত্র বড় একটা লিখি না। কিন্তু কোন বন্ধুকে পত্র না লিখিলেও সতত তাহার কথা মনে হয়। পত্র না লিখিলেও তাহার স্মৃতি মনের মধ্যে ভরা থাকে। এইভাবে নির্গুণে সগুণ লুকাইয়া থাকে। সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই একরূপ! প্রত্যক্ষ মূর্তি আনিয়া পূজা করা, অথবা প্রকট রূপে সেবা করা, এবং অন্তরের মধ্যে সতত জগতের কল্যাণ চিন্তা করিতে থাকা, বাহ্যিক পূজা না থাকিলেও—এই দুইয়েরই মূল্য ও গুরুত্ব সমান।

॥ ৬৬ ॥ সগুণ-নির্গুণ দৃষ্টিভেদমাত্র, শুক্ত-লক্ষ্মণ লাভ হোক

পরিশেষে আমার বক্তব্য, সগুণ কি আর নির্গুণ কি তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা সহজ নহে। এক দৃষ্টিতে যাহা সগুণ অন্য দৃষ্টিতে তাহা নির্গুণ মনে হইতে পারে। সগুণের সাধনা কোন পাথরকে আশ্রয় করিয়া করা হইয়া থাকে। ঐ পাথরে ভগবান কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। মায়েদের মধ্যে, সাধুদের মধ্যে প্রত্যক্ষ চৈতন্যের প্রকাশ দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, হৃদয়বত্তা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পরমাত্মা আছেন একথা মনে করিয়া আমরা পূজা করি না। এই সব চৈতন্যময় লোক প্রত্যক্ষ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সুতরাং তাঁহাদের সেবা করা চাই। তাঁহাদের মধ্যে সগুণ পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া লোকে পাথরের মধ্যে পরমেশ্বর দর্শন করে। একদিক হইতে পাথরের মধ্যে পরমেশ্বর দর্শন নির্গুণের পরাকাষ্ঠা। সাধু-সন্ত, মা-বাবা, প্রতিবেশী—ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, উপকার-বুদ্ধি ব্যক্ত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সহজ। কিন্তু পাথরে ঈশ্বরকল্পনা করা কঠিন। নর্মদার পাথরকে আমরা শিব জ্ঞান করি। ইহা নির্গুণ পূজা নয় ত কি? উল্টা, একথাই মনে হয়, পাথরে পরমেশ্বর কল্পনা করিব না ত করিব কিসে? ঐ পাথরই ত ভগবানের মূর্তি হওয়ার উপযুক্ত। উহা নির্বিকার,

উহা শান্ত। আলো-আঁধারে, শীত-গ্রীষ্মে সব সময়েই ঐ পাথর একরূপ। এইরূপ নির্বিকার পাথরই পরমেশ্বরের প্রতীক হওয়ার যোগ্য। মা-বাবা জনসাধারণ, পাড়াপ্রতিবেশী ইঁহারা সকলেই বিকার-যুক্ত। অর্থাৎ ইঁহাদের মধ্যে কোন না কোন বিকার দেখা যাইবেই। অতএব পাথরের পূজা অপেক্ষা ইঁহাদের পূজা এক অর্থে কঠিন।

তাৎপর্য, সগুণ ও নির্গুণ একে অন্যের পূরক। সগুণ সুলভ, নির্গুণ আয়াস সাধ্য। কিন্তু অন্য দিক দিয়া দেখিলে সগুণই কঠিন আর নির্গুণই সহজ। দুইয়ের দ্বারা একই ধ্যেয় লাভ হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে যে, চব্বিশ ঘণ্টা কর্ম করিয়াও কোন কর্ম করে না, আর চব্বিশ ঘণ্টা কিছু না করিয়াও সব কিছু করে এইরূপ যোগী ও সন্ন্যাসী উভয়েই একরূপ। এখানেও ঠিক তাহাই। সগুণ কর্মদশা ও নির্গুণ সন্ন্যাসযোগ দুইই একরূপ। সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ, কি যোগ শ্রেষ্ঠ? ইহার উত্তর দিতে গিয়া ভগবান যেমন অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, এখানেও তেমনই অসুবিধায় পড়িলেন। অবশেষে সরলতার ও কঠিনতার তারতম্য দেখিয়া উত্তর দিতে হইয়াছে। অন্যথায়, কি যোগ কি সন্ন্যাস, কি সগুণ কি নির্গুণ, দুইই একরূপ।

পরিশেষে, ভগবান বলিতেছেন, "অর্জুন তুমি সগুণ উপাসকই হও আর নির্গুণ উপাসকই হও, ভক্ত তোমাকে হতেই হবে। নিরেট পাথর হয়ে থেকো না।" এই কথা বলার পর ভগবান উপসংহারে ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। অমৃতের স্বাদ মধুর কিন্তু উহা আমরা আস্বাদ করিতে পারি নাই কিন্তু এই সব লক্ষণ প্রত্যক্ষ মধুর। ইহাতে কল্পনার স্থান নাই। এই সব লক্ষণ আমাদের অনুভব করিতে হইবে। দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্ত-লক্ষণও স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের মতই আমাদের নিত্য স্মরণ করা উচিত, নিত্য মনন করা উচিত এবং নিজ নিজ জীবনে আচরণ করিয়া পুষ্টি আহরণ করা উচিত। এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের জীবন পরমেশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে হইবে।

রবিবার, ৮-৫-১৯৩২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আত্মানাত্ম-বিবেক

॥ ৬৭ ॥ কর্মযোগের পক্ষে সহায়ক দেহাত্ম-পৃথক্‌করণ

বন্ধুগণ,

ব্যাসদেব নিজ জীবনের সার ভগবদ্গীতায় ঢালিয়া দিয়াছেন। আরও অনেক কিছু তিনি বিস্তারপূর্বক লিখিয়াছেন। কেবল মহাভারতের মধ্যেই লাখ সওয়া-লাখ শ্লোক হইবে। সংস্কৃতে 'ব্যাস' শব্দের মূলগত অর্থই হইল বিস্তার। কিন্তু ভগবদ্গীতায় তাঁহার বিস্তার করার বৃত্তি ছিল না। জ্যামিতিতে ইউক্লিড্ যেমন তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত দেখাইয়াছেন, গীতায়ও ব্যাসদেব তেমনই জীবনের উপযোগী তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্গীতায় বিশেষ কোন চর্চাও নাই, বিস্তারও নাই। ইহার মুখ্য কারণ এই যে, গীতায় যে কথা বলা হইয়াছে তাহা যে-কোন মানুষ নিজের জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। আর প্রত্যেকেই আচরণকালে উহা পরীক্ষা করুক এই উদ্দেশ্যেই ইহা বলা হইয়াছে। জীবনের যাহা আবশ্যক বস্তু তাহার কথাই গীতায় বলা হইয়াছে। ততটাই মাত্র তাঁহার বলার উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য সংক্ষেপে তত্ত্বকথা বলিয়া তিনি সন্তোষ মানিয়াছেন। তাঁহার এই সন্তোষবৃত্তিতে সত্য ও আত্মানুভবের উপর তাঁহার মহান্ বিশ্বাসই আমরা দেখিতে পাই। যে কথা সত্য তাহার সমর্থনে অনেক বেশী যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে হয় না।

আমরা যে গীতার কথা আলোচনা করিতেছি তাহার মুখ্য কারণ এই যে জীবনে যখনই আমাদের কোন সহায়তার প্রয়োজন বোধ হইবে তখনই যেন গীতা হইতে তাহা আমরা পাইতে পারি। আর তাহা আমরা সর্বদা পাইয়াও থাকি। গীতা জীবনোপযোগী শাস্ত্র। আর সেইজন্যই গীতায় স্বধর্মের উপর এতটা জোর দেওয়া হইয়াছে। মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ পায়া হইল স্বধর্মাচরণ। সেইজন্য জীবনসৌধ এই স্বধর্মাচরণের ভিত্তির উপরই দাঁড় করিতে হইবে। এই পায়া যত মজবুত হইবে জীবনের ইমারতও তত দৃঢ় হইবে। এই স্বধর্মাচরণকেই গীতা 'কর্ম' বলিয়াছে। স্বধর্মাচরণরূপ কর্মের আশেপাশে গীতায় নানা কথা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাকে

রক্ষা করার জন্য অনেক রকমের বিকর্ম রচনা হইয়াছে। স্বধর্মাচরণকে সুসজ্জিত করার জন্য, সুন্দর করার জন্য এবং সফল করার জন্য যে সব আধার ও সহায়তা দরকার সে সব সহায়তা, সে সব অবলম্বন এই স্বধর্মাচরণরূপ কর্মকে দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং এ পর্যন্ত এইরূপ বহু জিনিস আমরা দেখিয়াছি। উহাদের বেশীর ভাগই ছিল ভক্তির রূপে। আজ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে বিষয় আমরা আলোচনা করিব তাহা স্বধর্মাচরণের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। বিষয়টি বিচারমুখী।

স্বধর্মাচরণকারীকে ফলত্যাগ করিতে হইবে, এই মুখ্য কথা গীতার সর্বত্র বলা হইয়াছে। কর্ম ত করিবে, কিন্তু তাহার ফল ছাড়িতে হইবে। গাছে জল দিবে, যত্ন করিবে কিন্তু নিজের জন্য তাহার ছায়ার, ফুলফলের প্রত্যাশা রাখিবে না। ইহাই স্বধর্মাচরণরূপ কর্মযোগের স্বরূপ। কেবল কর্ম করিতে থাকিলেই কর্মযোগ হইল, তাহা নয়। কর্ম ত সৃষ্টির সর্বত্র চলিতেছেই। তাহা বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম কেবল কর্ম মাত্র নয়। উত্তমরূপে কার্য করিয়া তার ফল ত্যাগ করিবে একথা বলা সহজ, শুনা সহজ কিন্তু আচরণ করা কঠিন। কারণ কর্মের প্রেরক শক্তি-মূলতঃ ফলবাসনা। ইহাই সর্বত্র মান্য। ফলবাসনা ছাড়িয়া কর্ম করা উল্টা পথ। ব্যবহারিক এবং সাংসারিক রীতির উহা বিপরীত। কোন ব্যক্তি বহুরকম কর্ম করিলে আমরা বলি তাহার জীবন কর্মযোগময়। কিন্তু এ কথায় ভাষার দীনতাই প্রকাশ পায়। গীতার ব্যাখ্যা অনুসারে উহা কর্মযোগ নয়। লক্ষ লক্ষ কর্মকারীর মধ্যে—গতানুগতিক কর্মকারীর ত কথাই উঠে না, লক্ষ লক্ষ স্বধর্মাচরণকারীর মধ্যে, গীতার কর্মযোগী খুব সামান্যই পাওয়া যায়। কর্মযোগকে সূক্ষ্ম ও সঠিক অর্থে ধরিলে পূর্ণ কর্মযোগী পাওয়া দুরূহ। কর্ম করা এবং তার ফল ত্যাগ করা ব্যাপারটি বাস্তবিকই অসাধারণ। এ পর্যন্ত গীতায় এই বিশ্লেষণ বা পৃথক্‌করণ করা হইয়াছে।

এই বিশ্লেষণ বা পৃথক্‌করণেরই মত আর এক প্রয়োজীয় পৃথক্‌করণের কথা এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কর্ম কর, ফলের আসক্তি ছাড় —এই পৃথক্‌করণের উপযোগী অনুরূপ আর এক মহান্ পৃথক্‌করণ হইতেছে

'দেহ ও আত্মা'র পৃথক্‌করণ। ইহাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা চোখে রূপ দেখি। সে রূপকে আমরা মূর্তি, আকার, বা দেহ বলি। বাহ্য মূর্তির পরিচয় চোখের দ্বারা হইলেও বস্তুর অভ্যন্তরে আমাদের প্রবেশ করিতে হয়। ফলের খোসা ছাড়াইয়া ভিতরের শাঁস খাইতে হয়। নারিকেলের কথা ধরেন ত তাহা ভাঙ্গিয়া ভিতরে কি আছে দেখিতে হয়। কাঁঠাল বাহিরে কাঁটায় ভরা, তাহা হইলে কি হয়, ভিতরে তাহার মধুর রসাল কোয়া। কি নিজের সম্বন্ধে কি অন্যের, ভিতর-বাহিরের এই পৃথক্‌করণ আবশ্যক। খোসা ছাড়ানো চাই, একথার অর্থ কি? অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর বাহ্যরূপ ও ভিতরের শাঁস পৃথক করিয়া দেখা চাই। বাহিরে দেহ আর ভিতরে আত্মা—সব বস্তুরই এই প্রকার দ্বিবিধ রূপ। কর্মেরও তাহাই। বাহ্য ফল কর্মের দেহ এবং কর্মের ফলে যে আত্মশুদ্ধি হয় তাহা ঐ কর্মের আত্মা। স্বধর্মাচরণের বাহ্য ফলরূপ এই যে দেহ তাহা ত্যাগ করিতে হইবে আর চিত্তশুদ্ধিরূপ ভিতরে যে সারভূত আত্মা তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। এইভাবে সব কিছু দেখার অভ্যাস করিতে হইবে। দেহ-ভাবনা দূর করিয়া প্রত্যেক বস্তুর সার গ্রহণ করার দৃষ্টি আমাদের লাভ করিতে হইবে। চোখ, মন ও চিন্তাধারাকে এই শিক্ষায় ও এই অভ্যাসে আমাদের অভ্যস্ত করিতে হইবে। সর্বক্ষেত্রে দেহকে পৃথক করিয়া আত্মার আরাধনা করা চাই। এই পৃথক্‌করণের কথাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

॥ ৬৮ ॥ সংশোধনের মূলাধার

সারগ্রাহী দৃষ্টি রাখার কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাল্যকাল হইতে যদি ইহা অভ্যাস করি ত কতই না ভাল হয়! বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার মত, এই দৃষ্টি আত্মসাৎ করার যোগ্য। অনেকে মনে করেন, জীবনের সহিত অধ্যাত্ম-বিদ্যার কোন সম্পর্ক নাই। আর যদি থাকেও তা না থাকাই ভাল। দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক মনে করার শিক্ষা যদি বাল্যকাল হইতে দেওয়া হয় ত কতই না আনন্দের হয়! ইহা শিক্ষার বিষয়। আজকাল কুশিক্ষার

ফলে অত্যন্ত মন্দ সংস্কার শিশুদের জন্মিতেছে। 'আমি কেবল দেহরূপ' —এই শিক্ষাই আমরা পাইতেছি। কেবল দেহের কথা, দেহেরই বড়াই চলিতেছে। কিন্তু দেহের যে স্বরূপ হওয়া উচিত, যে স্বরূপ পাওয়া উচিত, তাহা ত কোথাও দেখা যায় না। এমনই ব্যর্থ পূজা এই দেহের চলিতেছে। আত্মার মাধুর্যের দিকে নজর নাই। বর্তমান শিক্ষার ইহা ফল। দিনরাত দেহপূজার শিক্ষা চলিতেছে।

একেবারে বাল্যকাল হইতে দেহ-দেবতার পূজা-অর্চনার শিক্ষা শুরু হয়। পায়ে কোথাও একটু চোট লাগিয়াছে, মাটি লাগাইলেই চুকিয়া যায়। শিশুর ইহাতেই হইয়া যায়। এমন কি, মাটি লাগানোর প্রয়োজনও হয় না। একটু আঁচড়াইয়া গিয়াছে ত সে দিকে তার লক্ষ্যই নাই। কিন্তু অভিভাবকের, প্রতিপালকের এতটুকুতে চলে না।[১] শিশুকে সে কাছে ডাকে আর বলে, "দেখি, কোথায় লেগেছে? বড্ড লেগেছে, না? রক্ত বের হয়েছে?" এ ত সবে শুরু। বাচ্চা কাঁদে না ত তাকে না কাঁদাইয়া ছাড়ে না। যে কাঁদিবে না তাকে কাঁদানো, এই লক্ষণকে কি বলা যাইবে? 'লাফিও না, খেলতে যেও না। লাগবে, আঁচড়ে যাবে।' কেবল দেহের উপর নজরদানকারী এমনই একাঙ্গী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

শিশুদের প্রশংসার ব্যাপারেও তাহাই। দৃষ্টি কেবল দেহের দিকে। নিন্দা করিবে, তাহাও দেহকে উপলক্ষ করিয়া। বলে, "কেমন নোংরা!" কত বড় আঘাত যে শিশুর লাগে! কিরূপ মিথ্যা আরোপ। নোংরা আছে সত্যি, তাহা পরিষ্কার করিতে হইবে একথাও সত্যি, কিন্তু সহজ ভাবে তাহা পরিষ্কার না করিয়া শিশুকে আঘাত করা হয়। শিশুর পক্ষে উহা সহ্য করা কঠিন। সে অত্যন্ত ব্যথা পায়। তাহার অন্তরাত্মা পরিচ্ছন্নতায়, নির্মলতায় ভরা। তথাপি বেচারার উপর নোংরা হওয়ার বৃথা অভিযোগ! বস্তুত ঐ শিশু নোংরা নয়। অত্যন্ত সুন্দর, মধুর, পবিত্র, প্রিয় যে পরমাত্মা, সে তাহাই। তাঁহার অংশ উহাতে বিদ্যমান। কিন্তু উহাকে বলা হয় 'নোংরা'। ঐ নোংরামির সহিত শিশুর সম্বন্ধ কি? শিশুর সে বোধই নাই। ঐ আঘাত সে সহিতে পারে না। তাহার

চিত্তে ক্ষোভ জন্মে। আর ক্ষোভ জন্মিলে সংশোধনের পথ বন্ধ হইয়া যায়। উহাকে ঠিকমত বুঝাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

আমরা করি ঠিক তার উল্টাটি ; সে দেহ মাত্র—এই ভাব শিশুর মনে আমরা দৃঢ় করিয়া দিই। দেহ হইতে আত্মা পৃথক এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শিক্ষা-শাস্ত্রের গ্রহণ করা উচিত। যাহাকে আমি পড়াইতেছি সে সর্বগুণসম্পন্ন এই ভাব গুরুর মনে থাকা চাই। উত্তর ভুল হইল ত মারিল গালে এক থাপ্পড়। থাপ্পড় মারার সহিত উত্তর ভুল করার কোন সম্বন্ধ আছে কি? স্কুলে দেরীতে আসিল ত অমনি লাগাইল এক চড়। চপেটাঘাতের ফলে তাহার গালে রক্তের প্রবাহ জোরে বহিবে বটে, কিন্তু তার জন্য কি সে স্কুলে শীঘ্র আসিবে? রক্তের ঐ দ্রুত সঞ্চালন কি বলিয়া দিবে এখন কয়টা বাজিয়াছে? বস্তুত এইরূপ মারধর করিয়া আমরা ঐ শিশুর পশুবৃত্তি আরও বাড়াইয়া দিতে থাকি। 'তুমি তোমার দেহ' এই ভাব দৃঢ় করিয়া দিতে থাকি। তাহার জীবন ভয়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। বাস্তবিক সংশোধন যদি করিতে হয় ত তাহা এইরূপ জবরদস্তি দ্বারা, দেহাসক্তি বাড়াইয়া কখনও হইতে পারে না। দেহ হইতে আমরা পৃথক—একথা যখন বুঝিব তখনই কেবল আমাদের সংশোধন হইবে।

দেহে বা মনে যে দোষ আছে তাহার জ্ঞান হওয়া খারাপ নয়। দোষ দূর করার পক্ষে তাহা সহায়ক। কিন্তু আমি যে দেহ নই ইহা সুস্পষ্ট বুঝা চাই। 'আমি' যাহা তাহা এই দেহ হইতে একেবারে পৃথক, অত্যন্ত সুন্দর সমুজ্জ্বল, পবিত্র ত্রুটিরহিত। স্ব-দোষ সংশোধনের নিমিত্ত যে আত্মপরীক্ষা করে, স্ব হইতে দেহকে পৃথক করিয়াই তাহাকে সেই পরীক্ষা করিতে হয়। কেহ দোষ দেখাইয়া দেয় ত তাহার উপর রাগ হয় না। রাগ না করিয়া সে দেখে এই শরীররূপ, এই মনোরূপ যন্ত্রে কোথায় দোষ আছে এবং তাহা সে দূর করে। উল্টা, দেহকে যে স্ব হইতে পৃথক দেখে না সে সংশোধন করিতেই পারে না। এই দেহ, এই পিণ্ড, এই মাটির পুতুলই আমি এইরূপ যে মনে করে সে আত্মসংশোধন করিবে কিরূপে? এই যে দেহ পাইয়াছি তাহা সাধন মাত্র এই বোধ জন্মিলে সংশোধনের পথ খুলিবে। কেহ চরখার ত্রুটি দেখাইলে কি আমাদের

রাগ হয় ? বরং ত্রুটি দেখিলে তাহা দূর করি। দেহের ব্যাপারেও তাহাই। ইহা যেন চাষের যন্ত্র, ভগবানের জমি চাষ করার হাতিয়ার। এই যন্ত্র যদি খারাপ হয় ত নিশ্চয়ই তাহা মেরামত করিতে হইবে। এই দেহ সাধনরূপে বিদ্যমান। দেহ হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া দোষ-মুক্ত হওয়ার প্রযত্ন করিতে হইবে। এই দেহরূপ সাধন হইতে আমি স্বতন্ত্র। আমি স্বামী, আমি মালিক ; এই দেহ দ্বারা কাজ করান, উহার কাছ হইতে উৎকৃষ্ট সেবা আদায় করা আমার কাজ। বাল্যকাল হইতেই এই ভাবে দেহ হইতে আলাদা থাকার বৃত্তি অনুশীলন করা চাই।

খেলার দর্শক যেমন খেলার দোষগুণ অধিক দেখিতে পায় তেমনি দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে পৃথক থাকিলেই আমরা উহাদের দোষ-গুণ ঠিক বিচার করিতে পারি। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে, "আমার স্মরণশক্তি এখন কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে। উপায় কিছু বলতে পারেন ?" একথা যখন কেহ বলে তখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে স্মরণশক্তি হইতে সে পৃথক্। "আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে"—বলার অর্থ এই যে লোকটির কোন সাধন, কোন যন্ত্র বিগড়াইয়া গিয়াছে। কেহ ছেলে হারায়, কেহ বই হারায়। কিন্তু কেহ নিজেকে হারাইয়াছে এরূপ ত শুনা যায় না। অন্তিম সময়ে মরণকালে তাহার এই দেহই সব দিক হইতে নষ্ট হয়, অকেজো হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের 'সে' লেশমাত্রও বিকৃত হয় না। সে নির্দোষ থাকে, নীরোগ থাকে—একথা বুঝিয়া লওয়ার মত। আর বুঝিতে পারিলে অনেক কিছু ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

॥ ৬৯ ॥ দেহাসক্তির দ্বারা জীবন অবরুদ্ধ

দেহই আমি এই ভাব সর্বত্র বিস্তৃত হইতেছে। তার ফলে মানুষ কিছু মাত্র বিচার না করিয়া দেহ পুষ্টির জন্য নানাবিধ সাধন প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। উহা দেখিয়া বড় ভয় হয়। দেহ পুরাতন হইয়াছে, জীর্ণ হইয়াছে তবু যে কোন প্রকারে উহাকে টিকাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাই লোকের অনুক্ষণের চিন্তা। কিন্তু এই দেহ, এই খোসা কতদিন আপনি টিকাইয়া রাখিবেন ? মৃত্যু পর্যন্তই না ! যম যখন শিয়রে দাঁড়াইবে, ক্ষণকালও তখন

এই দেহ টিকাইয়া রাখা যাইবে না। মৃত্যুর সম্মুখে সকল অহংকার চূর্ণ হইয়া যায়। তবুও মানুষ এই দেহের জন্য নানা সাধন সামগ্রী জুটাইয়া লয়। দিনরাত দেহের কথা ভাবে। বলা হয় শরীর রক্ষার জন্য মাংস খাওয়া দোষের নয়। মনুষ্য দেহ কি এতই মূল্যবান যে তাহা রক্ষার জন্য মাংস খাইতে হইবে? পশুদেহের মূল্য কি কম? কেন কম? মনুষ্যদেহ কিরূপে মূল্যবান স্থির হইল? কি কারণে? পশু যাহা ইচ্ছা খায়। স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করিতে পারে না। মানুষের আচরণ সেরূপ নহে। মানুষ নিজের আশপাশের সৃষ্টিকে রক্ষা করে। তাই না মানুষ্যদেহের মূল্য। আর তাই উহা মূল্যবান। কিন্তু যে কারণে মনুষ্যদেহ মূল্যবান সাব্যস্ত হইল, মাংস খাইয়া সেই কারণই তুমি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছ। হে মানুষ, তোমার শ্রেষ্ঠত্ব এই জন্য যে তুমি সংযত জীবন যাপন কর, সকল প্রাণীর রক্ষার জন্য চেষ্টা কর, সকলকে সামলাইয়া রাখার বৃত্তি তোমাতে রহিয়াছে। পশু হইতে পৃথক এই যে তোমার বিশেষত্ব ইহার জন্যই মানুষ শ্রেষ্ঠ। ইহার জন্যই মানবদেহকে দুর্লভ বলা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের যাহা ভিত্তি তাহাই যদি সে খুঁড়িতে লাগিয়া যায় ত তার শ্রেষ্ঠত্বের সৌধ টিঁকিতে পারে কি? সাধারণতঃ পশু অন্য পশুর মাংস খায়। মানুষ যদি নির্বিচারে সেই ক্রিয়াই করিতে উদ্যত হয় ত তাহা হইবে নিজ শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি নিজ হাতে খুঁড়িয়া ফেলারই মত। যে ডালে বসিয়া আছি ইহা যেন সেই ডালই কাটিয়া ফেলার মত ব্যাপার।

আজকাল চিকিৎসাশাস্ত্রে নানা অদ্ভুত কাণ্ড হইতেছে। পশুর দেহে শল্য ক্রিয়া করিয়া উহার জীবন্ত শরীরে রোগ-জীবাণু উৎপন্ন করা হয়, আর উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য রাখা হয়। জীবন্ত পশুকে এইরূপ নিদারুণ কষ্ট দিয়া যে জ্ঞান মিলে তাহার ব্যবহার হয় এই তুচ্ছ মানবদেহের রক্ষার জন্য। আর এসব চলে 'ভূত-দয়া'র নামে। পশুর শরীরে জীবাণু সৃষ্টি করিয়া তাহার লসিকা মনুষ্য-দেহে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ নানা প্রকার বীভৎস ব্যাপার চলিতেছে। যে শরীরের জন্য আমরা এত সব কাণ্ড করিতেছি তাহা ক্ষণভঙ্গুর কাঁচেরই মত, মুহূর্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। কোন নিশ্চয়তা নাই। যদিও মানবদেহ রক্ষার জন্যই এই সকল প্রযত্ন

চলিতেছে তবুও শেষটায় কী দেখা যায়? এই ভঙ্গুর দেহকে রক্ষা করার যতই চেষ্টা চলুক না কেন তাহার নাশ হয়ই। এই প্রতীতি হওয়া সত্ত্বেও দেহকে হৃষ্টপুষ্ট করার, ইহার গরিমা বাড়াইবার চেষ্টা নিরন্তর চলিতেছে।

কিরূপ আহারে বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইবে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। কি করিলে মন ভাল হয়, বুদ্ধি নির্মল হয়, তার জন্য কোন্ বস্তুর সাহায্যের দরকার সে দিকে আদৌ নজর নাই। কি করিলে শরীরের ওজন বাড়িবে দৃষ্টি সেইদিকে। কি করিলে পৃথিবীর মাটি উঠিয়া আসিয়া শরীরে লাগিয়া শরীর পুষ্ট করিবে, মাটির পিণ্ড কি ভাবে এই শরীর পিণ্ডের শোভা বর্ধন করিবে ইহাই অনুক্ষণের চিন্তা। থপ্ থপ্ করিয়া বসানো গোবরের ঘুঁটে দুই দিন পরে শুকাইয়া পড়িয়া যায়। শরীরে চাপানো এই মেদপিণ্ড, এই চর্বিও তেমনি শেষে খসিয়া পড়ে, গলিয়া যায়, আর শরীর পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অঙ্গে বাহিরের এই মাটির প্রলেপ লাগাইবার, মাটির বোঝা চাপাইবার, যে ওজন দেহ বহিতে অক্ষম সে ওজন বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা কি? এই অনাবশ্যক থল্থলে মেদপিণ্ড বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি? এই দেহ আমাদের এক সাধন। ঐ সাধনকে কাজের উপযোগী রাখার জন্য যাহা দরকার তাহাই আমাদের করিতে হইবে। যন্ত্র হইতে কাজ আদায় করিতে হইবে। যন্ত্রের দেহাভিমান আছে কি? 'যন্ত্রাভিমান' বলিয়া কিছু আছে কি? এই দেহ-যন্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের সেইরূপ দৃষ্টি কেন হইবে না?

সারাংশ, এ দেহ সাধ্য নহে, সাধন। এই ভাব দৃঢ় হইলে মানুষ যে বাড়াবাড়ি করে তাহা করিবে না। জীবন তখন এক বিচিত্র রূপে আমাদের নিকট ধরা দিবে। তখন এই দেহের সাজগোছে আর গৌরব বোধ হইবে না। বস্তুত একখানি সাধারণ কাপড়ই এই দেহের পক্ষে পর্যাপ্ত। কিন্তু তা নয় কাপড় মিহি হওয়া চাই—মোলায়েম হওয়া চাই। তাহাতে জরি-বুটি থাকা চাই। ফুল চাই, নক্সা চাই। উহার জন্য বহু লোককে নানারকম কাজ করিতে হয়। এ সব কিসের জন্য? ভগবানের কি আক্কেল ছিল না? দেহের পক্ষে যদি নক্সা-বুটি আবশ্যক হইত ত বাঘের গায়ে যিনি বিচিত্র নক্সা আঁকিয়া দিয়াছেন, তিনি কি আমাদের অঙ্গে তাহা

আঁকিয়া দিতে পারিতেন না? তাহা কি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল? ভগবান ময়ূরকে সুন্দর পুচ্ছ দিয়াছেন। আমাদেরও দিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে এক রঙই দিয়াছেন। তাহাতে এতটুকু দাগ লাগে ত সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়। মানুষ যেমন আছে তেমন থাকাতেই তাহার সৌন্দর্য। ভগবানের উদ্দেশ্য নয় যে মনুষ্যদেহ সাজানো হউক। সৃষ্টিতে কি সৌন্দর্যের অভাব আছে? মানুষের কাজ হইল তাহা চাহিয়া দেখা। কিন্তু সে রাস্তা ভুলিয়া বসিয়াছে। বলা হয় জার্মেনি আমাদের রঙের সর্বনাশ করিয়াছে। আরে, তোমার মনের রঙ ত আগেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারপর কৃত্রিম রঙের আকর্ষণ জন্মিয়াছে। ফলে, তোমরা পরাবলম্বী হইয়াছ। ব্যর্থ দেহ-শৃঙ্গারের ফেরে পড়িয়া গিয়াছ। মনকে সাজান, বুদ্ধির বিকাশ করা, হৃদয় সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা—এ সব এক পাশে পড়িয়া রহিয়াছে।

॥ ৭০ ॥ তত্ত্বমসি

অতএব ভগবান এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমাদের যেকথা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান—"তুমি দেহ নও, তুমি আত্মা।" **তৎ ত্বমসি**—সেই আত্মরূপ তুমিই—এই উক্তি অতি উচ্চ, অতি পবিত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে এই মহান চিন্তা সমাবিষ্ট হইয়াছে—"বাইরের এই আবরণ, এই খাঁচা, এই খোসা তুমি নও। তুমি হচ্ছ সেই শুদ্ধ অবিনাশী ফল।" যে মুহূর্তে মানুষের মনে 'তুমিই সে' এই ভাবের উদয় হইবে, আমি দেহ নই, আমি সেই পরমাত্মা, এই ভাব জন্মিবে, সেই মুহূর্তেই মনে এক অননুভূত আনন্দের সঞ্চার হইবে। আমার সেই রূপ নাশ করিতে পারে—এরূপ শক্তি এ জগতের কোন বস্তুতে নাই, কোন মানুষের মধ্যেও নাই। এই সূক্ষ্ম বিচার এই মহান্ উক্তিতে নিহিত।

এই দেহের অতীত অবিনাশী নিষ্কলঙ্ক যে আত্মতত্ত্ব আছে আমি তাহাই। ঐ আত্ম-তত্ত্বের জন্যই এ দেহ আমি পাইয়াছি। যখনই সেই ঈশ্বরীয় তত্ত্ব দূষিত হওয়ার উপক্রম হইবে তখনই তাহাকে রক্ষার জন্য আমি এ দেহ ত্যাগ করিব। ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে উজ্জ্বল রাখার জন্য এই দেহ আহুতি দিতে আমি সদা প্রস্তুত থাকিব। এই দেহ আশ্রয় করিয়া আমি

যে আসিয়াছি তাহা কি নিজের দুর্দশা করিবার জন্য? দেহের উপর আমার কর্তৃত্ব চলা চাই। আমি এই দেহ ব্যবহার করিব এবং তাহা দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করিব। "আনন্দে ভরিব তিন লোক।" মহান্ তত্ত্বের জন্য আমি এ দেহ হেলায় ত্যাগ করিব ও ঈশ্বরের জয়গান করিব। ধনী লোকেরা কাপড় ময়লা হইলেই উহা ফেলিয়া দিয়া নূতন কাপড় পরে। আমিও তেমনই করিব। কাজের জন্য এই দেহের প্রয়োজন। যে সময় ইহা কাজের অযোগ্য হইয়া পড়িবে তখনই উহা ফেলিয়া দেওয়ায় আমার কোন আপত্তি হইতে পারে কি?

সত্যাগ্রহের দ্বারা আমাদের এই শিক্ষা লাভ হয়—দেহ ও আত্মা দুই পৃথক বস্তু। মানুষ যেদিন একথা বুঝিবে সেই দিনই তাহার সত্যিকার শিক্ষার, সত্যিকার বিকাশের সূত্রপাত হইবে। সত্যাগ্রহও তখনই সিদ্ধ হইবে। অতএব আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে এই ভাবনা অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। দেহ ত নিমিত্ত মাত্র এক সাধন, পরমেশ্বরের দেওয়া একটি যন্ত্র। উহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যাওয়া মাত্র উহা ফেলিয়া দেওয়া চাই। শীতের গরম কাপড় গ্রীষ্মে আমরা ফেলিয়া দিই। রাতে যে কম্বল গায়ে চাপাই সকালে তাহা সরাইয়া রাখি। সকালের কাপড় দুপুরে ছাড়ি। দেহও তেমনি। যতদিন এই দেহের উপযোগিতা থাকিবে ততদিন উহাকে রাখিব। যেদিন ইহার উপযোগিতা থাকিবে না সেইদিনই এই দেহরূপ বস্ত্র পরিত্যাগ করিব, ফেলিয়া দিব। আত্মার বিকাশের জন্য এই উত্তম পন্থা ভগবান আমাদের শিক্ষা দিতেছেন।

॥ ৭১ ॥ অত্যাচারীর দিন ফুরাইয়াছে

যতদিন এই বোধ না হইবে যে দেহ হইতে আমি পৃথক ততদিন অত্যাচারী আমাদের উপর অত্যাচার করিতেই থাকিবে, আমাদের গোলাম বানাইয়া রাখিবে, নানা দুর্দশায় আমাদের ফেলিবে। ভয় আছে তাই জুলুম চলে। এক রাক্ষস ছিল। কোন এক লোককে ধরিয়া সে হুকুমের দাস বানাইয়াছিল। সারাদিন সে তাহার নিকট হইতে কাজ আদায় করিত। কাজ না করিলে রাক্ষস তাহাকে শাসাইত, "খেয়ে ফেলব, শেষ করে ফেলব।" প্রথম প্রথম লোকটা ভয় পাইত। পরে বাড়াবাড়ি যখন

অসহ্য হইয়া উঠিল তখন সে বলিয়া বসিল, "এই নে, খাবি ত খা।" আসলে রাক্ষস তাহাকে খাইতে চায় নাই। তাহার দরকার ছিল একজন দাসের, গোলামের। খাইয়া ফেলিলে কাজ করিবে কে? সে ত তাহাকে খাইয়া ফেলার কেবল ধমকি দিত। তাই যেই জবাব আসিল, 'খাবি ত খা,' অমনি অত্যাচার বন্ধ হইয়া গেল। অত্যাচারীরা জানে যে, এইসব লোক দেহ-সর্বস্ব। দেহকে কষ্ট দিয়াছ কি ইহারা গোলাম হইয়া থাকিবে। কিন্তু যখনই দেহের এই আসক্তি ছাড়িলে অমনি তুমি সম্রাট হইয়া গেলে, স্বাধীন হইয়া গেলে। সকল শক্তির তুমি আধার হইলে। কোনরূপ প্রভুত্ব আর তোমার উপর চলিবে না। তখন ত জুলুম করার আধারই শেষ হইয়া গিয়াছে। 'আমি দেহ,' এই ভাবনাই সেই আধার। তাহারা মনে করে দৈহিক পীড়া দিলে ইহারা বশে আসিবে। সেইজন্য তাহারা ধমকি দিয়া থাকে।

'আমি এই দেহ,' এই ভাবনার কারণেই আমার উপর জুলুম করার, কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা অপরের হয়। ইংলণ্ডের শহীদ ক্রেনমর বলিয়াছিলেন, "আমায় পোড়াবে? এসো। এই নাও, ডান হাত আগে পোড়াও।" এইভাবে রিডলে ও ল্যাটিমারও বলিয়াছিলেন, "আমাদের পোড়াবে? কে আমাদের পোড়াবে? আমরা ধর্মের এমন জ্যোতি জেলেছি যে কারো সাধ্যি নেই তা নেবায়। দেহরূপ এই মোমবাতি, এই চর্বি জ্বালিয়ে মহৎ তত্ত্বকে সমুজ্জ্বল রাখাই ত আমাদের কাজ। দেহ যাবে। একদিন ত তা নাশ হবেই।"

সক্রেটিসকে বিষ-প্রয়োগে মারার দণ্ডাদেশ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এখন বুড়ো হয়েছি। দু'চারদিন বাদে দেহ যাবে। যে মরবেই তাকে মেরে আপনারা কোন্ পুরুষার্থের কাজ করছেন তা আপনারাই জানেন। ভেবে দেখুন, দেহ একদিন যাবেই। যে বস্তু মরবে তাকে মেরে আপনাদের আর কি কীর্তি বাড়বে?" প্রাণদণ্ডের পূর্ব রাত্রে সক্রেটিস আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে শিষ্যদের বলিতেছিলেন। শরীরে বিষ-প্রয়োগের পর কি কি যাতনা হইবে সে কথা তিনি আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা করিতেছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগও তাঁহার ছিল না। আত্মার অমরতা সম্বন্ধে কথা

শেষ হইলে তাঁহার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন, "মরার পরে আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিভাবে করা হবে?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "আহা বুদ্ধিমান! মারবে তারা, আর গাড়বে তোমরা। যারা মারবে তারা আমার শত্রু, আর কবর দাতা তোমরা আমার মিত্র—একথাই কি তুমি মনে কর? বুদ্ধিমানের মত তারা আমাকে মারবে আর সমঝদারের মত তোমরা আমাকে গাড়বে! কে হে তুমি আমাকে গাড়ার কর্তা? তোমাদের সকলকে কবরে পুঁতে আমি বেঁচে থাকব। আমাকে মারার শক্তি কারুর নেই। কী বুঝাচ্ছিলাম আমি এতক্ষণ? আত্মা অমর। তাকে কে মারবে, কে-ই বা গাড়বে?" আর সত্যসত্যই আজ দুই হাজার, আড়াই হাজার বছর হল ঐ মহান্ সক্রেটিস সকলকে কবর দিয়া এখনও বাঁচিয়া আছেন।

॥ ৭২ ॥ পরমাত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস

সারাংশ, যতদিন দেহের আসক্তি আছে, ভয় আছে, ততদিন যথার্থ রক্ষা পাওয়া যাইবে না। ততদিন সর্বদা ভয় থাকিয়া যাইবে। ঘুমের মধ্যে আঁতকাইয়া উঠি—এই বুঝি সাপে কামড়াইল, চোরে সর্বনাশ করিল। শিয়রে লাঠি লইয়া মানুষ শোয়। কেন? উত্তরে বলে, "কাছে থাকা ভাল, কি জানি চোর-টোর যদি এসে পড়ে?" আচ্ছা লোক বটে! চোর যদি সেই লাঠি দিয়াই তোমার মাথায় মারে? লাঠি আনিতে যদি বা সে ভুল করিয়া থাকে, তার জন্য আগেই তুমি লাঠি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছ। কাহার ভরসায় তুমি ঘুমাও? তুমি ত তখন জগতের হাতে থাক। জাগিয়া থাকিলে তবে না আত্মরক্ষা করিবে! ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার রক্ষাকর্তা কে?

কোন এক শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া আমি ঘুমাই। যে শক্তির উপর ভরসা রাখিয়া বাঘ, গরু ইত্যাদি ঘুমায় সেই শক্তির উপর ভরসা রাখিয়া আমিও ঘুমাই। বাঘেরও নিদ্রা আসে। সর্ব জগতের সহিত যার বৈরভাব এবং ক্ষণে ক্ষণে যে পিছনের দিকে তাকায় এমন যে সিংহ সেও ঘুমায়। সেই শক্তির উপর নির্ভরতা যদি না থাকিত তবে সিংহের কতকগুলি ঘুমাইত আর কতকগুলি জাগিয়া থাকিয়া পাহারা দিত। এই ব্যবস্থা তাহাদের

করিতে হইত। যে শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া নেকড়ে, বাঘ, সিংহ আদি ক্রূর জন্তু ঘুমায় সেই বিশ্বব্যাপী শক্তির কোলে আমিও ঘুমাই। শিশু মার কোলে সুখে ঘুমায়। শিশু যেন তখন দুনিয়ার বাদশাহ। তেমনই আমাদেরও ঐ বিশ্বম্ভর মাতার কোলে অমনই প্রেম, বিশ্বাস ও জ্ঞানপূর্বক ঘুমাইতে শিখিতে হইবে। যে শক্তির আশ্রয়ে আমার সারা জীবন চলিতেছে সেই শক্তির অধিকাধিক পরিচয় আমাকে লাভ করিতে হইবে। উত্তরোত্তর সেই শক্তির উপলব্ধি আমার হওয়া চাই। ঐ শক্তিতে আমার বিশ্বাস যত দৃঢ় হইবে, আমার সংরক্ষণও তত সুনিশ্চিত হইবে। যেমন যেমন আমার ঐ শক্তির অনুভব হইতে থাকিবে তেমন তেমন আমার বিকাশ হইতে থাকিবে। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উহার ক্রমও কিঞ্চিৎ নির্দেশ করা হইয়াছে।

॥ ৭৩ ॥ পরমাত্ম-শক্তির উত্তরোত্তর অনুভব

যতদিন দেহস্থিত আত্মার উপলব্ধি না হয় ততদিন মানুষ সাধারণ ক্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। ক্ষুধা লাগিয়াছে খাইলাম, তৃষ্ণা পাইয়াছে জল পান করিলাম, ঘুম পাইয়াছে ত ঘুমাইলাম, ইহার অধিক সে কিছু জানে না। ইহার জন্য সে লড়িবে। এই সব পাওয়ার তার লোভ হইবে। এই ভাবে দৈহিক ক্রিয়াতেই সে ডুবিয়া থাকে। বিকাশের আরম্ভ হয় ইহার পরে। এই সময় পর্যন্ত আত্মা কেবল দর্শক মাত্র থাকে। শিশু হামাগুড়ি দিয়া কূয়ার দিকে যাইতে থাকে, মা সতর্ক নজরে পিছনে দাঁড়াইয়া থাকেন। সেইরূপ আত্মা আমাদের উপর নজর রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে ধীরভাবে সকল ক্রিয়া লক্ষ্য করে। এই স্থিতিকে 'উপদ্রষ্টা'—সাক্ষীরূপে দর্শনকারী বলা হইয়াছে।

এই অবস্থায় আত্মা দেখিতে থাকে কিন্তু তখনও সম্মতি দেয় না। কিন্তু কেবল দেহজ্ঞানে যে জীব ক্রিয়া করে পরে সে জাগ্রত হয়। আমি পশুর জীবন যাপন করিতেছি এই বোধ তাহার জন্মে। জীব যখন এইরূপ ভাবিতে থাকে তখন তাহার নৈতিক ভূমিকার সূত্রপাত হয়। তখন পদে পদে উচিত অনুচিত প্রশ্ন মনে জাগিতে থাকে। মানুষ বিচারপূর্বক কাজ

করিতে আরম্ভ করে। তাহার মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি জাগ্রত হয়। স্বৈর-ক্রিয়া বন্ধ হয়। স্বেচ্ছাচারের বদলে সংযম আসে।

যখন জীব এই নৈতিক ভূমিকায় পৌঁছে তখন আত্মা আর কেবল নিশ্চেষ্ট দর্শক থাকে না, সে ভিতর হইতে উহা অনুমোদন করে। 'শাবাশ্' এই ধ্বনির আওয়াজ অন্তর হইতে আসে। তখন আত্মা কেবল 'উপদ্রষ্টা' থাকে না, 'অনুমন্তা' হইয়া দাঁড়ায়।

ক্ষুধার্ত অতিথি দ্বারে উপস্থিত, আপনার জন্য পরিবেশিত ভাতের থালা আপনি তাহাকে দিলেন এবং রাত্রে এই সৎ কর্মের কথা যখন মনে হইবে তখন দেখিবেন কত আনন্দ হয়। ভিতর হইতে আত্মার মৃদুস্বর শোনা যাইবে—"বেশ করেছ।" মা যখন শিশুর পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন, "বেশ করেছিস্ বাছা", তখন তার মনে হয় দুনিয়ার সমস্ত বকশিস্ সে পাইয়াছে। সেইরূপ হৃদয়স্থিত পরমাত্মার "শাবাশ বাছা" এই শব্দ আমাদের প্রেরণা দেয়, উৎসাহ দেয়। জীব তখন ভোগময় জীবন ছাড়িয়া নৈতিক জীবনের ভূমিকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

পরবর্তী ভূমিকা এইরূপ—নৈতিক জীবনে মানুষ কর্তব্য কর্ম করিয়া মনের সকল ময়লা ধুইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন সে সেই প্রযত্ন করিতে করিতে হাঁপাইয়া উঠে তখন প্রার্থনা করে, "আমার প্রযত্নের পরাকাষ্ঠা হয়েছে। আমায় আরও শক্তি, আরও বল দাও।" সকল চেষ্টার পরে যতদিন না মানুষ দেখিতে পায় যে, নিজের চেষ্টায় আর কুলাইতেছে না ততদিন প্রার্থনার মর্ম তাহার কাছে ধরা পড়ে না। নিজের সকল শক্তি লাগাইয়া যখন দেখা যায় যে তাহা পর্যাপ্ত নয় তখন আর্ত হইয়া দ্রৌপদীর মত ভগবানকে ডাকা চাই, কৃপা যাচ্ঞা করা চাই। পরমেশ্বরের কৃপা ও সহায়তার স্রোত, সর্বদাই বহিয়া চলিয়াছে। যে কোন তৃষ্ণার্ত লোক আপন অধিকারবলে সে ধারা হইতে জল পান করিতে পারে। কম যাহার পড়ে সে চাহিয়া লয়। তৃতীয় ভূমিকায় এইরূপ সম্বন্ধ দাঁড়ায়। পরমাত্মা আরও অধিক নিকটে আসেন। এখন তিনি কেবল মুখে 'শাবাশ্' না বলিয়া সাহায্য করার জন্য ছুটিয়া আসেন।

প্রথমে ভগবান দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শিক্ষক যেমন ছাত্রকে "প্রশ্নের উত্তর দাও" বলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকেন, তেমনি জীব যতদিন ভোগময় জীবনে লিপ্ত থাকে ততদিন পরমাত্মা দূরে দাঁড়াইয়া থাকেন ও বলেন, "বেশ, চলুক তোমার দৌড়-ঝাঁপ।" তারপরে জীব যখন নৈতিক ভূমিকায় আসে তখন পরমাত্মা কেবল নিরপেক্ষ থাকেন না। জীব সৎকার্য করিতেছে দেখামাত্রই ভগবান আস্তে ঝুঁকিয়া দেখেন আর বলেন, "শাবাশ্"। এই ভাবে সৎকর্ম করিতে করিতে যখন চিত্তের স্থূল ময়লা ধৌত হইয়া সূক্ষ্ম ময়লা ধোয়ার সময় আসে এবং যখন আপ্রাণ চেষ্টাও যথেষ্ট নয় বলিয়া তাহার মনে হয়, তখন সে ভগবানের শরণ লয় এবং 'আসছি' বলিয়া ভগবান তাহার সাহায্যে দৌড়াইয়া আসেন। ভক্তের শক্তির অভাব হইলেই তিনি আসিয়া দাঁড়ান। জগতের সেবক সূর্যনারায়ণ তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। বন্ধ দরজা ভাঙ্গিয়া সূর্য ভিতরে প্রবেশ করে না, কারণ সে সেবক। মালিকের মর্যাদা সে রক্ষা করে। দরজায় ধাক্কা দেয় না। প্রভু ভিতরে শায়িত আছেন সেইজন্য সূর্যরূপী সেবক দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে। দরজা একটু ফাঁক হইলেই নিজের সমস্ত আলো লইয়া সে ঘরে প্রবেশ করে, অন্ধকার দূর করে। পরমাত্মাও ঠিক তেমনই। তাঁহার কাছে সহায়তা চাহিয়াছ ত সঙ্গে সঙ্গে বাহু বিস্তার করিয়া তিনি আসিয়া দাঁড়াইবেন। ভীমা নদীর তীরে (পণ্ঢরপুর) কোমরে হাত রাখিয়া তিনি ত তৈরি হইয়া আছেনই।

উভারূনি বাহে। বিঠো পালবীত আহে॥

"এসেছি বলেন প্রভু, মেলি দুই বাহু।"

তুকারাম আদি এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। নাক খোলা থাকিলে হাওয়া ভিতরে ঢুকিবেই। দরজা একটু ফাঁক করিয়াছ অমনি আলো ভিতরে আসবে। বায়ু ও আলোর দৃষ্টান্ত আমার কাছে পর্যাপ্ত মনে হয় না। এই দুইয়ের অপেক্ষাও পরমাত্মা অধিক ঘনিষ্ঠ, অধিক আগ্রহশীল। তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা না থাকিয়া ভর্তা হন, সর্বপ্রকারে সহায়কারী হন। মনের মলিনতা ধোয়ার জন্য নিরুপায় হইয়া আমরা প্রার্থনা করি 'মারী

নাড় তুমারে হাথে প্রভু সংভালজো রে—"তুমিই আমার একমাত্র সহায়, তোমার শরণ নিচ্ছি।" তখন ঐ করুণাময় কিরূপে দূরে থাকিবেন? ভক্ত-সহায় ভগবান তখন অপূর্ণতা পূর্ণ করার জন্য ছুটিয়া আসেন। তখন তিনি রোহিদাসের চামড়া ধোন, সজন কসাইয়ের মাংস বেচেন, কবীরের চাদর বোনেন, জনাবাঈয়ের সঙ্গে জাঁতা ঘোরান।

ইহার পরের ধাপ হইতেছে পরমেশ্বরের কৃপাপ্রসাদে কর্মের যে ফল লাভ হইয়াছে তাহা নিজে না লইয়া ভগবানকে অর্পণ করিয়া দেওয়া। এই ভূমিকায় জীব ভগবানকে বলে—"তোমার ফল তুমিই ভোগ কর।" নামদেব ধর্ণা দিয়া বসিলেন—ভগবানকে দুধ খাইতেই হইবে। প্রসঙ্গটি কি মধুর! কর্ম-ফলরূপ সমস্ত দুগ্ধ নামদেব ভগবানকে অর্পণ করিতেছেন। এই ভাবে জীবনের সমস্ত পুঁজি সমস্ত উপার্জন যে পরমাত্মার কৃপায় লাভ হইয়াছে তাঁহাকেই সবকিছু অর্পণ করিতে হইবে। ধর্মরাজ স্বর্গে পা বাড়াইতে উদ্যত, অমনি তাঁহার সাথী কুকুরের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। তখন তিনি তাঁহার সারা জীবনের পুণ্যের ফল, স্বর্গলাভ এক মুহূর্তে ত্যাগ করিলেন। ভক্তও তেমনি সমস্ত ফল-লাভ ভগবানকে নিঃশেষে অর্পণ করিয়া থাকে। 'উপদ্রষ্টা,' 'অনুমন্তা' ও 'ভর্তা'রূপে প্রতীয়মান পরমাত্মা এই অবস্থায় 'ভোক্তা' হইয়া যান। জীব তখন এরূপ ভূমিকায় আসিয়া যায় যখন শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া ঐ পরমাত্মাই ভোগাদি উপভোগ করিতে থাকেন।

ইহার পর সঙ্কল্পও ত্যাগ করিতে হয়। কর্মের তিন ধাপ। প্রথমে সঙ্কল্প, পরে কর্ম, তারপর আসে ফল। কর্মের জন্য প্রভুর সহায়তা লইয়া যে ফল পাইয়াছি তাহাও অর্পণ করিলাম। কর্ম করেন ভগবান, ফলও ভোগ করেন তিনি। এখন সেই কর্মের সঙ্কল্পকারীও ভগবানকে হইতে দাও। এইরূপে কর্মের আদিতে মধ্যে ও অন্তে সর্বদাই প্রভুকে রাখ। জ্ঞানদেব বলিয়াছেন :

মালিয়েঁ জেউতেঁ নেলেঁ। তেউতেঁ নিবাঁত চি গেলেঁ।
তয়া পাণিয়া ঐসেঁ কেলেঁ। হোআবেঁ গা॥

"মালী যেদিকে নিয়ে যায় জল নীরবে সেদিকে যায়—এইরূপ জলের মত হও। মালীর আপন কাম্য ফুল ও ফলের গাছে তাহা সিঞ্চিত হয়। সেইরূপ

আমার দ্বারা যাহা হইবার তাহা তাঁহাকেই নির্ণয় করিতে দাও। আমার মনের সকল সঙ্কল্পের দায়িত্বও তাঁহার উপর সঁপিয়া দাও। ঘোড়ার উপরই যদি আমার সমস্ত বোঝা চাপাইলাম ত নিজের মাথায় বোঝা লইয়া ঘোড়ায় চড়িতে যাই কেন? তাহাও ঘোড়ার পিঠেই কেন না চাপাইব? নিজের মাথায় বোঝা লইয়া যদি আমরা ঘোড়ার উপর বসি ত সে ভারও ঘোড়ার উপরই ত পড়ে। তবে সব বোঝা উহারই পিঠে চাপাইব না কেন? এইভাবে জীবনের যত কিছু দৌড়-ঝাঁপ, ওঠা-বসা, ফুল-ফল সবই শেষ পর্যন্ত পরমাত্মা হইয়া যায়। তিনি আমাদের জীবনের 'মহেশ্বর' হইয়া উঠেন। এইভাবে বিকাশ হইতে হইতে সমস্ত জীবনই পরমেশ্বরময় হইয়া যায়। কেবল দেহের এই পর্দাই অবশিষ্ট থাকে। তাহা অপসারিত হইলে জীব ও শিব, আত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়।

এই প্রকারে—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

এই স্বরূপে পরমাত্মাকে আমাদের উত্তরোত্তর আরও অধিক উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রথমে প্রভু নিরপেক্ষ দেখেন। পরে নৈতিক জীবন আরম্ভ হইলে আমাদের দ্বারা সৎকর্ম হইতে থাকে তখন তিনি 'উৎসাহ' দেন। তারপর চিত্তের সূক্ষ্ম ময়লা ধুইয়া ফেলার পক্ষে নিজ প্রযত্ন পর্যাপ্ত নয় দেখিয়া ভক্ত যখন ডাকে তখন ঐ অনাথের নাথ সহায়তা করার জন্য দৌড়াইয়া আসেন। তারপর কর্মের ফলও ভগবানকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকেই 'ভোক্তা' বানাইতে হইবে এবং অবশেষে সমস্ত সঙ্কল্প অর্ঘ্যরূপে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া সারা জীবন হরিময় করিতে হইবে। ইহাই মানুষের অন্তিম লক্ষ্য। 'কর্মযোগ' ও 'ভক্তিযোগ' এই দুই ডানায় ভর করিয়া সাধককে এই অন্তিম গন্তব্যে গিয়া পৌঁছিতে হইবে।

॥ ৭৪ ॥ নম্রতা, নির্দম্ভতা আদি মূলভূত জ্ঞান-সাধনা

এই সব করার জন্য নৈতিক সাধনার দৃঢ় বনিয়াদ দরকার। সত্য-অসত্যের বিচার করিয়া সত্যকেই সর্বদা গ্রহণ করা চাই। সার-অসার বিচার করিয়া সারই গ্রহণ করা চাই। ঝিনুক বাদ দিয়া মোতি গ্রহণ

করা চাই। এইভাবে জীবন আরম্ভ করিতে হইবে। তারপর আত্ম-প্রযত্ন ও পরমেশ্বরের কৃপাবলে উপরে উঠিতে হইবে। এই সকল সাধনায় দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করার অভ্যাস যদি করি ত খুব সহায়তা লাভ হইবে। এই প্রসঙ্গে যীশুখ্রীস্টের আত্মোৎসর্গের কথা আমার মনে পড়িতেছে। কীলক ঠুকিয়া ঠুকিয়া তাঁহাকে মারা হইতেছিল। তখন তাঁহার মুখ হইতে "ভগবান এত যাতনা কেন দিচ্ছ" একথা নাকি বাহির হইয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, "ভগবান, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এদের ক্ষমা কর। এরা জানে না কি করছে।" যীশুর এই উদাহরণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। দেহ হইতে আত্মাকে কত দূর পর্যন্ত পৃথক করা উচিত ইহা তাহার নিদর্শন। কত দূরে যাইতে হইবে, আর কতটা যাওয়া যায় তাহা খ্রীস্টের জীবন হইতে বুঝা যায়। দেহ এক আবরণ, এক খোসার মত খসিয়া পড়িতেছে—এতদূর পর্যন্তই গন্তব্য প্রসারিত। যখনই আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করার কথা মনে আসে তখনই যীশুর জীবন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। দেহ হইতে সর্বপ্রকারে পৃথক হওয়ার, দেহের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করার উদাহরণ যীশু উপস্থিত করিয়াছেন।

দেহ ও আত্মার এই পৃথক্‌করণ ততক্ষণ পর্যন্ত করা সম্ভব হয় না যতক্ষণ না সত্যাসত্যের বিবেক জন্মে। এই বিবেক, এই জ্ঞান আমাদের প্রতি রোমকূপে ব্যাপ্ত হওয়া চাই। জ্ঞান শব্দের অর্থ আমরা করি 'জ্ঞাত হওয়া'—জানা। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া জানা জ্ঞান নহে। গ্রাস মুখে তুলিলেই আহার করা হয় না। মুখে তোলার পর গ্রাস চিবাইতে হয়, গিলিতে হয়, পেটে জীর্ণ করিয়া সে রস সমস্ত শরীরে রক্তরূপে পুষ্টি প্রদান করিলে তবেই যথার্থ ভোজন হইবে। তেমনি কেবল বুদ্ধি গ্রাহ্য জ্ঞানে কাজ চলে না। ঐ জ্ঞান সারা জীবনে পরিব্যাপ্ত হওয়া চাই, হৃদয়ে সঞ্চারিত হওয়া চাই। আমাদের হাত-পা, চক্ষু ইত্যাদি দ্বারা সেই জ্ঞান প্রকট হওয়া চাই। এরূপ হওয়া চাই যেন আমাদের সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহ বিচারপূর্বক কর্ম করিতে থাকে। তাই এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানের খুবই সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের মতই জ্ঞানের এই লক্ষণ।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্

এইরূপ বিশ রকম গুণের কথা ভগবান বলিয়াছেন। তিনি কেবল এই সকল গুণকে 'জ্ঞান' বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু ইহাদের বিপরীত যাহা সব কিছুই তিনি অজ্ঞান বলিয়া স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানের যে সাধনা নির্দেশ করিয়াছেন সে সাধনা মানেই জ্ঞান। সক্রেটিস্ বলিয়াছেন, "সদ্গুণকেই আমি জ্ঞান মনে করি।" সাধনা ও সাধ্য দুই-ই একরূপ।

গীতার এই বিশ প্রকার সাধনকে জ্ঞানদেব আঠারটি করিয়া দিয়াছেন। হৃদয় ঢালিয়া জ্ঞানদেব এই সাধনসমূহের বর্ণনা করিয়াছেন। গীতায় পাঁচটি মাত্র শ্লোকে এই সাধনসমূহের, এই গুণসমূহের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানদেব তাঁহার জ্ঞানেশ্বরীতে এই পাঁচটি শ্লোকের উপর বিস্তারপূর্বক সাত শত 'ওবী' লিখিয়া গিয়াছেন। সমাজে সদ্গুণের বিকাশ হউক, সত্যস্বরূপ পরমাত্মার মহিমা বাড়ুক, তাহার জন্য জ্ঞানদেব ব্যাকুল ছিলেন। এই সব গুণের বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি তাঁহার সারা জীবনের অনুভব ঐ ওবীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। মারাঠী ভাবাভাবীদের তিনি মহা উপকার করিয়াছেন। জ্ঞানদেবের প্রতি রোমকূপে এই সব গুণ ব্যাপ্ত ছিল। মহিষের পিঠে চাবুক মারিলে সে দাগ তাঁহার পিঠে ফুটিয়া উঠিত। প্রাণী মাত্রের প্রতি এমনই ছিল তাঁহার সহানুভূতি। তাঁহার জ্ঞানেশ্বরী এমনই করুণা-ভরা হৃদয় হইতে উৎসারিত। ঐ সব গুণের তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গুণবর্ণনা যেন আমরা পড়ি, মনন করিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া লই। জ্ঞানদেবের ঐ মধুর ভাষা আমি আস্বাদন করিতে পাইয়াছি বলিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। তাঁহার মধুর ভাষা যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলে আমার জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হয় তবে সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। যাহা হউক সারকথা হইল উত্তরোত্তর নিজেদের বিকাশ করিতে করিতে, আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিয়া মানুষ যেন জীবন পরমেশ্বরময় করার প্রযত্ন করে।

রবিবার, ১৫-৫-১৯৩২

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণোৎকর্ষ ও গুণ-নিস্তার

॥ ৭৫ ॥ প্রকৃতির বিশ্লেষণ

বন্ধুগণ

আজ চতুর্দশ অধ্যায়ের আলোচনা। এক অর্থে এই অধ্যায় পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পরিপূরক। বস্তুত আত্মার কিছু করার আবশ্যকতা নাই। আত্মা স্বয়ংপূর্ণ। আমাদের আত্মার গাত স্বভাবতই ঊর্ধ্বগামী। কিন্তু কোন বস্তুর সহিত যদি কোন ভারি ওজন বাঁধিয়া দেওয়া হয় তবে তাহা যেমন নীচের দিকে নামিতে থাকে তেমনই এই শরীরের বোঝাও আত্মাকে নীচের দিকে টানিতে থাকে। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে কোনও উপায়ে যদি আমরা দেহ ও আত্মাকে পৃথক করিতে পারি ত আমাদের প্রগতি হইতে পারে। এই কাজ কঠিন হইলেও ইহার ফল অতীব মহান্। আত্মার পায়ের এই দেহরূপী বেড়ি যদি আমরা কাটিতে পারি তবে আমাদের মহা আনন্দের অনুভব হইবে। তাহা হইলে দেহের দুঃখে মানুষ দুঃখী হইবে না। সে স্বাধীন হইয়া যাইবে। দেহরূপী এই বস্তু যদি মানুষ জয় করিয়া লইতে পারে ত জগতে কোন শক্তি তাহার উপর প্রভুত্ব চালাইতে পারে না। যে নিজের উপর রাজত্ব করে সে ত বিশ্বের সম্রাট। অতএব আত্মার উপর দেহের যে প্রভুত্ব হইয়াছে তাহা দূর কর। দেহের যে এই সব সুখদুঃখ তাহা অপরের তাহা বিজাতীয়। আত্মার সহিত উহার লেশমাত্রও সম্বন্ধ নাই।

এইসব সুখ-দুঃখ দেহ হইতে কতদূর পর্যন্ত পৃথক করা যায় ভগবান যীশুখ্রীস্টের উদাহরণ দ্বারা তাহার আভাস দিয়াছি। তিনি দেখাইয়াছেন দেহ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিলেও মনকে কিভাবে পূর্ণ শান্ত ও আনন্দময় রাখা যায়। কিন্তু এভাবে দেহকে আত্মা হইতে পৃথক করা একদিকে যেমন বিবেকের কাজ, অন্যদিকে তেমনই নিগ্রহের কাজ।

বিবেকাসহিত বৈরাগ্যাচেঁ বল

"বিবেকের সহিত বৈরাগ্যের বল"—তুকারাম এরূপ বলিয়াছেন। বিবেক, বৈরাগ্য দুই-ই দরকার। বৈরাগ্যই এক প্রকারের নিগ্রহ, তিতিক্ষা। এই চতুর্দশ অধ্যায়ে নিগ্রহের পথ নির্দেশ করা হইয়াছে। দাঁড় নৌকা টানে

কিন্তু দিক নির্ণয়ের কাজ করে হাল। দাঁড় ও হাল দুই-ই দরকার। সেইরূপ দেহের সুখ-দুঃখ হইতে আত্মাকে পৃথক করার ব্যাপারেও বিবেক ও নিগ্রহ দুই-ই আবশ্যক।

বৈদ্য যেমন মানুষের প্রকৃতি দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করে সেইভাবে ভগবান এই চতুর্দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া পৃথক্‌করণ করিয়া কোথায় কি রোগ আছে তাহা দেখাইয়াছেন। এখানে প্রকৃতির যথাযথ বিভাগ করা হইয়াছে। রাজনীতি-শাস্ত্রে বিভাজনের এক বড় সূত্র আছে তাহা এই : শত্রুকে সহজে পরাজয় করিতে চাও ত সম্মুখে উপস্থিত শত্রুব্যূহে ভেদবিভেদ সৃষ্টি কর। ভগবান এখানে তাহাই করিয়াছেন।

আমার, আপনার, সকল জীব-জন্তুর, সকল চরাচরের প্রকৃতিতে তিন গুণ রহিয়াছে। আয়ুর্বেদে যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফ এখানেও তেমনই সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বারা সমস্ত প্রকৃতি ভরিয়া রহিয়াছে। সর্বত্র এই তিন গুণের অস্তিত্ব—কোথাও কম, কোথাও বেশী, ব্যবধান এইমাত্র। যখন এই তিন গুণ হইতে আত্মাকে পৃথক করিতে পারিবে তখন দেহ হইতেও আত্মাকে পৃথক করা যাইবে। দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করার উপায় এই তিন গুণের স্বরূপ জানিয়া উহাদের জয় করিয়া লওয়া। নিগ্রহের দ্বারা একটির পর একটি বস্তু জয় করিয়া মুখ্য বস্তুতে গিয়া পৌঁছিতে হইবে।

॥ ৭৬ ॥ তমোগুণ হইতে বাঁচার উপায় : শরীর-শ্রম

প্রথমে তমোগুণের কথা ধরা যাক। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় তমোগুণের অতি ভয়ানক পরিণাম দেখা যায়। এই তমোগুণের মুখ্য পরিণাম আলস্য। ইহা হইতে নিদ্রা ও প্রমাদের উৎপত্তি হয়। এই তিনকে জয় করিলে তমোগুণ জয় করা হইয়াছে বলা যাইবে। এই তিনের মধ্যে আলস্য মহা ভয়ঙ্কর। খুব বড় বড় মানুষও এই আলস্যের ফলে নষ্ট হইয়া যায়। এই রিপু সমাজের সকল সুখ-শান্তি বিনাশ করে। বালক হইতে বৃদ্ধ সকলকেই ইহা নষ্ট করে। ব্যূহ রচনা করিয়া এই শত্রু মানুষকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আমাদের উপর চড়াও হইবার জন্য সে অনুক্ষণ ওৎ পাতিয়া আছে। সামান্য একটু সুযোগ পাইলেই ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। দুই

গ্রাস বেশী খাইয়া ফেলিলেন ত অমনি শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিবে। একটু বেশী ঘুমাইলেন ত আলস্য যেন চোখে ঘর বাঁধিয়া বসে। যতদিন আলস্য বিনষ্ট না হইবে ততদিন সব চেষ্টাই বৃথা। কিন্তু আমরা আলস্যের জন্য ত পাগল। রাতদিন খাটিয়া পয়সা একবার জমাইয়া লইতে পারিলেই হইল। বস্, তার পরে আরামে দিন চলিবে এই না আমাদের মনের ভাব। বিস্তর পয়সা রোজগারের মানে ভবিষ্যতের জন্য কুঁড়েমির পথ তৈরি করা। আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে বৃদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম আবশ্যক। কিন্তু এই ধারণা ভুল। যদি আমরা জীবনে ঠিকমত চলি তবে বৃদ্ধ হইলেও কাজ করিতে থাকিব। বরং অভিজ্ঞতার দরুণ বৃদ্ধাবস্থায় অধিকতর যোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইব, কিন্তু সেই সময়ই বলি কি-না বিশ্রামের কথা!

৫

আলস্য একটুও সুযোগ না পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। নলরাজা এত মহৎ ছিলেন। কিন্তু পা ধোয়ার সময় একটু স্থান ধুইতে বাকী ছিল। সেই ফাঁকে কলি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। নলরাজা ছিলেন শুদ্ধ, সব দিকে শুচি। কিন্তু দেহের সামান্য একটু স্থান অধৌত ছিল—এতটুকু আলস্য। সঙ্গে সঙ্গে কলি প্রবেশ করিল। আমাদের ত সমস্ত শরীরই খোলা পড়িয়া আছে। যে কোন স্থান দিয়া আলস্য প্রবেশ করিতে পারে। শরীরে আলস্য প্রবেশ করিয়াছে কি অমনি মন-বুদ্ধিও জড় হইয়া যাইবে। আর এই আলস্যই আজিকার সমাজব্যবস্থার ভিত। ইহার ফলে অশেষ দুঃখ দেখা দিয়াছে। আলস্য দূর করিতে পারিলে সকল দুঃখের না হইলেও অধিকাংশ দুঃখের অবসান হইবে।

আজকাল যেখানে সেখানে সমাজ সংস্কারের কথা শুনা যায়। সাধারণ একজন লোকের কমপক্ষে কতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া চাই আর সেজন্য সমাজকে অমুক ছাঁচে গড়িতে হইবে ইত্যাদি চর্চা চলে। এক দিকে অতীব সুখ আর এক দিকে অশেষ দুঃখ। এক দিকে পর্বতপ্রমাণ সম্পদ অন্য দিকে দারিদ্র্যের অতলান্ত গভীর খাত! এই সামাজিক বৈষম্য দূর করিবার উপায় কি? সব রকমের প্রয়োজনীয় সুখ সহজে লাভ

করার একটিই মাত্র উপায়, তাহা হইতেছে আলস্য ত্যাগ করিয়া সকলের শ্রম করিতে প্রস্তুত হওয়া। দুঃখের মূল কারণ আলস্য। সকলে শারীরিক শ্রম করার ব্রত গ্রহণ করিলে এই দুঃখ দূর হইয়া যাইবে।

কিন্তু আজ সমাজে আমরা কি দেখি? একদিকে জং ধরা মানুষের দল অকেজো হইয়া আছে, ধনীদের শরীর মরিচায় খাইতেছে—তাহাদের শরীরের ব্যবহারই হইতেছে না। অপর দিকে বহু লোককে এত অধিক খাটিতে হইতেছে যে তাহাদের শরীর ঘসিয়া ঘসিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। সমাজের সর্বত্র শারীরিক শ্রম হইতে রেহাই পাইবার প্রবৃত্তি জন্মিতেছে। যাহাদের মরিতে মরিতে কাজ করিতে হয় তাহারা খুশি মনে তাহা করে না। উপায় নাই তাই করে। শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকেরা শ্রম এড়াইবার জন্য নানা রকম বাহানার সৃষ্টি করে। কেহ বলে, "ব্যর্থ শরীরশ্রমে সময় নষ্ট করব কেন?" কিন্তু কেহ একথা বলে না যে, "বৃথা ঘুমাও কেন, খাওয়াতে সময় নষ্ট কর কেন?" ক্ষুধা লাগে তাই খাই। ঘুম পায় তাই ঘুমাই। কিন্তু শারীরিক শ্রমের কথা উঠিলেই বলি, "এতে বৃথা সময় নষ্ট কেন করব? মিছামিছি শরীরকে এত কষ্টে ফেলব কেন? আমরা ত মানসিক শ্রমই যথেষ্ট করে থাকি।" উত্তম, মানসিক শ্রম করেন ত মানসিক খাদ্যই খান না, আর মানসিক নিদ্রাই যান না! মনোময় আহার ও মনোময় নিদ্রার ব্যবস্থা করিয়া লউন।

এইরূপে সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একদিকে লোক দিনরাত খাটিয়া শরীর পাত করে অপরদিকে কিছু লোক হাত পা-ও নাড়ে না। কোন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিল, "কিছু মুণ্ড আর কিছু ধড়।" এক দিকে কেবল ধড়, আর এক দিকে কেবল মুণ্ড। ধড়গুলি কেবল খাটে, মুণ্ডগুলি শুধু চিন্তা করে। এইভাবে সমাজ রাহু ও কেতু, ধড় ও মুণ্ড—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্যসত্যই যদি কেবল মুণ্ড আর কেবল ধড় হইত তবে কোন কথা ছিল না। সে অবস্থায় 'অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়' অনুসারে কোনরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিত। অন্ধকে পঙ্গু রাস্তা দেখাইত, পঙ্গুকে অন্ধ কাঁধে লইত। কিন্তু এখানে এই ধড় ও মুণ্ডের কোন পৃথক সত্তা নাই। প্রত্যেকের ধড় আছে আবার মুণ্ডও আছে। সর্বত্র এই ধড় ও

মুণ্ড যুক্ত হইয়া আছে। সুতরাং এখন কি করা যায়? প্রত্যেকের উচিত আলস্য ত্যাগ করা।

আলস্য ত্যাগের অর্থ শরীরশ্রম করা। আলস্য জয়ের ইহাই উপায়। এই উপায়ের আশ্রয় না লইলে প্রকৃতির সাজা ভুগিতেই হইবে। রোগেই ভুগুন কি অন্যভাবেই ভুগুন, ভুগিতেই হইবে। সাজা না ভুগিয়া নিস্তার নাই। দেহ যখন পাইয়াছি তখন শ্রম করিতেই হইবে। শরীরশ্রমে যে সময় যায় তাহা বৃথা যায় না। প্রতিদান অবশ্যই মেলে। স্বাস্থ্য ভাল হয়। বুদ্ধি সতেজ, তীব্র ও শুদ্ধ হয়। কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তায় পেট-ব্যথার, মাথা-ধরার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা যদি রৌদ্রে, মুক্ত হাওয়ায়, প্রকৃতির কোলে পরিশ্রম করেন তবে তাঁহাদের চিন্তা সতেজ হইবে। শারীরিক রোগের প্রভাব যেমন মনের উপর পড়ে তেমনই শারীরিক স্বাস্থ্যেরও প্রভাব মনের উপর পড়ে। ইহা অভিজ্ঞতা-লব্ধ কথা। ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়া কোন পাহাড়ে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য যাওয়া বা অন্য কোথাও সূর্যরশ্মি গায়ে লাগাইবার জন্য যাওয়ার পূর্বে খোলা জায়গায় কোদাল দিয়া মাটি কোপাইলে, বাগানে জল দিলে, কাঠ চিরিলে ক্ষতি কি?

॥ ৭৭ ॥ তমোগুণ হইতে বাঁচার আর এক উপায়

আলস্যজয় এক কথা, দ্বিতীয় কথা নিদ্রাজয়। নিদ্রা বস্তুত পবিত্র বস্তু। সেবা করিয়া ক্লান্ত সাধু-সন্তের পক্ষে এই নিদ্রা যোগই বটে। মহাভাগ্যবান লোকদেরই এরূপ শান্ত গাঢ় নিদ্রা হয়। নিদ্রা গভীর গাঢ় হওয়া চাই। নিদ্রার গুরুত্ব নিদ্রার দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নয়। বিছানা কতটা লম্বা আর তাহাতে মানুষ কত সময় পড়িয়াছিল তাহার উপর নিদ্রা নির্ভরশীল নয়। কুয়া যত গভীর হইবে উহার জল তত পরিষ্কার ও মিষ্ট হইবে। সেইরূপ অল্প সময়ের গভীর নিদ্রায়ও উত্তম কাজ হয়। মনোযোগের সহিত আধঘণ্টা পড়া, অস্থির চিত্তে তিন ঘণ্টা পড়া অপেক্ষা অধিক ফলদায়ী। ঘুমের ব্যাপারেও তাহাই। দীর্ঘ নিদ্রা শেষ পর্যন্ত হিতকর হইবে একথা বলা যায় না। রোগী চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকে।

বিছানার সঙ্গে তাহার নিরন্তর সংযোগ, কিন্তু ঘুমের দেখা নাই। স্বপ্নবিহীন গাঢ় নিদ্রাই যথার্থ নিদ্রা। মরার পর যম-যাতনা যাহা আছে তাহা ত আছেই, কিন্তু যাহার সুনিদ্রা আসে না, দুঃস্বপ্ন আসিতে থাকে তাহার যাতনার কথা আর কি বলিব। বেদে ঋষি ত্রস্ত হইয়া বলিতেছেন :

পরা দুঃস্বপ্ন্যং সুব

"এইরূপ দুষ্ট নিদ্রা আমি চাই না, চাই না। নিদ্রা ত বিশ্রামের জন্য। কিন্তু নিদ্রাতেও যদি নানা স্বপ্ন, নানা চিন্তা আসিয়া জুটে ত বিশ্রাম হইবে কিরূপে ?

গাঢ় ও গভীর নিদ্রা লাভের উপায় কী ? আলস্যের কথায় যাহা বলা হইয়াছে এখানেও তাহা প্রযোজ্য। শরীরের নিকট হইতে সর্বদা কাজ আদায় করিতে হইবে। বিছানায় পড়ামাত্র যেন মরার মত ঘুম আসে। নিদ্রা ত ছোটখাটো মৃত্যুই। এমন মধুর মৃত্যুর জন্য দিনমানে পূর্ব হইতেই উত্তমরূপে প্রস্তুত হওয়া চাই। শ্রমে শরীর ক্লান্ত-বিবশ হওয়া চাই। ইংরেজ কবি শেক্সপিয়র বলিয়াছেন, "রাজার মাথার উপর মুকুট থাকে কিন্তু মাথার মধ্যে থাকে চিন্তা।" তাই রাজার ঘুম আসে না। ইহার এক কারণ—সে শারীরিক শ্রম করে না। জাগিবার সময় যে ঘুমায়, ঘুমাবার সময় সে জাগিয়া থাকিবে। দিনের বেলা বুদ্ধি ও শরীরের ব্যবহার না করা নিদ্রা যাওয়ারই শামিল। পরে নিদ্রার সময় বুদ্ধি নানা চিন্তার পাকে ঘুরিতে থাকে আর শরীরও যথার্থ নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়। তারপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শুইয়া পড়িয়া থাকে। যে জীবন দিয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে তাহা যদি নিদ্রায়ই খাইয়া ফেলে তবে পুরুষার্থ সাধন কিরূপে সম্ভব হইবে ? অর্ধেক জীবন নিদ্রাতেই চলিয়া গেলে কী আর লাভ করা যাইবে ?

যখন অনেকটা সময় নিদ্রাতেই চলিয়া যাইতে থাকে, তখন তমোগুণের তৃতীয় দোষ 'প্রমাদ' আপনা হইতেই আসিয়া জুটে। নিদ্রালু মানুষের চিত্ত দক্ষ ও সজাগ হইতেই পারে না। তাহাদ্বারা অনবধানতা জন্মে। অধিক নিদ্রা হইতে আলস্যের বৃদ্ধি হয় আর আলস্য হইতে উদ্ভূত হয়

বিস্মৃতির। বিস্মরণ পরমার্থের নাশক হইয়া পড়ে। ব্যবহারিক জীবনেও বিস্মৃতি ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে বিস্মরণ ত এক স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিস্মরণ যে একটা বড় রকমের দোষ এ কথাটা পর্যন্ত লোকের মনে হয় না। কাহারও সহিত দেখা করার কথা স্থির হইল, কিন্তু যথাসময়ে দেখা করিতে গেল না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "ভুলে গিয়েছিলাম ভাই।" সে যে মস্ত একটা অন্যায় করিয়াছে এই বোধটাও তাহার নাই। আর যাহাকে বলা হয় সেও সন্তুষ্ট হইয়া যায়। ভুলিয়া যাওয়ার যেন কোন প্রতিকারই নাই এইরূপই লোকে ধরিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই গাফিলতি পারমার্থিক ও ব্যবহারিক উভয় জীবনের পক্ষেই ক্ষতিকর। বস্তুত পক্ষে বিস্মরণ এক বিষম ব্যাধি। তার ফলে বুদ্ধিতে ঘুণ ধরে, জীবন সারহীন ফাঁকা হইয়া যায়।

মনের আলস্য হইতে বিস্মৃতির জন্ম হয়। মন জাগ্রত থাকিলে ভুল হয় না। শুইয়া থাকা অলস মন বিস্মরণের ব্যাধিতে না ভুগিয়া পারে না। সেইজন্য ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ

পমাদো মচ্চুনো পদম্

প্রমাদ, বিস্মরণ মানেই মৃত্যু। এই প্রমাদ জয় করিবার জন্য আলস্য ও নিদ্রা জয় করুন। শরীরশ্রম করুন এবং সতত সাবধান থাকুন। প্রত্যেকটি কাজ বিচারপূর্বক করুন। যে কাজই হউক বিনা বিচারে করিতে নাই। কাজ করিবার পূর্বে বিচার, কাজ সম্পন্ন হইবার পরে বিচার। আগে ও পরে সর্বত্র বিচার-রূপী ভগবান যেন উপস্থিত থাকে। এই ভাব যখন অভ্যাসে পরিণত হইবে তখন অনবধানতা রোগ দূর হইয়া যাইবে। সমস্তটা সময় নিয়মে বাঁধিয়া রাখুন। প্রতি মুহূর্তের হিসাব রাখুন। তাহা হইলে আলস্য শরীরে প্রবেশের রাস্তা পাইবে না। এইভাবে সর্বপ্রকার তমোগুণ জয় করার চেষ্টা করিতে হইবে।

॥ ৭৮ ॥ রজোগুণ হইতে বাঁচার উপায় ঃ স্বধর্মের সীমা

ইহার পর রজোগুণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। রজোগুণ এক ভয়ানক শত্রু। ইহা তমোগুণেরই অপর দিক, বরং বলা যায় এই দুইটি

পর্যায়বাচী শব্দ। শরীর যখন খুব ঘুমাইয়া উঠে তখন উহা দৌড়-ঝাঁপ করিতে চায় এবং যখন অনেক দৌড়-ঝাঁপ করে তখন বিছানায় শুইতে চায়। তমোগুণ হইতে রজোগুণ আর রজোগুণ হইতে তমোগুণ আসে। যেখানে একটি আছে সেখানে অপরটি আসিবেই ধরিয়া লওয়া যায়। রুটি যেমন জ্বলন্ত আগুন ও গরম ছাইয়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যায় তেমনি মানুষেরও সামনে ও পিছনে রজোগুণ ও তমোগুণ লাগিয়াই থাকে। রজোগুণ বলে, "এদিকে এসো, তোমাকে তমোগুণের দিকে ছুঁড়ে দেব।" তমোগুণ বলে, "আমার কাছে এসো, আমি রজোগুণের দিকে তোমায় ঠেলে দেব।" এইভাবে রজোগুণ ও তমোগুণ একে অন্যের সহায়ক হইয়া মানুষকে নাশ করিয়া ফেলে। ফুটবলের জন্ম যেমন লাথি খাওয়ার জন্য, তেমনই মানুষের জীবন রজোগুণ ও তমোগুণের লাথি খাইতে খাইতেই শেষ হয়।

রজোগুণের প্রধান লক্ষণ, নানা প্রকারের কার্য করার বাসনা। অজস্র কর্মের জন্য অপার আসক্তি। রজোগুণের দ্বারা অগণিত কর্ম-সঙ্গ আসিয়া জুটে। লোভযুক্ত কর্মাসক্তি উৎপন্ন হয়। তখন বাসনা-বিকারের বেগ সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এখানকার পাহাড় ওখানে লইয়া ওখানকার গর্ত ভরিয়া ফেলার ইচ্ছা হয়। সমুদ্রে মাটি ফেলিয়া উহা সমতল করার আর সাহারা মরুভূমিতে জল ঢালিয়া উহা সমুদ্র করার প্রেরণা জন্মে। এখানে সুয়েজ খাল খনন, ওখানে পানামা—এইরূপ ধুম-ধড়াক্কা আরম্ভ হইয়া যায়। এখানে ভাঙ্গি, ওখানে গড়ি। এসব ছাড়া যেন শান্তি পাওয়া যায় না। শিশু কাপড়ের টুকরা লয়, উহা ছেঁড়ে, আবার উহা দ্বারা কিছু তৈরী করে। ইহাও সেইরূপ। ইহাতে ইহা মিশাও, উহাতে উহা ডুবাও। উহা এইভাবে উড়াও, ইহা এইভাবে বানাও—এইরূপই রজোগুণের অনন্ত খেলা চলিতে থাকে। পাখি আকাশে উড়ে, আমরা কেন উড়িব না? মাছ জলে থাকে, আমরাও কেন জাহাজ বানাইয়া জলের মধ্যে থাকিব না? এইভাবে নর-দেহে আসিয়া পাখি ও মাছের সমান হইয়া আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করি। অপর দেহে প্রবেশের তথা অপর দেহের বিশেষত্ব অনুভব করার লালসা এই নরদেহে তাহার হয়। কেহ বলে—"চলো মঙ্গলগ্রহে যাই, সেখানকার অধিবাসীদের দেখে আসি।" চিত্ত

অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতে থাকে। যেন নানা বাসনার ভূত আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। যেখানে যাহা আছে সেখানে তাহা ভাল লাগে না। সব লণ্ডভণ্ড হওয়া চাই। মনে করে আমি এত বড় মনুষ্য-জীব, আমি থাকিতে জগৎ পূর্বের মতই চলিতে থাকিবে, তাও কি হয়!—ভাবটা তাহার এইরূপ। কোন পালোয়ানের শরীরে যখন শক্তির মত্ততা আসে তখন তাহা দূর করার জন্য সে কখনও দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়, কখনও গাছের সঙ্গে ঘসা খায়। রজোগুণের উচ্ছ্বাসও সেইরূপ হইয়া থাকে। ইহার প্রভাবের বশে মানুষ পৃথিবীর অভ্যন্তরে গভীর গর্ত খুঁড়িতে থাকে। ঐ গর্তের ভিতর হইতে কিছু পাথর বাহির করে ও তাহাদের হীরা, মাণিক ইত্যাদি নাম দেয়। তেমনি উৎসাহভরে সে সমুদ্রে ডুব মারে এবং তলাকার জঞ্জাল, আবর্জনা তুলিয়া আনে। আর তাহাদের নাম দেয় মোতি। কিন্তু ঐ মোতিতে ছিদ্র থাকে না। তাই উহাতে ছিদ্র বানায়! কিন্তু সে মোতি কোথায় পরিবে? তখন নাকে কানে ছিদ্র করার জন্য সে স্বর্ণকারের কাছে যায়। মানুষ এসব উথল-পুথল করে কেন! এসবই রজোগুণের প্রভাব।

রজোগুণের দ্বিতীয় পরিণাম এই যে, মানুষ স্থৈর্য হারাইয়া ফেলে। রজোগুণ হাতে-হাতে ফল চায়। একটু বাধাবিঘ্ন আসিলেই সে গৃহীত পন্থা পরিবর্তন করে। রজোগুণী মানুষ সর্বদা এটা ছাড়ে, ওটা ধরে। এই ভাবে তার ধরা-ছাড়া চলিতেই থাকে। নিত্য নূতন তার বাছাই। ইহার পরিণাম এই দাঁড়ায় যে শেষ পর্যন্ত তাহার ভাগ্যে কিছুই থাকে না।

রাজসং চলমধ্রুবম্

রজোগুণের সমস্ত কর্মই চঞ্চল ও অনিশ্চিত। ছোট ছেলে-মেয়েরা গম বোনে আর সঙ্গে সঙ্গেই উঠাইয়া দেখে। সেইরূপই অবস্থা রজোগুণী মানুষের। চট্‌পট্‌ সব কিছু তার হাতে আসা চাই। অল্পেই সে অধীর হইয়া উঠে। সংযম হারাইয়া ফেলে। কোথাও স্থির হইতে পারে না। এখানে একটু কাজ করিল, তথায় কিছু প্রসিদ্ধি হইল অমনি চলিল অন্য কোথাও। আজ মাদ্রাজে মানপত্র, কাল কলিকাতায়, পরশু বোম্বাই-

নাগপুরে। সব মিউনিসিপ্যালিটি হইতেই মানপত্র পাওয়ার লালসা তাহার হয়। সর্বত্র কেবল মান আর মান—ইহাই সে দেখে। এক জায়গায় স্থির হইয়া কাজ করার অভ্যাস তাহার হয় না। ইহার ফলে রজোগুণী মানুষের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া থাকে।

রজোগুণের প্রভাবে মানুষ নানা রকম পেশায় নানা রকম কাজে মাথা গলায়। তাহার স্বধর্ম থাকে না। বস্তুতঃ স্বধর্মাচরণের অর্থ অন্য নানারূপ কর্মের ত্যাগ। গীতার কর্মযোগ রজোগুণের অব্যর্থ ঔষধ। রজোগুণে সব কিছু চঞ্চল। পর্বতের চূড়ায় পতিত জল যদি নানা দিকে বহিয়া যায় ত তাহার অস্তিত্বই থাকে না। সব জল এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া নিরর্থক হইয়া যায়। কিন্তু সেই জলের সবটা যদি একদিকে প্রবাহিত হয় তবে উহা নদীতে পরিণত হইবে। তাহা হইতে শক্তি উৎপন্ন হইবে, তাহাতে দেশের লাভ হইবে। সেইরূপ মানুষও যদি নানা কার্যে না লাগিয়া তাহার সমস্ত শক্তি সুব্যবস্থিতভাবে একই কার্যে নিয়োগ করে তবে তাহাদ্বারা কিছু কর্ম হওয়া সম্ভব। এখানেই স্বধর্মের গুরুত্ব।

স্বধর্মের বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করিয়া তাহাতে সকল শক্তি নিয়োগ করা চাই। অপর কোন দিকে নজর না যায়, এখানেই স্বধর্মের পরীক্ষা। কর্মযোগ মানে কোন বড় বা অসাধারণ কর্ম নয় এবং বহুবিধ কর্ম করাও নয়। গীতার কর্মযোগ ভিন্ন বস্তু। উহার বিশেষত্ব হইল ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একমাত্র স্বভাবপ্রাপ্ত অপরিহার্য স্বধর্ম পালন করা ও তদ্দ্বারা উত্তরোত্তর আত্মশুদ্ধি লাভ করা। নতুবা এই সৃষ্টিতে সর্বদা নানা প্রকারের কর্ম ত নিরন্তর চলিতেই আছে। কর্মযোগ মানে বিশিষ্ট মনোবৃত্তি দ্বারা সবকিছু করা। ক্ষেতে বীজ বোনা, আর এক মুঠা শস্য লইয়া যেমন-তেমন ভাবে ছিটাইয়া দেওয়া এক নয়—ব্যবধান অনেক। আমরা জানি বীজ বুনিলে কতটা ফল পাওয়া যায় আর বীজ ছিটাইয়া দিলে কতটা লোকসান হয়। গীতা যে কর্মের উপদেশ দেয় তাহা বোনার মত। সেইজন্য স্বধর্মরূপ কর্তব্য কর্মে অপার শক্তি নিহিত। যতই পরিশ্রম করা হউক না কেন, তাহা কমই পড়িয়া যায়। কাজেই ইহাতে বেশী দৌড়-ঝাঁপের বা ধরা-ছাড়ার সম্ভাবনাই নাই।

॥ ৭৯ ॥ স্বধর্ম স্থির করার উপায়

এই স্বধর্ম নির্ণয়ের উপায় কি ? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হইল—উহা স্বাভাবিক ভাবে আসে। স্বধর্ম সহজলব্ধ। উহা খোঁজ করার কথাটাই বরং অদ্ভুত। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বধর্মও জন্মিয়াছে। শিশুর যেমন মাকে খুঁজিয়া লইতে হয় না, তেমনই স্বধর্মও খুঁজিতে হয় না। পূর্ব হইতেই তাহা নির্দিষ্ট থাকে। আমাদের জন্মের পূর্বেও জগৎ ছিল, আমাদের মৃত্যুর পরেও থাকিবে। আমাদের পূর্বেও মস্ত প্রবাহ ছিল আর সামনেও তাহা আছে। এইরূপ প্রবাহে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে মা-বাবার ঘরে আমাদের জন্ম তাঁহাদের সেবা করা, যে প্রতিবেশীর মধ্যে জন্মিয়াছি তাঁহাদের সেবা করা, এই কর্তব্য ত আমরা প্রাকৃতিক নিয়মেই পাইয়াছি। তাহা ছাড়া আমার বৃত্তিসমূহ ত আমার প্রতিদিনেরই অভিজ্ঞতার ফল। আমার ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণা পায়। সুতরাং ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া ও তৃষ্ণার্তকে জলদান করা আমার প্রবাহ-প্রাপ্ত ধর্ম। সেইজন্য সেবারূপ এবং ভূতদয়ারূপ স্বধর্ম খুঁজিয়া লইতে হয় না। স্বধর্মের খোঁজ যেখানে চলে, বুঝিতে হইবে সেখানে কোন না কোনরূপ পরধর্ম অথবা কোন অধর্ম নিশ্চয় চলিতেছে।

সেবকের সেবাকার্য খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। সেবা আপনা হইতেই তাহার নিকট আসে। কিন্তু একথা মনে রাখা চাই যে অনায়াস-প্রাপ্ত হইলেই সব সময়ে তাহা ধর্ম নয়। রাত্রিতে কোন কৃষক আমাকে বলিল, "চলো, ঐ আলটা আমরা চার-পাঁচ হাত সরিয়ে দিই। আমার ক্ষেতের সীমা বেড়ে যাবে। বিনা ঝঞ্ঝাটে কাজ হয়ে যাবে।" এই কাজ করার কথা প্রতিবেশী আমাকে বলিল; দেখিতে উহা সহজলব্ধও বটে। কিন্তু উহাতে অসত্যের আশ্রয় থাকায় উহা আমার কর্তব্য হইতে পারে না।

চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থা যে আমার ভাল লাগে তাহার কারণ উহাতে স্বাভাবিকতা ও ধর্ম দুই-ই আছে। এই স্বধর্ম ছাড়িলে কাজ চলিতে পারে না। যে পিতা-মাতা আমি পাইয়াছি, তাঁহারাই আমার বাবা-মা, আমার তাঁহাদের পছন্দ হয় না একথা কি বলা চলে ? মা-বাবার পেশা

স্বভাবতঃই উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রে বর্তায়। যে পেশা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে তাহা যদি নীতিবিরুদ্ধ না হয় তবে তাহা করা উচিত। সেই বৃত্তি চালাইয়া যাওয়া চাতুর্বর্ণ্যের এক বড় বিশেষত্ব। এই বর্ণ-ব্যবস্থা বর্তমানে পর্যুদস্ত হইয়া গিয়াছে। উহা আচরণ করা এখন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উহা যদি সুব্যবস্থিত করিয়া লওয়া যায় ত খুবই ভাল হইবে। আজ কাল ত জীবনের প্রথম পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর নূতন কাজ, নূতন পেশা শিখিতেই চলিয়া যায়। কাজ শেখার পর মানুষ নিজের সেবাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র খোঁজে। এইভাবে জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর কেবল শিক্ষায় ব্যয় হয় আর সে শিক্ষার সহিত তাহার জীবনের কোন সম্বন্ধ থাকে না। বলা হয়, সে ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। শিক্ষাকালে যেন সে জীবনই যাপন করে না; জীবন আরম্ভ হয় পরে! লোকে বলে, প্রথমে শিক্ষা, তারপরে জীবন। জীবন ও শিক্ষা এই দুই জিনিস যেন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে! যেখানে বাঁচার কথা নাই, তাহাকে মৃত্যুই বলিতে হইবে। ভারতে লোকের গড় আয়ু তেইশ বছর। অথচ পঁচিশ বছরই জীবনের প্রস্তুতিতে কাটিয়া যায়। এইভাবে নূতন কাজ শিখিতেই দিন চলিয়া যায়। কাজের আরম্ভ আর তবে কখন হইবে? ফলে উদ্যমের সময়, গুরুত্বপূর্ণ বয়স বৃথাই চলিয়া যায়। যে উৎসাহ, যে উদ্যম জনসেবায় নিয়োগ করিয়া জীবন সার্থক করার কথা, তাহা শুধু শুধু ব্যর্থ যায়। জীবন খেলা নয়। কিন্তু কি দুঃখের কথা, জীবনের কাজ খুঁজিতেই জীবনের মূল্যবান প্রথম ভাগ অতীত হইয়া যায়! এই জন্যই হিন্দুধর্ম বর্ণধর্মের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল।

কিন্তু চাতুর্বর্ণ্যের কথা বাদ দিলেও সকল দেশে, সর্বত্র—যেখানে চাতুর্বর্ণ্য নাই সেখানেও—লোকে স্বধর্ম প্রাপ্ত হয়। আমরা সকলে এক প্রবাহে এক পরিস্থিতি সঙ্গে লইয়া জন্মগ্রহণ করি। সেইজন্য স্বধর্মাচরণরূপ কর্তব্যও আপনা হইতেই প্রাপ্ত হই। অতএব দূরবর্তী কার্য—যাহাকে কর্তব্যই বলা যায় না, তাহা যতই ভাল মনে হউক না কেন গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক সময় দূরের বাজনা ভাল শুনায়। মানুষ দূরের মোহে মুগ্ধ হয়। যেখানে সে দাঁড়াইয়া আছে সেখানেও গাঢ় কুয়াশা। কিন্তু কাছের কুয়াশা সে দেখে না, দূরের কুয়াশার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলে, "ওখানে

কুয়াশা কেমন ঘন।” আর ওখানকার মানুষ এ দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া ঠিক তেমনি বলে, “ওখানে কুয়াশা খুব গাঢ়।” কুয়াশা সর্বত্র একই। কিন্তু কাছেরটা চোখে পড়ে না। মানুষের মন দূরের আকর্ষণে টানে। নিকটেরটা এক কোণে পড়িয়া থাকে, আর স্বপ্ন দেখে দূরবর্তীর, কিন্তু ইহা মোহ। ইহা ছাড়িতে হইবে। প্রাপ্ত স্বধর্ম সাধারণ হইলেও, পর্যাপ্ত মনে না হইলেও, নীরস লাগিলেও যাহা পাইয়াছি তাহাই আমার পক্ষে ভাল, তাহাই সুন্দর। সমুদ্রে যে ডুবিতেছে তাহার কাছে এবড়ো-খেবড়ো কাঠের গুঁড়ি যদি ভাসিয়া আসে, হউক না তাহা অমসৃণ, অসুন্দর, তবু তাহাই হয় তাহার জীবনরক্ষার অবলম্বন। ছুতারখানায় অনেক মসৃণ, নক্সাকাটা কাঠ থাকে। কিন্তু উহা ত কারখানায়। আর যে লোক ডুবিতেছে সে আছে সমুদ্রে। ঐ অসুন্দর কাঠের গুঁড়ি তাহার তারক। উহাই তাহার আশ্রয় করা উচিত। তেমনি যে সেবাকার্য আমি পাইয়াছি, গৌণ মনে হইলেও তাহাই আমার করণীয়। তাহাতে মগ্ন হইয়া থাকাই আমার পক্ষে শোভাদায়ক। তাহাই আমার উদ্ধারের পথ। অন্য সেবা খুঁজিতে গেলে এটিও যাইবে আর ওটিও হাতছাড়া হইবে। উহার ফলে মানুষ সেবাবৃত্তি হইতে দূরে সরিয়া যায়। অতএব স্বধর্মরূপ কর্তব্যেই লাগিয়া থাকা উচিত।

যখন আমরা স্বধর্মে তন্ময় হইয়া যাই তখন রজোগুণ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কারণ চিত্ত তখন একাগ্র হয়। স্বধর্ম ছাড়িয়া সে কোথাও যায় না। ফলে চঞ্চল রজোগুণের সমস্ত শক্তি শিথিল হইয়া যায়। নদী যখন শান্ত ও গভীর থাকে তখন উহাতে যতই জল বাড়ুক না কেন তাহা সে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়া লয়। তেমনই স্বধর্মরূপ নদীও মানুষের সকল বল, সকল বেগ, সকল শক্তি নিজের মধ্যে ধারণ করিতে সক্ষম হয়। স্বধর্মে যত শক্তিই নিয়োগ কর না কেন তাহা কমই হইবে। স্বধর্মে সকল শক্তি নিয়োগ করিলে রজোগুণের দৌড়-ঝাঁপ করার বৃত্তি শেষ হইয়া যাইবে। চঞ্চলতার, অস্থিরতার হুলই ভাঙ্গিয়া যাইবে। রজোগুণ জয় করার ইহাই উপায়।

॥ ৮০ ॥ সত্ত্বগুণ ও তাহার উপায়

এখন বাকী আছে সত্ত্বগুণ। এখানে খুব সতর্কভাবে চলিতে হইবে। সত্ত্বগুণ হইতে আত্মাকে কিরূপে পৃথক করা যায়? ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম

বিচারের বিষয়। সত্ত্বগুণকে একেবারে নির্মূল করিতে নাই। রজ ও তমকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করিতে হয়। কিন্তু সত্ত্বগুণের ভূমিকা কিছুটা স্বতন্ত্র। যখন খুব ভীড় জমিয়া যায় এবং তাহা ছত্রভঙ্গ করা দরকার হয় তখন সিপাহীদের হুকুম দেওয়া হয়, 'গুলি চালাও। কিন্তু দেখিও কোমরের উপরে নয়, নীচের দিকে চালাইও।' লোক তাহাতে মরে না, জখম হয়। এইভাবে সত্ত্বগুণকে জখম করিবে, মারিবে না। রজোগুণ ও তমোগুণ চলিয়া যাওয়ার পর বাকী থাকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ। যতদিন শরীর আছে, ততদিন কোন এক অবস্থায় ত থাকিতেই হইবে। তবে রজ-তম চলিয়া গেলে যে সত্ত্বগুণ থাকে তাহা হইতে পৃথক হওয়ার অর্থ কি?

যখন সত্ত্বগুণের অভিমান পাইয়া বসে, তখন সে আত্মাকে উহার শুদ্ধস্বরূপ হইতে নীচে টানিয়া নামায়। লণ্ঠনের আলো পূর্ণ স্বচ্ছভাবে পাইতে হইলে উহার ভিতরের কালি পুঁছিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু কাঁচের উপর যে ধূলা জমিয়া আছে তাহাও ধুইয়া ফেলা দরকার। তেমনই আত্মার প্রভার চারিদিকে যে তমোগুণের কালি থাকে তাহা উত্তমরূপে পরিষ্কার করা দরকার। পরে রজোগুণের ধূলাও সাফ করিতে হইবে। তমোগুণ ধোয়া হইল, রজোগুণ সাফ করা হইল। এখন থাকিল শুধু সত্ত্বগুণরূপ কাঁচ। এই সত্ত্বগুণকেও দূর করার অর্থ কি ইহাই নয় যে কাঁচটাকেই ভাঙ্গিয়া ফেলা? না, কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আলোর প্রতিফলনই চলিয়া যাইবে। আলোকরশ্মি বিকিরণ করার জন্য কাঁচ ত চাই-ই। এই শুদ্ধ চকচকে কাঁচকে ভাঙ্গিলে চলিবে না, বরং চক্ষু ঝলসিয়া না যায় সেজন্য ছোট্ট একটু কাগজ আড়াল হিসাবে কাঁচের উপর লাগাইয়া দিতে হইবে। সত্ত্বগুণ জয় করার অর্থ তজ্জনিত অভিমান দূর করা, উহার আসক্তি ত্যাগ করা। সত্ত্বগুণের নিকট হইতে কাজ ত লইতে হইবে, কিন্তু সতর্কভাবে এবং যুক্তিপূর্ণভাবে সত্ত্বগুণকে অহঙ্কার-শূন্য করিতে হইবে।

এই সত্ত্বগুণের অহঙ্কার কিরূপে জয় করা যায়? তাহার একটি উপায় আছে। সত্ত্বগুণকে আমাদের অন্তরে স্থির করিয়া লইতে হইবে। সাতত্যের দ্বারা সত্ত্বগুণের অভিমান যায়। সত্ত্বগুণের কর্ম সতত করিয়া তাহা স্বভাবে পরিণত করিতে হইবে। সত্ত্বগুণ আমাদের নিকট ক্ষণিকের অতিথি যেন না হয়; উহাকে ঘরেরই লোক করিয়া লইতে হইবে। যে ক্রিয়া

আমরা ক্বচিৎ কখনও করি তৎসম্বন্ধে মনে অভিমান আসে। আমরা প্রতিদিন ঘুমাই। সেকথা কাহাকেও আমরা বলিয়া বেড়াই না। কিন্তু কোনও রোগীর পনর দিন ঘুম না হওয়ার পর একদিন একটু ঘুম আসিলে সে সকলকে বলে, "কাল ভাই একটু ঘুম হয়েছে"। তাহার কাছে উহার মূল্য অনেক! ইহা অপেক্ষা শ্বাস-প্রশ্বাসের উদাহরণ অধিকতর ভাল হইবে। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা শ্বাস লই। কিন্তু তাহা কাহাকেও বলি না। "আমি এক নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী জীব"—একথা কেউ বড়াই করিয়া বলে কি? হরিদ্বারের গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত তৃণ পনর শত মাইল স্রোতে ভাসিয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া গর্ব করে না। ঐ তৃণ স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কেহ যদি খরস্রোতের বিপরীত দিকে দশ-বিশ হাত যায় ত কত বড়াই না করে! তাৎপর্য, যে বস্তু স্বাভাবিক সে বিষয়ে আমাদের অহঙ্কার হয় না।

কোন ভাল কাজ করিলে আমরা অভিমান বোধ করি। কেন? তার কারণ কাজটা সহজভাবে হয় নাই। শিশু কোন ভাল কাজ করিলে মা তার পিঠে হাত বুলায়। এমনি ত তার পিঠের সঙ্গে মায়ের ছড়ির পরিচয়ই বেশী। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে এক-আধটি জোনাকি; দেখুন তার গরিমার বহর। সে সবটা জ্যোতি একবারে দেখায় না। জলে, নেভে, আবার জলে। সে আলোর কানামাছি খেলে। আলো যদি সর্বদা জলিত তবে তাহার গৌরব থাকিত না। সাতত্যের জন্য বিশেষত্বের বোধ দূর হয়। সেইরূপ সত্ত্বগুণ যদি সতত আমাদের কর্মে প্রকাশ পাইতে থাকে তবে ক্রমে তাহা আমাদের স্বভাবে পরিণত হইবে। সিংহের আপন শৌর্যের অভিমান নাই। সে বোধই তাহার নাই। তেমনই আমাদের সাত্ত্বিক বৃত্তিকে এমন সহজে হইতে দাও যে, আমরা যে সাত্ত্বিক সে কথাই যেন মনে না হয়। আলোকদান সূর্যের স্বাভাবিক ক্রিয়া। ঐ কার্যে তাহার কোন অহঙ্কার থাকে না। সেইজন্য সূর্যকে যদি মানপত্র দিতে যাও ত সে বলিবে, "আমি বিশেষ কি করেছি? আলো দিই, এই ত? আলো দেওয়াই ত আমার জীবন। আলো না দিলে ত আমার জীবনই থাকবে না। আর কিছু আমি জানি না।" এইরূপ স্থিতি সাত্ত্বিক মানুষের বেলায়ও হওয়া চাই। সত্ত্বগুণ তাহার রোমে রোমে

প্রবেশ করা চাই। সত্ত্বগুণের দ্বারা এইরূপ স্বভাব গড়িয়া উঠিলে অহঙ্কার-ভাব থাকে না। সত্ত্বগুণকে নিস্তেজ করার, সত্ত্বগুণকে জয় করার এই এক উপায়।

দ্বিতীয় উপায় হইল সত্ত্বগুণের আসক্তিও ছাড়িয়া দেওয়া। অহঙ্কার ও আসক্তি দুইটি পৃথক বস্তু। পার্থক্যটা একটু সূক্ষ্ম। দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজে বুঝা যাইবে। সত্ত্বগুণের অহঙ্কার চলিয়া গেলেও আসক্তি থাকিয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের উদাহরণ নিন। শ্বাস-প্রশ্বাসে অভিমান থাকে না। কিন্তু উহাতে খুব বেশী আসক্তি আছে। বলুন, পাঁচ মিনিট শ্বাস লইও না, ত তাহা হইবার নয়। নাসিকার শ্বাস-প্রশ্বাসের অভিমান নাই তাহা হইলেও নাক অনুক্ষণ শ্বাস নেই। সক্রেটিস্ সম্বন্ধে এক মজার গল্প আছে। সক্রেটিসের নাক ছিল চেপ্টা। লোকে তাঁহাকে দেখিয়া হাসিত। কিন্তু রসিক সক্রেটিস বলিতেন, "আমারই নাক সুন্দর। যে নাকের নাসারন্ধ্র বড় তা দিয়ে পেট ভরে বাতাস নেওয়া যায়। তা-ই তা সবচেয়ে সুন্দর।" তাৎপর্য, নাকের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অভিমান নাই, কিন্তু আসক্তি আছে। সত্ত্বগুণের প্রতিও এইরূপ আসক্তি জন্মে। যথা জীবে-দয়া। এই গুণ অত্যন্ত দরকার। কিন্তু উহার আসক্তি হইতে দূরে থাকার সামর্থ্য হওয়া চাই। জীবে-দয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহার জন্য আসক্তি যেন না হয়।

সন্ত পুরুষেরা সত্ত্বগুণের প্রভাবেই অন্যের পথপ্রদর্শক হন। জীবে-দয়া হেতু তাঁহাদের দেহ সার্বজনিক হইয়া যায়। মাছিরা যেমন গুড় ছাকিয়া ধরে, তেমনই সারা জগৎ সাধুকে ভালবাসার আবরণে ঢাকে। সাধুদের মধ্যে প্রেমের এতটা বিকাশ লাভ হয় যে সমস্ত দুনিয়া তাঁহাদের ভাল-বাসিতে আরম্ভ করে। সাধু নিজ দেহের আসক্তি ছাড়েন, কিন্তু সমস্ত জগতের আসক্তি তাঁহার প্রতি আসিয়া জড় হয়। সমস্ত জগৎ তাঁহার দেহের ভাবনা ভাবিতে থাকে। কিন্তু এই আসক্তিও সন্তদের দূর করা চাই। এই যে সারা জগতের প্রেম, এই যে মহান্ ফল তাহা হইতে আত্মাকে পৃথক রাখা চাই। 'আমি কোন বিশেষ ব্যক্তি, এরূপ যেন কখনও তাঁহার মনে না আসে। এইভাবে সত্ত্বগুণকে হজম করিয়া ফেলিতে হইবে।

প্রথমে অহঙ্কার জয় কর, পরে আসক্তি। সাতত্য দ্বারা অহঙ্কার জয় করা যাইবে। ফলাসক্তি ছাড়িয়া সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রাপ্ত ফল পর্যন্ত ঈশ্বরার্পণ

করিলে আসক্তি জয় করা সম্ভব হইবে। জীবনে যখন সত্ত্বগুণ স্থির হইয়া যায় তখন ফল কখনও সিদ্ধিরূপে কখনও বা কীর্তিরূপে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ ফলকেও তুচ্ছজ্ঞান করিতে হইবে। আমগাছ একটি ফলও নিজে খায় না। ফল যতই হউক, যতই সুমধুর হউক, ফল খাওয়া অপেক্ষা না খাওয়াই তাহার কাছে অধিক মধুর লাগে। ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ অধিকতর মধুর।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জীবনের সকল পুণ্যফলে প্রাপ্ত স্বর্গসুখরূপী ফলও শেষ পর্যন্ত পায়ে ঠেলিলেন। জীবনের সকল ত্যাগের উপর তিনি যেন মুকুট স্থাপন করিলেন। সেই মধুর ফল আস্বাদনের অধিকার তাঁহার ছিল। কিন্তু তিনি যদি তাহা করিতেন তবে সবই শেষ হইয়া যাইত। **ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি**—এই চক্রে পুনরায় তিনি পড়িতেন। ধর্মরাজের এই ত্যাগ কত বিরাট! উহা সর্বদা আমার চোখের সামনে ভাসে। এইভাবে সত্ত্বগুণের সতত আচরণ দ্বারা উহার অহঙ্কার জয় করিয়া লইতে হইবে। নির্লিপ্ত থাকিয়া সকল ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া উহার আসক্তি হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। তখন বলা যাইবে যে সত্ত্বগুণের উপর বিজয় লাভ হইয়াছে।

॥ ৮১ ॥ শেষ কথা ঃ আত্মজ্ঞান ও ভক্তির আশ্রয়

এবার শেষ কথায় আসি। আপনি সত্ত্বগুণী হইয়াছেন। অহঙ্কার জয় করিয়াছেন, ফলাসক্তি ছাড়িয়াছেন। সবই ঠিক। তবুও যতদিন এই শরীর আছে ততদিন মধ্যে মধ্যে রজ-তমের আক্রমণ চলিতেই থাকিবে। ক্ষণকালের জন্য মনে হইতে পারে যে এই সব গুণ আমি জয় করিয়া লইয়াছি। কিন্তু তাহারা আবার সবেগে আসিবে। তাই সতত জাগ্রত থাকা চাই। সমুদ্রের জল বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া যেমন খাড়ি সৃষ্টি করে তেমনি রজ-তমের প্রবল প্রবাহ মনোভূমিতে প্রবেশ করিয়া খাড়ি তৈরি করে। অতএব সামান্য ছিদ্রও থাকিতে দিবেন না। পাকা ব্যবস্থা ও শক্ত পাহারা বসান। কিন্তু যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হউক না কেন যতদিন আত্মজ্ঞান না হইবে, আত্মদর্শন না হইবে, ততদিন ভয় আছেই। অতএব যে ভাবেই হউক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

আত্মজ্ঞান কেবল জাগৃতির প্রচেষ্টার দ্বারা লাভ হইবে না। তবে কিভাবে হইবে? অভ্যাসের দ্বারা হইবে? না। উহার একটিই উপায় আছে। তাহা হইল—অকপট হৃদয়ে প্রেমপূর্বক ভগবানকে ভক্তি করা। রজ ও তম গুণ জয় করিলেন। সত্ত্বগুণকে স্থির করিয়া উহার ফলাসক্তিও জয় করিয়া লইলেন। কিন্তু ইহাতেই কাজ হইয়া গেল তাহা নয়। যতক্ষণ আত্মজ্ঞানের উদয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ হইবে না। শেষ পর্যন্ত সেই ভগবৎ কৃপা চাই-ই। অকপট আন্তরিক ভক্তি দ্বারা তাঁহার কৃপা লাভের যোগ্য হইতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এই অধ্যায়ের শেষে অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন আর তাহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—"অত্যন্ত একাগ্র চিত্তে নিষ্কামভাবে আমার ভক্তি কর, আমার সেবা কর। এভাবে যে আমার সেবা করে সে এ মায়ার ওপারে যেতে সক্ষম হয়। নচেৎ এই গহন মায়া পার হওয়া যায় না।" ইহা ভক্তির সরল পথ। আত্মজ্ঞান লাভের ইহাই একমাত্র পথ।

রবিবার, ৩২-৫-১৯৩২

পঞ্চদশ অধ্যায়

পূর্ণযোগ ঃ সর্বত্র পুরুষোত্তম-দর্শন

॥ ৮২ ॥ প্রযত্নমার্গ হইতে ভক্তি ভিন্ন নয়

বন্ধুগণ,

আজ এক অর্থে আমরা গীতার এক সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সকল বিচার পরিপূর্ণ হইয়াছে। ষোড়শ-সপ্তদশ অধ্যায় পরিশিষ্টস্বরূপ আর অষ্টাদশ অধ্যায় উপসংহার। তাই ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে ইহাকে 'শাস্ত্র' সংজ্ঞা দিয়াছেন।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তংময়ানঘ

এইকথা ভগবান শেষে বলিয়াছেন। এই অধ্যায় অন্তিম অধ্যায় বলিয়াই ভগবান একথা বলিয়াছেন তাহা নহে। বরং এই জন্য যে এপর্যন্ত জীবনের যে শাস্ত্র, যে সিদ্ধান্ত নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা এখানে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই অধ্যায়ে পরমার্থ-বিচার পূর্ণ হইয়াছে। বেদের সম্পূর্ণ সার ইহাতে আসিয়া গিয়াছে। মানুষের মধ্যে পরমার্থের চেতনা সঞ্চার করাই বেদের কার্য। তাহা এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে বলিয়া ইহা 'বেদের সার'—এই গৌরবপূর্ণ পদবী লাভ করিয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমরা দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া দেখার আবশ্যকতা দেখিয়াছি। চতুর্দশে তৎসম্পর্কীয় প্রযত্নবাদের কিছুটা বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। নিগ্রহ দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণের বিকাশ করিয়া উহার আসক্তি জয় করিতে হইবে, তারপর উহার ফলও ত্যাগ করিতে হইবে। এইভাবে প্রযত্ন করিয়া যাইতে হইবে। অবশেষে বলা হইয়াছে, এইসব প্রযত্নের পূর্ণ সাফল্যের জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করা চাই এবং ভক্তি ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।

কিন্তু ভক্তি-মার্গ প্রযত্ন-মার্গ হইতে ভিন্ন নয়। একথা বুঝাইবার জন্যই পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরম্ভে সংসারকে এক মহান্ বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই বৃক্ষে ত্রিগুণে পুষ্ট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা রহিয়াছে। সূচনাতেই

বলা হইয়াছে যে অনাসক্তি ও বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা এই বৃক্ষ ছেদন করিতে হইবে। ইহা স্পষ্ট যে, পূর্ব অধ্যায়ে যে সাধনমার্গের কথা বলা হইয়াছে এখানে আরম্ভেই তার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। রজ-তমকে মিটাইয়া সত্ত্বগুণের পুষ্টি দ্বারা বিকাশ লাভ করিতে হইবে। এক কাজ বিনাশক, আর এক বিধায়ক। দুইয়ে মিলিয়া পথ একই। আগাছা সাফ করা আর বীজ বোনা একই ক্রিয়ার দুই অঙ্গ, ইহাও সেইরূপ।

রামায়ণে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এই তিন ভাই আছে। কুম্ভকর্ণ তমোগুণ, রাবণ রজোগুণ, বিভীষণ সত্ত্বগুণ। আমাদের মধ্যেও এই তিন গুণের রামায়ণ রচনা চলিতেছে। এই রামায়ণে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের নাশ ত বিহিতই, থাকিল কেবল বিভীষণতত্ত্ব। যদি উহা হরিচরণাশ্রয়ী হয় তবে উন্নতির সহায়ক ও পোষক হইবে। সেই জন্য তাহা গ্রহণীয়। চতুর্দশ অধ্যায়ে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরম্ভেও পুনরায় সেই কথা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। সত্ত্ব-রজ-তমে ভরা সংসারকে অসঙ্গ-রূপ অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেল। রজ-তমের নিরোধ কর। সত্ত্বগুণের বিকাশ করিয়া পবিত্র হও এবং উহার আসক্তি জয় করিয়া অলিপ্ত থাক; কমলের এই আদর্শ ভগবদ্গীতা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে জীবনের আদর্শ বস্তুগুলিকে সর্বোত্তম বস্তুগুলির সহিত কমলের তুলনা করা হইয়াছে। কমল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। সর্বোত্তম চিন্তা প্রকাশের চিহ্ন কমল। কমল নির্মল ও পবিত্র হইয়াও অলিপ্ত। পবিত্রতা ও অলিপ্ততা এই দ্বিবিধ গুণ কমলে বিদ্যমান। ভগবানের বিভিন্ন অবয়বের উপমা কমলের সহিত দেওয়া হয়—নেত্রকমল, পদ-কমল, কর-কমল, মুখ-কমল, নাভি-কমল, হৃদয়-কমল, শির-কমল, ইত্যাদি। যেখানে সৌন্দর্য ও পবিত্রতা সেখানেই অলিপ্ততা একথাই আমাদের মনে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত সাধনকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্যই লিখিত হইয়াছে। প্রযত্নের সহিত আত্মজ্ঞান ও ভক্তি যখন মিলিত হয় তখন পূর্ণতা আসে। ভক্তি প্রযত্ন-মার্গেরই এক অংশ। আত্মজ্ঞান ও ভক্তি ঐ সাধনারই অঙ্গ। ঋষি বেদে বলিতেছেন:

"যো জাগার তং ঋচঃ কাময়ন্তে,
যো জাগার তমু সামানি যন্তি"।

"যে জাগ্রত বেদ তাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে দেখা করতে আসে।" অর্থাৎ যে জাগ্রত বেদনারায়ণ তাহার কাছে আসে। তাহার কাছে জ্ঞান আসে, ভক্তি আসে। প্রযত্নমার্গ হইতে ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন নয়। এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, এই দুই তত্ত্বের প্রযত্নেই মাধুর্য আনিয়া দেয়। অতএব একাগ্রচিত্তে ভক্তি ও জ্ঞানের এই স্বরূপ শ্রবণ করুন।

॥ ৮৩ ॥ ভক্তিদ্বারা প্রযত্ন সহজ হয়

আমরা জীবনকে টুকরা করিতে পারি না। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে আমরা পৃথক করিতে পারি না, আর ইহারা পৃথক নয়ও। উদাহরণার্থ এই জেলের রান্নার কাজ ধরুন। পাঁচ-সাত শত লোকের রান্নার কাজ আমাদের কিছু লোকে নির্বাহ করে। যদি ইহাদের মধ্যে এমন কোন লোক রান্না করিতে যায় যাহার রান্নার কোন জ্ঞান নাই তবে রান্না খারাপ হইবে। রুটি হয় কাঁচা থাকিবে, নয় পুড়িয়া যাইবে। ধরিয়া লইতেছি রান্নায় সে পটু। কিন্তু ঐ কাজে যদি তাহার মন না থাকে, ভক্তিভাব না থাকে,—আমার ভাইয়েরা তথা স্বয়ং নারায়ণ এই রুটি খাইবেন, তাই যত ভাল পারি বানাইব—ইহা প্রভুরই সেবা। এই ভাব যদি তাহার হৃদয়ে না থাকে তবে রান্নার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ঐ কাজের সে উপযুক্ত একথা সিদ্ধ হইবে না। এই রান্নার কাজে যেমন জ্ঞান চাই, তেমনই প্রেমও চাই। ভক্তিতত্ত্বের রস হৃদয়ে না থাকিলে রান্না রুচিকর হইবার নয়। সেইজন্য মা ছাড়া এ কাজ ঠিক ঠিক হয় না। মা ছাড়া আর কে এ কাজ এমন মন দিয়া, প্রেম ঢালিয়া করিবে? তা ছাড়া এ কাজের জন্য তপস্যা দরকার। তাপ সহ্য করা ছাড়া, কষ্ট সহন করা ছাড়া এ কাজ কি করিয়া হইবে? অর্থাৎ দেখা যাইতেছে, যে কোন কার্যে প্রেম, জ্ঞান ও কর্ম এই তিন বস্তু চাই। জীবনের সকল কর্ম এই তিন গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তেপয়ার এক পা ভাঙ্গিয়া গেলে উহা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। তিন পা-ই চাই। উহার নামের মধ্যেই উহার রূপ নিহিত। জীবনের অবস্থাও সেইরূপ। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম অর্থাৎ শ্রম-সাতত্য, এই তিন বিষয় জীবনের

তিনটি পায়া। এই তিন স্তম্ভের উপর জীবনরূপী দ্বারকা স্থাপন করিতে হইবে। এই তিন পা মিলিয়া একই বস্তু হয়। তেপায়ার দৃষ্টান্ত অক্ষরে অক্ষরে খাটে। তর্ক দ্বারা আপনারা ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মকে আলাদা করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুত উহাদের আলাদা করা যায় না। তিনটি মিলিয়া একই বিশাল বস্তু গড়িয়া উঠে।

তাহা হইলেও একথা বলা যায় না যে ভক্তির বিশেষ গুণ নাই। যে কোন কর্মে ভক্তি ভাবের সংযোগ হইলে তাহা সহজ মনে হইবে। সহজ মনে হওয়ার অর্থ এই নয় যে কষ্ট হইবে না। কিন্তু সে কষ্ট কষ্ট মনে হইবে না। কষ্ট আনন্দরূপ মনে হইবে। শূল তখন ফুল মনে হইবে। ভক্তিমার্গ সরল একথার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই যে ভক্তির কারণে কর্মের বোঝা হালকা হইয়া যায়। কর্মের কঠিনতা চলিয়া যায়। যতই কাজ করা হউক, মনে হইবে কিছুই যেন করা হয় নাই। ভগবান যীশু এক জায়গায় বলিয়াছেন, "উপোস যদি কর, দেখবে, উপোস যেন তোমার চেহারায় না দেখা যায়। গালে যেন সুগন্ধ লেপন করা হয়েছে এমন স্নিগ্ধ, ও প্রফুল্ল দেখানো চাই। উপোসে কষ্ট হচ্ছে এরকম যেন না দেখায়।" সারাংশ, আমাদের বৃত্তি এমন ভক্তিময় হওয়া চাই যে কষ্টের কথা যেন মনেই না হয়। আমরা বলি, "অমুক বীর দেশপ্রেমিক হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছে।" সুধন্বা (ফুটন্ত) তেলের কড়াইয়ে বসিয়া হাসিতেছিল। মুখে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, গোবিন্দের নাম লইতেছিল। ইহার অর্থ এই যে অশেষ কষ্ট হইলেও ভক্তিপ্রভাবে তাহা টের পাওয়া যায় না। জলের উপর ভাসমান নৌকা ঠেলা কঠিন নয়। কিন্তু তাহা যদি মাটি বা পাথরের উপর দিয়া টানিয়া লইতে হয় তাহা কতই না পরিশ্রম সাধ্য! নৌকার নীচে জল থাকিলে আমরা সহজেই তাহা বাহিয়া পার হইতে পারি। সেইরূপ আমাদের জীবন-নৌকার তলায় যদি ভক্তিরূপ জল থাকে ত তাহা আনন্দে বাহিয়া নেওয়া যাইবে। কিন্তু জীবন যদি শুষ্ক হয়, রাস্তায় যদি বালিচর পড়ে কাঁকর-পাথর পড়ে, খানা-খন্দ পড়ে তবে নৌকা টানিয়া নেওয়া অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। ভক্তিতত্ত্ব আমাদের জীবনতরীকে জলের ন্যায় সহজ-গতি করিয়া দেয়।

ভক্তিমার্গ দ্বারা সাধনার পথ সুগম হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান ছাড়া

বরাবরের মত ত্রিগুণের পরপারে যাওয়ার আশা নাই। তবে আত্মজ্ঞানের সাধন কি? সত্ত্ব-সাতত্য দ্বারা সত্ত্বগুণ আত্মসাৎ করিয়া, উহার অহঙ্কার ও ফলাসক্তি ভক্তির দ্বারা জয় করার প্রযত্ন হইতেছে সেই সাধন। এই সাধনার দ্বারা সতত অখণ্ড প্রযত্ন করিতে করিতে একদিন আত্মদর্শন হইবে। সে পর্যন্ত আমাদের প্রযত্নের বিরাম হইতে পারে না। ইহা পরম পুরুষার্থের কথা। আত্মদর্শন কোন হাসি-খেলার ব্যাপার নয়। রাস্তায় বাহির হইলাম আর পথে আত্মদর্শন হইয়া গেল এরূপ নয়। ইহার জন্য নিরন্তর সাধনার ধারা প্রবাহিত রাখা চাই। পরমার্থমার্গের শর্তই হইল—আমি নিরাশাকে তিলমাত্র স্থান দিব না, ক্ষণেকের জন্যও নিরাশ হইয়া বসিয়া যাইব না, ইহা ছাড়া পরমার্থের দ্বিতীয় কোন রাস্তা নাই। কখনও সাধক ক্লান্ত হইয়া পড়ে আর তাহার মুখ হইতে বাহির হয়—

"তুম কারন তপ সংযম কিরিয়া
কহো কহাঁ লোঁ কীজৈ।

"ভগবান, আমি তোমার জন্য আর কতকাল তপস্যা করতে থাকব?" কিন্তু এরূপ উক্তি গৌণ। তপ ও সংযমে আমরা এমন অভ্যস্ত হইয়া যাইব যে তাহা যেন আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়। 'কতকাল সাধনা করব', এই কথা ভক্তিমার্গে শোভা পায় না। ভক্তি কখনও অধীরভাব নিরাশভাব আসিতে দেয় না। জীবনে রসহীন ক্লান্তির ভাব যেন না আসে। ভক্তিতে যাহাতে উত্তরোত্তর অধিক উল্লাস ও উৎসাহ জন্মে তাহার জন্য অতি উত্তম বিচার এই অধ্যায়ে উপস্থিত করা হইয়াছে।

॥ ৮৪ ॥ সেবার ত্রিপুটী: সেব্য, সেবক, সেবা-সাধন

এই বিশ্বে অনন্ত বস্তু আমরা দেখিতে পাই। এই সব বস্তু তিন ভাগে বিভক্ত করুন। সকালে উঠিয়া ভক্ত তিনটি বস্তু চোখের সামনে দেখে। প্রথমে তাহার মন যায় ভগবানের দিকে। তারপরে সে করে ভগবানের পূজার আয়োজন। আমি সেবক ভক্ত, তিনি সেব্য ভগবান—স্বামী। এই দুই বস্তু সর্বদা তাহার সামনে থাকে। বাকী থাকে অবশিষ্ট সৃষ্টি। উহা তাহার পূজার সাধন। এই উদ্দেশ্যেই ফুল, চন্দন, ধূপ,

দীপ ইত্যাদি যাবৎ সৃষ্টি। বস্তু তিনটি। সেবক ভক্ত, সেব্য পরমাত্মা, আর সেবার সাধনরূপ এই সৃষ্টি। এই শিক্ষাই এই অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে সেবক কোন মূর্তি বিশেষের পূজা করে তাহার নিকট সৃষ্টির সব কিছু পূজার সাধন বলিয়া মনে হয় না। সে বাগান হইতে কিছু ফুল তুলিয়া আনে, ধূপ জোগাড় করে, কিছু নৈবেদ্য সংগ্রহ করে। উপকরণ বাছাই করিয়া লইতে তাহার ভাল লাগে। কিন্তু পঞ্চদশ অধ্যায় যে বিরাট বিষয়ের শিক্ষা দিতে চায় তাহাতে বাছাই করার দরকার হয় না। যাহা কিছু তপস্যার সাধন, কর্মের সাধন, সে সবই পরমেশ্বরের সেবার সাধন। তার কোনটিকে বলি ফুল, কোনটিকে চন্দন আর কোনটিকে বা নৈবেদ্য। এই প্রকারে যত কর্ম আছে সব কিছু পূজাদ্রব্যে পরিণত করিতে হইবে। এইরূপ এই দৃষ্টি। জগতে কেবল তিনটি বস্তু আছে। গীতা যে বৈরাগ্যময় সাধনমার্গ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিতে চায় সেই মার্গকে গীতা ভক্তিময় রূপ দিতেছে। তাহা হইতে কর্মত্ব দূর করিয়া তাহাতে সুলভতা আনিয়া দিতেছে।

আশ্রমে কাহারও উপর অধিক কাজ পড়িলে, 'এত কাজ আমি কেন করব' এ ভাব তাহার মনে কখনও আসে না। এই কথার গভীর সার বর্তমান। দেবার্চনা কারীকে যদি দুই ঘণ্টার স্থলে চার ঘণ্টা পূজা করিতে হয় তবে কি সে বিরক্ত হইয়া বলিবে—"হায় হায়! আজ চার ঘণ্টা পূজো করতে হয়েছে!" উপরন্তু উহাতে তাহার আরও বেশী আনন্দ হইবে। আশ্রমে এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এই অনুভব জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আসা চাই। জীবন সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। আর ঐ যে সেব্য পুরুষোত্তম, তাঁহার সেবার জন্য অনুক্ষণ প্রযত্নশীল আমি 'অক্ষর পুরুষ'। অক্ষর পুরুষ মানে শ্রান্তি যে কি বস্তু তাহা যে জীবনে জানে না; সৃষ্টির শুরু হইতে যে সেবা করিয়া আসিয়াছে এরূপ সনাতন সেবক। সে যেন রামের কাছে করজোড়ে সদা দণ্ডায়মান হনুমান। আলস্য কি তাহা সে জানে না। হনুমানের মতই এই চিরঞ্জীব সেবক সর্বদা তৎপর ও আজ্ঞাবহ।

এরূপ আজন্মসেবকের নামই অক্ষর পুরুষ। 'পরমাত্মা' জীবন্ত সত্তা আর আমি তাঁর সদাপ্রস্তুত সেবক। প্রভু আছেন ত আমিও আছি।

সেবা গ্রহণ করিতে-করিতে তিনি হাঁপাইয়া উঠেন, কি সেবা করিতে করিতে আমি হাঁপাইয়া উঠি। তিনি দশ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন ত আমারও দশবার জন্ম হইয়াছে। তিনি রাম হইলেন ত আমি হনুমান, কৃষ্ণ হইলেন ত আমি উদ্ধব। যত বার তাঁহার অবতার আমারও ততবার। চলুক এই মধুর প্রতিযোগীতা। এই ভাবে যুগ যুগ ধরিয়া পরমেশ্বরের যে সেবা করে, কখনও যাহার নাশ নাই। এরূপ যে জীব, সে-ই 'অক্ষর পুরুষ।' তিনি পুরুষোত্তম স্বামী আর আমি তাঁহার দাস, সেবক। এই ভাবনা সর্বদা হৃদয়ে পোষণ করা চাই। আর এই যে সৃষ্টি যাহা মুহূর্তে মুহূর্তে বদলাইতেছে, অনন্ত বেশ ধারণ করিতেছে উহাকে পূজার সাধন, সেবার সাধন বানাইতে হইবে। প্রতিটি ক্রিয়া যেন পুরুষোত্তমেরই পূজা।

সেব্য পরমাত্মা পুরুষোত্তম ; সেবক জীব অক্ষর-পুরুষ। কিন্তু সাধনরূপ এই সৃষ্টি ক্ষর। এই 'ক্ষর' হওয়ার মধ্যে বহু অর্থ নিহিত। সৃষ্টির ইহা দোষ নয়, ভূষণ। ইহা দ্বারা সৃষ্টিতে নিত্য-নূতন নবীনতা আসে। গত দিনের ফুলে আজ কাজ হইবে না। উহা নির্মাল্য হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টি যে নাশবান ইহা খুবই ভাগ্যের কথা। ইহা সেবার বৈভব। পূজার জন্য রোজ নূতন নূতন ফুল পাওয়া যায়। তেমনি এই শরীরও নব নব রূপে পরমেশ্বরের সেবা করিবে। আপন সাধনসমূহকে নিত্যনূতন রূপ দিব ও তদ্দ্বারা তাঁহার পূজা করিব। নশ্বরতার মধ্যেই সৌন্দর্য বিদ্যমান।

আজিকার চন্দ্রের কলা আর আগামী কালের চন্দ্রকলা এক নয়। চন্দ্রের লাবণ্য নিত্যনূতন। দ্বিতীয়ার বর্ধিষ্ণু চন্দ্র-কলা দেখিলে কতই না আনন্দ হয়! দ্বিতীয়ার এই চাঁদ শঙ্করের ললাটে শোভা পায়। অষ্টমীর চন্দ্রের সৌন্দর্য আর এক প্রকার। অষ্টমীর আকাশে থোকা থোকা মোতি ঝিকমিক্ করে। পূর্ণিমার চন্দ্রের তেজে তারকা দেখা যায় না। পূর্ণিমায় পরমেশ্বরের মুখচন্দ্রের প্রকাশ। অমাবস্যার আনন্দ অতি নিবিড়। অমাবস্যার রাত্রি কেমন নিস্তব্ধ শান্ত! চন্দ্রের ম্লানকারী রশ্মি থাকে না বলিয়া ছোটবড় অগণিত তারা পূর্ণ স্বাধীনভাবে চমকাইতে থাকে। অমাবস্যার রাত্রে স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিলাস দেখা যায়। আপন তেজের গর্ব প্রদর্শনকারী চন্দ্র আজ সেখানে নাই। প্রকাশদাতা সূর্যের সহিত

সেদিন সে এক হইয়া গিয়াছে। পরমেশ্বরের সহিত সে মিলিয়া গিয়াছে। জীব আত্ম-অর্পণ করিয়া জগৎকে কিভাবে নির্ভয় করিয়া দিতে পারে এই দিনটি যেন তাহারই সাক্ষ্য। চন্দ্রের স্বরূপ ক্ষর, পরিবর্তনশীল। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাহা আনন্দ দেয়।

সৃষ্টির নশ্বরতাই উহার অমরতা। সৃষ্টির রূপ উচ্ছল হইয়া বহিতেছে। এই রূপ-গঙ্গা যদি প্রবাহিত হইতে না থাকে ত তাহা ডোবা হইয়া যাইবে। নদীর জল অখণ্ড বহিয়া চলে। উহা সর্বদা বদলাইতে থাকে। এক বিন্দু যায় দ্বিতীয় বিন্দু আসে। এইভাবে জল জীবন্ত থাকে। বস্তুর মধ্যে যে আনন্দের উপলব্ধি হয় তাহার কারণ উহার নবীনতা। গ্রীষ্ম ঋতুতে ভগবানকে নানারূপ ফল নিবেদন করা হয়। বর্ষায় সবুজ দূর্বা, শরতে রমণীয় কমল। যে ঋতুতে যে ফল-ফুল তাহা দ্বারা ভগবানের পূজা করা হয়। তাই ত ঐ পূজা শুভ্র ও নিত্যনূতন মনে হয়। উহাতে কখনও অরুচি জন্মে না। শিশুকে যখন 'ক' লিখিয়া দিয়া বলা হয়, "মকৃশ কর, মোটা করে লেখ।" তখন ঐ কাজে তাহার অরুচি ধরিয়া যায়। সে ভাবিয়া পায় না অক্ষরটাকে কেন মোটা করা হয়। সে তখন কলম বাঁকা করিয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি অক্ষর মোটা করিয়া দেয়। কিন্তু পরে সে নূতন অক্ষর, সমগ্র বর্ণমালা শেখে। কত রকমের বই পড়ে। সাহিত্যের নানাবিধ রচনার রসাস্বাদন করে। তখন সে অপার আনন্দ লাভ করে সেবাক্ষেত্রের কথাও তাহাই। সাধনের নিত্য নবীনতার দরুণ সেবার আগ্রহ বাড়িতে থাকে: সেবাবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে।

সৃষ্টির এই নশ্বরতা নিত্যনূতন ফুল ফোটায়। গ্রামের কাছে শ্মশান আছে তাই গ্রামের রমণীয়তা বজায় আছে। পুরাতন লোক চলিয়া যাইতেছে, নূতন শিশু জন্মিতেছে। সৃষ্টি নিত্য নবীনরূপে আগাইয়া চলিয়াছে। বাহিরের ঐ শ্মশান যদি বাতিল করিয়া দাও ত তাহা ঘরে আসিয়া বসিবে। সেই একই লোককে একই রূপে দেখিয়া দেখিয়া তোমার অরুচি ধরিবে। গ্রীষ্মকালে গরম পড়ে। পৃথিবী তপ্ত হয়। তাহাতে তুমি উত্যক্ত হও না। কেননা ঐ রূপ বদলাইবে। বর্ষার সুখ উপলব্ধির জন্য গ্রীষ্মের জ্বালা-পোড়া আবশ্যক। জমি যদি খুব উত্তপ্ত না হয়, ত বৃষ্টি পড়িতেই কাদা

হইয়া যাইবে। আর তৃণধান্য তাহাতে শোভা পাইবে না। গ্রীষ্মকালে এক দিন আমি ঘুরিতেছিলাম। মাথায় রৌদ্র লাগিতেছিল। বড় আনন্দ হইতেছিল। এক বন্ধু বলিল, "মাথা গরম হয়ে যাবে, কষ্ট পাবে।" উত্তরে বলিলাম, "নীচে মাটিও ত তপ্ত হচ্ছে, মাটির এই পুতুলটাকেও তপ্ত হতে দাও।" মাথা উত্তপ্ত আর উহার উপরে বর্ষার ধারা, কী আনন্দ! কিন্তু যে গ্রীষ্মে রোদ ভোগ করে না সে বৃষ্টি হইলে পুস্তকে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া থাকিবে। নিজের ঘরের ঐ কামরায়, ঐ কবরেই বসিয়া থাকিবে। বাহিরের এই বিশাল অভিষেক পাত্রের নীচে দাঁড়াইয়া আনন্দে নাচিবে না। কিন্তু আমাদের ঐ মহর্ষি মনু অত্যন্ত রসিক ও প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন। স্মৃতিতে তিনি লিখিয়াছেন, "বর্ষা এলে ছুটি দিয়ে দাও।" বর্ষা পড়িতেছে তখন কি আশ্রমে বসিয়া বসিয়া পাঠ আবৃত্তি করিবে? বৃষ্টির সময় ত নাচিবে, গাহিবে, সৃষ্টির সহিত একরূপ হইয়া যাইবে। বর্ষাকালে পৃথিবী ও আকাশ পরস্পর মিলিত হয়। সেই মনোরম দৃশ্য কেমন আনন্দদায়ক! প্রকৃতি স্বয়ং আমাদের শিক্ষা দান করিতেছে।

সারাংশ, সৃষ্টির ক্ষরতা, নশ্বরতার অর্থ সাধন সামগ্রীর নবীনতা। এই ভাবে নিত্য নব প্রসবিনী সাধনদাত্রী সৃষ্টি, সেবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাড়ানো সনাতন সেবক, আর ঐ সেব্য পরমাত্মা। এবার চলুক খেলা। পরমপুরুষ পুরুষোত্তম নূতন নূতন সেবার সাধন দিয়া প্রেমভরে আমাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতেছেন। নানা প্রকারের উপকরণ দিয়া তিনি আমাদের খেলাইতেছেন। নানা প্রকারের প্রয়োগ আমাদের দ্বারা করাইতেছেন। যদি আমাদের জীবনে এই দৃষ্টি আসে তবে কী আনন্দই না লাভ হয়!

॥ ৮৫ ॥ অহংশূন্য সেবাই ভক্তি

গীতা চায়, আমাদের প্রত্যেক কার্য ভক্তিময় হউক। আমরা যে ঘণ্টা আধ-ঘণ্টা ভগবানের পূজা করি, তাহা ত ঠিকই। সকাল-সন্ধ্যায় সূর্য-কিরণ যখন নিজ বিচিত্র রঙ ছড়াইয়া দেয় তখন চিত্ত স্থির করিয়া কিছু সময়ের জন্য সংসার ভুলিয়া যাওয়া ও অনন্তের চিন্তা করা এক উৎকৃষ্ট ভাব। এই সদাচার কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু এতটুকুতে গীতার

সন্তোষ নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত কাজই করি না কেন সে সবই ভগবানের পূজার জন্য করা চাই। নাইতে, খাইতে, ঝাড়ু দিতে তাঁহাকে স্মরণ করা চাই। ঝাড়ু দেওয়ার সময় মনে করিতে হইবে আমরা আমাদের প্রভুর, জীবন-দেবতার আঙ্গিনা ঝাঁট দিতেছি। আমাদের সমস্ত কর্ম এই-ভাবে পূজাকর্ম হওয়া চাই। এই দৃষ্টি আসিলে আচরণে কত যে ব্যবধান দেখা দিবে তাহা বুঝিতে পারিবেন। পূজার জন্য কত সতর্কতার সঙ্গে ফুল তুলি, কত না যত্নে তাহা ফুলদানিতে রাখি। চাপ না লাগে, ম্লান হইয়া না যায় সেদিকে কত না দৃষ্টি থাকে! পাছে অপবিত্র হয় এই ভয়ে নাকের কাছে পর্যন্ত নিই না। জীবনের দৈনন্দিন সকল কর্মে সেইরূপ দৃষ্টি আসা চাই। আমার এই গ্রামে প্রতিবেশীরূপে আমার নারায়ণ আমার প্রভুই ত বাস করেন! এ গ্রাম আমি পরিষ্কার করিব, পরিচ্ছন্ন রাখিব। গীতা আমাদের এই দৃষ্টির অধিকারী করিতে চায়। আমাদের সকল কর্ম প্রভু-পূজা হইয়া উঠুক—ইহাই গীতার পরম আগ্রহ। গীতার ন্যায় গ্রন্থরাজের এক-আধ ঘণ্টার পূজায় তৃপ্তি নাই। সমগ্র জীবন হরিময় হউক, পূজারূপ হউক, ইহাই গীতার আকুল আগ্রহ।

গীতা পুরুষোত্তম-যোগ বর্ণনা করিয়া কর্মময় জীবনে পরিপূর্ণতা আনিয়া দিতেছে। তিনি সেব্য পুরুষোত্তম, আমি তাঁহার সেবক, আর এই সারা সৃষ্টি তাহার সেবার সাধন। এই দৃষ্টি যদি একবার লাভ হয় ত আর কি চাই? তুকারাম বলিয়াছেন:

ঝালিয়া দর্শন করীন মী সেবা।
আণিক কাঁহীঁ দেবা ন লগে তুজেঁ ॥

"দর্শন হওয়ার পর তোমার সেবা করে যাব, আমার আর কিছু চাই না"

তখন আমাদের দ্বারা কেবল অখণ্ড সেবা-ই হইতে থাকিবে। 'আমি' বলিয়া তখন আর কিছু থাকিবে না। 'আমি-আমার' ভাব মিটিয়া যাইবে। যাহা কিছু হইবে সব ভগবানের নিমিত্ত। পরার্থে জীবনধারণ করা ছাড়া অন্য কিছুই থাকিবে না। আমি হইতে আমিত্ব দূর করিয়া জীবন হরিপরায়ণ করিতে হইবে, ভক্তিময় করিতে হইবে, একথাই গীতা বার

বার বলিতেছে। সেব্য পরমাত্মা, সেবক আমি, আর সাধনরূপ এই সৃষ্টি। পরিগ্রহের নামই নাই। জীবনে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তাই আর থাকে না।

॥ ৮৬ ॥ জ্ঞান-লক্ষণ : আমি পুরুষ, তিনি পুরুষ, ইহাও পুরুষ

এইভাবে কর্মে যে ভক্তি মিলাইতে হয় তাহা এ পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু জ্ঞানের পুটও তাহাতে আবশ্যক। তাহা ছাড়া গীতার সন্তোষ নাই। কিন্তু উহার অর্থ এ নয় যে এই তিন বস্তু ভিন্ন। বলার প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করা হয় এইমাত্র। কর্ম মানেই ভক্তি। ভক্তি কিছু পৃথক ভাবে আনিয়া কর্মের সহিত মিশাইতে হয় না। জ্ঞানের সম্বন্ধেও সেই কথা। এই জ্ঞান লাভের উপায় কি? গীতা বলে, '**সর্বত্র পুরুষ-দর্শন দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়।**' তুমি সেবাকারী সনাতন সেবক— তুমি সেবা-পুরুষ, তিনি পুরুষোত্তম সেব্য-পুরুষ, আর নানারূপধারিণী নানাসাধন-দাত্রী এই প্রবাহময়ী সৃষ্টি, ইহাও পুরুষই!

এই দৃষ্টি রাখার অর্থ কি? সর্বত্র ত্রুটি-রহিত নির্মল সেবাভাব রাখা। তোমার পায়ের জুতা মচ্‌মচ্‌ করিতেছে, তাহাতে একটু তেল লাগাও। তাহাতেও পরমাত্মার অংশ রহিয়াছে। ঐ জুতা ঠিকমত রাখ। সেবার সাধন ঐ চরখা। তাহাতে তেল দাও। দেখ উহা শব্দ করিতেছে, "নেতি নেতি"—সূতা কাটিব না বলিতেছে। ঐ চরখা, ঐ সেবা-সাধন—উহাও পুরুষই। উহার মাল উহার ঐ পৈতা ঠিক রাখ। সমস্ত সৃষ্টিকে চৈতন্যময় মনে কর। জড় মনে করিও না। ওঁকারের দিব্য গায়ক ঐ চরখা কি জড়? সে ত পরমাত্মার মূর্তি। ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় আমরা অহঙ্কার দূর করিয়া বলিবর্দের পূজা করি। ইহা খুব বড় কথা। এই কথা নিত্য স্মরণে রাখিয়া বলদকে ভাল অবস্থায় রাখ, আর উহার নিকট হইতে সমুচিত কাজ লও। উৎসব দিনের ঐ ভক্তি সেই দিনেই যেন শেষ না হয়। বলদও পরমাত্মার মূর্তি। ঐ লাঙ্গল, চাষের সব উপকরণ, সব কিছু সযত্নে রাখিবে। সেবার সাধনমাত্রই পবিত্র। কিরূপ বিশাল এই দৃষ্টি। পূজা করার মানে আবীর, চন্দন, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া নয়। বাসনপত্রকে কাচের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বাসনের পূজা। প্রদীপ পরিষ্কার রাখা প্রদীপের

পূজা। কাস্তে ধার দিয়া কৃষিকাজের যোগ্য রাখাই কাস্তের পূজা। দরজার কব্জায় জং ধরে ত তেল লাগাইয়া উহাকে তুষ্ট রাখাই উহার পূজা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই দৃষ্টি আনিতে হইবে। সেবাদ্রব্য উৎকৃষ্ট ও নির্মল রাখা চাই। সারাংশ, আমি অক্ষর-পুরুষ, তিনি পুরুষোত্তম আর সাধনরূপ এই সৃষ্টি—উহাও পুরুষ, উহাও পরমাত্মা। সর্বত্র একই চৈতন্যের খেলা চলিতেছে। যখন এই দৃষ্টি লাভ হইবে তখন বুঝিতে পারিবে আমাদের কর্মে জ্ঞানও নিশ্চয়ই আসিয়াছে।

প্রথমে কর্মে ভক্তির পুট দিলে, তারপর উহাতে জ্ঞান যোগ করিলে, তখন তাহা হইতে এক অপূর্ব জীবন-রসায়নের সৃষ্টি হইবে। গীতা শেষপর্যন্ত আমাদের অদ্বৈতময় সেবার মার্গে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। সমগ্র সৃষ্টিতে তিন পুরুষ বিদ্যমান। এক পুরুষোত্তমই এই তিন রূপ ধারণ করিয়া আছেন। তিনে মিলিয়া বস্তুতঃ একই পুরুষ। কেবল অদ্বৈত। গীতা আমাদিগকে সর্বোচ্চ শিখরে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান—সব একরূপ হইয়া গিয়াছে। জীব, শিব ও সৃষ্টি একরূপ হইয়া গিয়াছে। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনে আর কোন বিরোধ থাকিল না। জ্ঞানদেব 'অমৃতানুভব' গ্রন্থে মহারাষ্ট্রের প্রিয় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ঃ

দেব দেউল পরিবারু। কীজে কোরূনি ডোঙ্গরু।
তৈসা ভক্তীচা বেব্হারু। কাঁ ন হো আবা॥

"পর্বত খোদাই করিয়া দেব, মন্দির আদি পরিবার বানাইয়াছি। ভক্তির আচরণও সেইরূপ কেন হইবে না ?" একই পাথর খোদাই করিয়া মন্দির, সেই মন্দিরে ঐ পাথরেরই তৈরি ভগবানের মূর্তি, মূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান পাথরের তৈরি ভক্ত এবং তাহার পাশে পাথরের তৈরী ফল। এ সবই যেমন এক পাথর হইতে প্রস্তুত, একই অখণ্ড পাথর যেমন নানারূপ ধারণ করিয়াছে, ভক্তির বেলায়ও সেইরূপ কেন হইবে না ? স্বামী-সেবক সম্বন্ধ হইলেও এই ঐক্য কেন থাকিবে না ? এই বাহ্যসৃষ্টি, এই পূজা-দ্রব্য আলাদা থাকিয়াও আত্মরূপ কেন হইবে না ? তিন পুরুষই এক। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এই তিনে মিলিয়া এক বিশাল জীবনপ্রবাহের সৃষ্টি হউক।

এইরূপই পরিপূর্ণ এই পুরুষোত্তম যোগ। স্বামী, সেবক ও সেবাদ্রব্য সবই একরূপ। এখন ভক্তি ও প্রেমের খেলা খেলিতে হইবে।

এইরূপ এই পুরুষোত্তম-যোগ যাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায় একমাত্র সে-ই যথার্থ ভক্তি লাভ করে।

স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।

এইরূপ পুরুষ জ্ঞানী হইয়াও পূর্ণ ভক্ত। জ্ঞান যেখানে, প্রেমও সেখানে। পরমেশ্বরের জ্ঞান ও পরমেশ্বরের প্রেম, ইহারা দুইটি পৃথক বস্তু নয়। "করলা তিতা"—এরূপ জ্ঞান জন্মিলে উহার প্রতি প্রেম জন্মে না। ব্যতিক্রম দুই একটি থাকিতে পারে। যেখানে তিক্ততার ভাব রহিয়াছে সেখানে মনে অরুচি আসিবেই। মিছরির জ্ঞান হইলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের ধারা বহিতে থাকে। ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান হওয়া ও প্রেম জন্মা দুই-ই এক কথা। ভগবানের রূপের মধুরতার উপমা কি ছাই চিনির সঙ্গে করা যায়? সেই মধুর পরমেশ্বরের জ্ঞান জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমভাবেরও উদয় হইবে। জ্ঞান হওয়া ও প্রেম হওয়া এই দুই ক্রিয়া যেন ভিন্ন বস্তুই নয়। অদ্বৈতে ভক্তির স্থান আছে কি নাই এই তর্কে কোন সার নাই। জ্ঞানদেব বলেন ঃ

হেঁ চি ভক্তি হেঁ চি জ্ঞান।
এক বিট্‌ঠল চি জাণ॥

"এক বিট্‌ঠলকেই জান, উহাই ভক্তি উহাই জ্ঞান।" ভক্তি ও জ্ঞান একই বস্তুর দুই নাম।

জীবনে পরম ভক্তি আসার পর যে কর্ম সম্পন্ন হয় সে কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান হইতে পৃথক নয়। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান মিলিয়া এক রমণীয় রূপ ধারণ করে। এই রমণীয় রূপ হইতে অপূর্ব প্রেমময় ও জ্ঞানময় সেবার ধারা সহজেই উৎপন্ন হয়। মাকে আমি ভালবাসি ; এই প্রেম কর্মে ফুটিয়া উঠা চাই। প্রেম সর্বদা নিজেকে মিটাইয়া দেয়, বিলাইয়া দেয়। সেবারূপে উহা ব্যক্ত হইতে থাকে। প্রেমের বাহ্যরূপ হইল সেবা। প্রেম অনন্ত সেবাকর্মের সাজে সাজিয়া আত্ম প্রকাশ করে। প্রেম হইলে সেখানে জ্ঞানও আসিয়া যায়। যাহার সেবা করিব, কিরূপ সেবা তাহার প্রিয়, সে জ্ঞান

আমার থাকা চাই। নয় ত সে সেবা অ-সেবা অথবা কু-সেবা হইবে। সেব্য বস্তুর জ্ঞান প্রেমে থাকা চাই। প্রেমের প্রভাব কর্ম দ্বারা বিস্তার করার জন্য জ্ঞানের আবশ্যক হয়। কিন্তু উহার মূলে থাকা চাই প্রেম। অন্যথায় সে জ্ঞান অকেজো হইয়া পড়ে। প্রেমের দ্বারা নিষ্পন্ন কর্ম সাধারণ কর্ম হইতে পৃথক। খেত হইতে ক্লান্তদেহে ফিরিয়া আসার পর মা প্রেমভরা দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলেন, "বড্ড খাটুনি গেছে, বাবা"। কর্মটি ছোট কিন্তু কত সামর্থ্য তাহাতে ভরা! জীবনের সর্ব কর্মে জ্ঞান ও ভক্তি নিঃশেষে ঢালিয়া দাও—ইহাই পুরুষোত্তম-যোগ।

॥ ৮৭ ॥ সকল বেদের সার হাতের মুঠায়

সকল বেদের ইহা সার। বেদ অনন্ত। আর সেই অনন্ত বেদের সার-সংক্ষেপ এই পুরুষোত্তম-যোগ। এই বেদ কোথায়? বেদের কথা বিচিত্র। বেদের সার কোথায় আছে? অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, —**ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি**—"বেদ যাহার পাতা।" বেদ ত এই বৃক্ষের পাতায় পাতায় ভরা। বেদ ঐ সংহিতায় বা গ্রন্থে আবদ্ধ নাই। বিশ্বের সর্বত্র উহা ছড়াইয়া আছে। শেক্সপিয়র বলিয়াছেন:

প্রবহমান ঝরনার নিকট সদগ্রন্থ পাওয়া যায়। পাহাড় পর্বতের নিকট প্রবচন শুনা যায়।

তাৎপর্য, বেদ সংস্কৃতেও নাই, সংহিতায়ও নাই। বেদ আছে সৃষ্টির মধ্যে। সেবা করিলে উহার দর্শন মিলিবে।

প্রভাতে করদর্শনম্—প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে নিজ হাতের তালু দেখ। সকল বেদ ঐ হাতেই রহিয়াছে। বেদ বলে—"সেবা কর"। কাল হাত দিয়া কাজ করিয়াছ কি কর নাই, আজ কাজ করিবার উপযুক্ত আছে কি নাই, উহাতে কড়া পড়িয়াছে কি-না তাহা দেখ। সেবা করিতে করিতে যখন হাত ক্ষয় হয় তখন তাহাতে ব্রহ্মের লেখা ফুটিয়া উঠে। ইহাই "**প্রভাতে করদর্শনম্**"-এর অর্থ।

জিজ্ঞাসা করা হয়, বেদ কোথায়? ভাই, তাহা তোমার নিকটেই আছে। তুমি-আমি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ত উহা লাভ করিয়াছি। আমরাই জীবন্ত বেদ। আজ পর্যন্তের যাহা কিছু পরম্পরা, সবই আমাদের মধ্যে আত্মসাৎ

হইয়া গিয়াছে। আমরা ঐ পরম্পরারই ফল। ঐ বেদ-বীজের যে ফল তাহাই আমরা। নিজেদের ফলে অনন্ত বেদের বীজ আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের উদরে বেদ বিশ-পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

সারাংশ, বেদের সার আমাদের হাতেই বিদ্যমান। সেবা, প্রেম ও জ্ঞান এই তিনের ভিত্তিতে আমাদের জীবন গড়িতে হইবে। ইহারই অর্থ—বেদ হাতের মুঠায়। আমরা যে অর্থ করিব তাহাই বেদ। বেদ বাহিরে কোথাও নাই। সেবার প্রতিমূর্তি সন্তগণ বলেন ঃ

বেদাঁচা তো অর্থ আম্হাঁসী চ ঠাবা।

"বেদের অর্থ কেবল আমরাই জানি।" ভগবান বলিতেছেন, "সকল বেদ আমাকেই জানে। আমিই সকল বেদের নির্যাস, সার—পুরুষোত্তম"। এই যে বেদের সার, এই পুরুষোত্তম-যোগ যদি নিজের জীবনে আত্মসাৎ করিতে পারা যায় ত কতই না আনন্দ লাভ হয়! এইরূপ পুরুষ তখন যাহা কিছু করে তাহা দ্বারা বেদই প্রকট হয়—গীতা একথাই বলে।

এই অধ্যায়ে সমগ্র গীতার সার আসিয়া গিয়াছে। গীতার শিক্ষা ইহাতে পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছে। উহা জীবনের আচরণে ফুটাইয়া তোলার জন্য আমাদের দিনরাত প্রযত্ন করিতে হইবে। তাহা হইয়া গেলে আর কি চাই?

রবিবার, ২৯-৫-১৯৩২

ষোড়শ অধ্যায়

পরিশিষ্ট ১—দৈবী ও আসুরী বৃত্তির সংগ্রাম

॥ ৮৮ ॥ পুরুষোত্তম-যোগের পূর্ব-প্রভা : দৈবী সম্পদ

বন্ধুগণ,

গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে আমরা জীবনের সমগ্র রূপ কি, আর আমরা নিজেদের জীবন কিভাবে সার্থক করিতে পারি তাহা দেখিয়াছি। তারপর ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন দিক হইতে ভক্তির আলোচনা করা হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে ভক্তির দর্শন লাভ হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ ভক্তির তুলনা করিয়া ভক্তের প্রধান-প্রধান লক্ষণ দেখানো হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত কর্ম ও ভক্তি এই দুই তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ হইয়াছে। জ্ঞানের তৃতীয় বিভাগ বাকী ছিল। উহা আমরা ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখিয়াছি। আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করা, উহার জন্য তিনগুণ জয় করা, আর অন্তে সর্বত্র প্রভুদর্শন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে জীবনের সম্পূর্ণ শাস্ত্র দেখা হইয়াছে। পুরুষোত্তম-যোগে জীবনের পূর্ণতা লাভ হয়। উহার পর আর কিছু বাকী থাকে না।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ইহাদের পৃথক করিয়া দেখা আমি পছন্দ করি না। কোন কোন সাধকের নিষ্ঠা এমন যে কেবল কর্মই তাঁহাদের ভাল লাগে। কেহ কেহ ভক্তিকে স্বতন্ত্র মার্গ বলিয়া মনে করেন আর উহাতেই সমস্ত শক্তি লাগান। কিছু লোকের ঝোঁক জ্ঞানের উপর। জীবনের অর্থ কেবল কর্ম, কেবল ভক্তি, কেবল জ্ঞান—এইরূপ 'কেবল'বাদ আমি স্বীকার করি না। ইহার বিপরীত কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের 'সমুচ্চয়'বাদও আমি মানি না। কিছু ভক্তি, কিছু জ্ঞান, কিছু কর্ম এইরূপ 'উপযোগিতা'-বাদও আমার ভাল লাগে না। প্রথমে কর্ম, তারপর ভক্তি, তারপর জ্ঞান —এরূপ 'ক্রমবাদ'ও আমি স্বীকার করি না। তিনের মিলনরূপ 'সামঞ্জস্য'-বাদেরও আমি পক্ষপাতী নই। আমার ত ইহাই অনুভব করিতে ইচ্ছা

হয় যে, যাহা কর্ম তাহাই ভক্তি আর তাহাই জ্ঞান। সন্দেশের এক টুকরার মধুরতা, আকার ও ওজন পৃথক পৃথক বস্তু নয়। যে মুহূর্তে আমরা সন্দেশের টুকরা মুখে দিই তখনই তাহার আকার খাই, তাহার ওজন হজম করি, তাহার মধুরতার স্বাদ লই। তিন বস্তু একই সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আছে। সন্দেশের প্রতি কণায় আকার, ওজন ও মধুরতা থাকে। উহার কোন টুকরায় কেবল আকার, কোন টুকরায় কেবল মধুরতা আর কোন টুকরায় কেবল ওজন থাকে, তাহা নয়। সেইরূপ জীবনের প্রতি কর্মে পরমার্থ ভরা থাকা চাই। প্রতি কর্ম সেবাময়, প্রতিকর্ম প্রেমময় ও প্রতিকর্ম জ্ঞানময় হওয়া চাই। জীবনের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ভরা থাকা চাই। ইহাকেই পুরুষোত্তম-যোগ বলে। সমগ্র জীবন কেবল পরমার্থময় করিতে হইবে—একথা বলা খুব সহজ। কিন্তু এই কথার মধ্যে যে ভাব নিহিত তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, কেবল নির্মল সেবা করার জন্যই অন্তঃকরণে শুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তির আন্তরিক ভাবনা ভরা থাকে—সেই অনুযায়ীই চলা চাই। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান অক্ষরশঃ একরূপ, এই পরমদশাকে পুরুষোত্তম-যোগ বলে। এখানে জীবনের অন্তিম সীমা (পূর্ণ-পরিণতি) আসিয়া গিয়াছে।

আচ্ছা, এখন এই ষোড়শ অধ্যায়ে কি বলা হইয়াছে? যেভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে সূর্যের প্রভা ছড়াইয়া পড়ে, সেইভাবে জীবনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানরূপ পূর্ণ পুরুষোত্তম-যোগের উদয় হওয়ার পূর্বে সদ্গুণের প্রভা বাহিরে বিকীর্ণ হইতে থাকে। পরিপূর্ণ জীবনের এই অগ্রবর্তী প্রভার কথা এই ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন্ অন্ধকারের সহিত সংগ্রাম করিয়া এই প্রভা প্রকাশিত হয় তাহারও বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে। কোন বস্তু মানিয়া লইবার পূর্বে কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখিতে চাই। সেবা, ভক্তি ও জ্ঞান যে আমাদের জীবনে আসিয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় কি? আমরা মাঠে শ্রম করি আর তাহার ফলস্বরূপ ফসল ওজন করিয়া ঘরে তুলি। সেইরূপ আমরা যে সাধনা করি তাহা হইতে আমাদের কি অনুভূতি লাভ হইয়াছে, কোন্ কোন্ সদ্গুণ আয়ত্ত হইয়াছে, জীবন সত্যসত্যই কতটা সেবাময় হইয়াছে, তাহা যাচাই করার জন্য এই অধ্যায় সংকেত করিতেছে। জীবনের কৃষ্টি কতটা উন্নীত হইল তাহা

পরিমাপ করার জন্যই এই অধ্যায়ের অবতারণা। জীবন-বিকাশশীল এই কলাসমূহকে গীতা দৈবী সম্পদ নাম দিয়াছে। উহার বিপরীত বৃত্তিসমূহকে 'আসুরী' বলা হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের সংগ্রাম দেখানো হইয়াছে।

॥ ৮৯ ॥ অহিংসার ও হিংসার সেনা

প্রথম অধ্যায়ে যেমন একদিকে কৌরব-সেনা ও অপরদিকে পাণ্ডব-সেনা মুখামুখি দাঁড় করানো হইয়াছে এখানেও সেইরূপ সদ্‌গুণরূপ দৈবী-সেনা ও দুর্গুণরূপ আসুরী-সেনাকে পরস্পরের সম্মুখীন করা হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষের মনে সদসৎ-বৃত্তির যে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে তাহার রূপকাত্মক বর্ণন-পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে। বেদে ইন্দ্র ও বৃত্রে, পুরাণে দেব ও দানবে, সেইরূপ রাম ও রাবণে, পারসীক ধর্মগ্রন্থে অহুরমঝ্‌দ ও অহরিমানে, খ্রীস্টধর্মে প্রভু ও শয়তানে, ইসলামে আল্লা ও ইব্লীসে—এইরূপ বিবাদ সকল ধর্মেই আছে। কাব্যে স্থূল ও বৃহৎ বস্তুর বর্ণনা সূক্ষ্ম রূপক দ্বারা করা হয় আর ধর্মগ্রন্থে সূক্ষ্ম মনোভাবের বর্ণনা সুবৃহৎ স্থূল রূপক সহায়ে করা হয়। কাব্যে সূক্ষ্ম দ্বারা স্থূলের আর ধর্মগ্রন্থে স্থূল দ্বারা সূক্ষ্মের বর্ণনা করা হয়। সেইজন্য একথা যেন কেহ মনে করিবেন না যে গীতার আরম্ভে যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাহা নিছক কাল্পনিক। হইতে পারে উহা ঐতিহাসিক। কিন্তু কবি এখানে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য এই ঘটনার ব্যবহার করিয়াছেন। কর্তব্য বিষয়ে যখন মোহ উপস্থিত হয়, তখন কি ভাবে চলিতে হইবে সেকথা যুদ্ধের রূপক দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। এই ষোড়শ অধ্যায়ে ভাল ও মন্দের সংগ্রাম দেখানো হইয়াছে। গীতায় যুদ্ধের রূপকও লওয়া হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র বাহিরেও আছে আবার আমাদের ভিতরেও আছে। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যাইবে, যে ঝগড়া আমাদের মনে থাকে, তাহাই আমরা বাহিরের জগতে মূর্তিমান দেখিতে পাই। বাহিরে যে শত্রু দাঁড়াইয়া আছে তাহা আমারই মনের বিকার—সাকাররূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত। আয়নায় যেমন আমারই ভালমন্দের প্রতিবিম্ব আমি দেখি সেইরূপ আমার মনের ভালমন্দ চিন্তাও শত্রুমিত্ররূপে বাহিরে দেখা

যায়। যেমন আমরা জাগ্রত অবস্থার বিষয়ই স্বপ্নে দেখিয়া থাকি তেমনই মনে যাহা আছে তাহাই বাহিরে দেখিতে পাই। ভিতরের ও বাহিরের যুদ্ধে কোন প্রভেদ নাই। সত্যি কথা বলিলে বলিতে হয় যুদ্ধ অন্তরেই চলে।

আমাদের অন্তঃকরণে একদিকে সদ্‌গুণ অপরদিকে অসদ্‌গুণ দণ্ডায়মান। উহারা দৃঢ়ভাবে নিজ নিজ ব্যূহ-রচনা করিয়া রাখিয়াছে। সৈন্যদলের যেমন সেনাপতি দরকার এখানেও সেইরূপ সদ্‌গুণসমূহ তাহাদের একজন সেনাপতি স্থির করিয়াছে। এই সেনাপতির নাম 'অভয়'। এই অধ্যায়ে 'অভয়কে' প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। ভাবিয়া-চিন্তিয়াই অভয় শব্দকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। অভয় ছাড়া কোন গুণেরই সৃষ্টি হইতে পারে না। সততা বিনা সদ্‌গুণের কোন মূল্য নাই। কিন্তু সততার জন্য নির্ভয়তা দরকার। ভয়ের আবহাওয়ায় সদ্‌গুণের বিস্তার হয় না। উলটা ঐ অবস্থায় সদ্‌গুণও দুর্গুণ হয়; সৎপ্রবৃত্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে। নির্ভয়তা সকল সদ্‌গুণের মুখ্য নায়ক। সৈন্যের সম্মুখ-পশ্চাৎ দুই দিকই রক্ষা করিতে হয়। সোজা আক্রমণ সম্মুখ হইতে হয়। কিন্তু পিছন হইতে চোরা আক্রমণেরও সম্ভাবনা থাকে। সদ্‌গুণাবলীর সামনে 'নির্ভয়তা' তাল ঠুকিয়া দাঁড়ায় আর পশ্চাৎ রক্ষা করে 'নম্রতা'। এইভাবে অতি সুন্দর ব্যূহ রচিত হইয়াছে। এখানে মোট ছাব্বিশটি গুণের কথা বলা হইয়াছে। এই গুণসমূহের পঁচিশটিও যদি আয়ত্ত হয় আর তৎসম্বন্ধে মনে যদি এতটুকু অহঙ্কারও জন্মে তবে পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ আক্রমণে সব কিছু বানচাল হইয়া যাইতে পারে। তাই পশ্চাৎভাগে 'নম্রতা'-রূপ সদ্‌গুণটিকে মোতায়েন করা হইয়াছে। যদি নম্রতা না থাকে তবে 'জয়' যে কখন পরাজয়ে রূপান্তরিত হইবে তাহা টেরও পাওয়া যাইবে না। এইভাবে সামনে 'নির্ভয়তা' ও পিছনে 'নম্রতা' মোতায়েন করিয়া সকল সদ্‌গুণের বিকাশ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দুই মহৎ গুণের মধ্যবর্তী যে চব্বিশটি গুণ তাহা অনেকাংশে অহিংসার পর্যায়ভুক্ত, এরূপ বলা অনুচিত হইবে না। ভূত-দয়া, মার্দব, ক্ষমা, শান্তি, অক্রোধ, অহিংসা, অদ্রোহ এই সবই স্বতন্ত্রভাবে অহিংসা পর্যায়ের শব্দ। অহিংসা ও সত্য এই দুই গুণের মধ্যে সব গুণের সমাবেশ হইয়া যায়। সদ্‌গুণসমূহের সার-সংক্ষেপ করিলে শেষ পর্যন্ত বাকী থাকিবে সত্য ও

অহিংসা এই দুই গুণ। অন্য সব গুণ এই দুইয়েরই মধ্যে আসিয়া যায়। কিন্তু নির্ভয়তা ও নম্রতার কথা স্বতন্ত্র। নির্ভয়তা দ্বারা প্রগতি করা যায়। নম্রতার দ্বারা উহা রক্ষা করা যায়। সত্য ও অহিংসা এই দুই গুণের পুঁজি লইয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। জীবন বিশাল। উহাতে স্বচ্ছন্দ গতিতে সঞ্চরণ করিয়া অগ্রসর হওয়া চাই। পদ-স্খলন না হয় সেজন্য সর্বদা নম্র থাকিতে হইবে। তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে না। তারপর সর্বত্র সত্য ও অহিংসার নির্ভীক প্রয়োগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকুন। তাৎপর্য, সত্য ও অহিংসার বিকাশ হয় নির্ভয়তা ও নম্রতার দ্বারা।

এইভাবে একদিকে যেমন সদ্‌গুণের ফৌজ দাঁড়াইয়া আছে। অপরদিকে তেমনি দুর্গুণের ফৌজও প্রস্তুত হইয়া আছে। দম্ভ, অজ্ঞান আদি দুর্গুণের সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক। ইহাদের সহিত আমাদের নিত্য পরিচয়। দম্ভ যেন আমাদের অস্থিমজ্জাগত। সমস্ত জীবনটাই যেন দম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞান সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে অজ্ঞান এক মার্জিত অছিলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে আর পদে পদে আমরা উহাকে সামনে তুলিয়া ধরি। অজ্ঞান যেন বড় কোন অপরাধই নয়। কিন্তু ভগবান বলিতেছেন, "অজ্ঞানই পাপ।" সক্রেটিস ইহার উল্টা বলিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলাকালে তিনি বলিয়াছিলেন, "যাকে তোমরা পাপ মনে কর তা অজ্ঞান আর অজ্ঞান ক্ষমার যোগ্য। অজ্ঞান ছাড়া পাপ কিভাবে হতে পারে? আর অজ্ঞানকে তোমরা সাজাই বা কি করে দেবে?" কিন্তু ভগবান বলেন, "অজ্ঞানও পাপই।" আইন বলে, আইনের অজ্ঞতা রেহাইয়ের যুক্তি হইতে পারে না। ভগবানের বিধানের অজ্ঞতাও মস্তবড় অপরাধ। ভগবানের ও সক্রেটিসের কথার ভাবার্থ একই। নিজের অজ্ঞানকে কি দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে ভগবান তাহা বলিয়াছেন আর অন্যের পাপ কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে তাহা বলিয়াছেন সক্রেটিস। অন্যের পাপ ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্তু আপন অজ্ঞান ক্ষমা করা পাপ। নিজের মধ্যে অজ্ঞানের লেশমাত্রও রাখিতে নাই।

॥ ৯০ ॥ অহিংসার বিকাশের চার ধাপ

এই ভাবে এক দিকে দৈবী সম্পদ ও অপর দিকে আসুরী সম্পদ— এই দুই সেনা দণ্ডায়মান। ইহার মধ্যে আসুরী সম্পদ ছাড়িতে ও দৈবী

সম্পদ্ আশ্রয় করিতে হইবে। সত্য অহিংসাদি দৈবী গুণসমূহের বিকাশ অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। মধ্যযুগেও খুব বিকাশ হইয়াছে। তথাপি আজও বিকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিকাশের সীমা শেষ হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই সামাজিক শরীর আছে ততদিন বিকাশের অনন্ত অবকাশ থাকিবে। ব্যক্তিগত বিকাশ হইয়া গেলেও সামাজিক, রাষ্ট্রিক, জাগতিক বিকাশ বাকী থাকে। ব্যক্তিকে আপন বিকাশের সার দিয়া সমাজের ও দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের বিকাশের সূত্রপাত করিতে হয়। মানুষের দ্বারা অনাদিকাল হইতে অহিংসার বিকাশ হইয়া আসিয়াছে এবং আজও ঐ বিকাশ-ক্রিয়া চলিতেছে।

অহিংসার বিকাশ কি ভাবে হইয়া আসিয়াছে তাহা লক্ষ্য করার মত। উহা হইতে পারমার্থিক জীবনের উত্তরোত্তর বিকাশ কি ভাবে হইতেছে এবং উহার আর কতটা অবকাশ আছে তাহা বুঝা যাইবে। হিংসক মানুষের আক্রমণ হইতে কিরূপে বাঁচা যায় সেকথা অহিংসক মানুষ প্রথমে চিন্তা করিতে থাকে। শুরুতে সমাজ-রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়বর্গ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু পরে তাহারাই সমাজ-ভক্ষক হইয়া উঠে। সেই সব উন্মত্ত ক্ষত্রিয়ের হাত হইতে সমাজকে কি ভাবে রক্ষা করা যায় সেকথা অহিংসক ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করিতে থাকেন। পরশুরাম অহিংসক হইয়াও স্বয়ং হিংসা অবলম্বন করিলেন এবং ক্ষত্রিয় বিনাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়দের হিংসামুক্ত করার জন্য তিনি নিজে হিংসক হইলেন। অহিংসারই উহা পরীক্ষা ছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। তিনি একুশবার ক্ষত্রিয়-নিধন করিলেন। তবুও ক্ষত্রিয়রা বাঁচিয়া রহিল। কারণ ঐ পরীক্ষার মূলেই ছিল ভুল। যে ক্ষত্রিয়দের তিনি বিনাশ করিতে চলিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যায় আর একজনের নাম যুক্ত হইল মাত্র। তাহা হইলে ক্ষত্রিয়বর্গ কি ভাবে বিনষ্ট হইবে? তাঁহারা নিজেরাই হিংসক ক্ষত্রিয়ে পরিণত হইলেন। সেই বীজ ত বজায়ই থাকিল। বীজ রাখিয়া যে গাছ কাটে সে দেখিতে পাইবে গাছ পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে। পরশুরাম ছিলেন ভাল মানুষ। কিন্তু তিনি লিপ্ত হইয়াছিলেন অতীব বিচিত্র পরীক্ষায়। স্বয়ং ক্ষত্রিয় হইয়া দুনিয়াকে তিনি নিঃক্ষত্রিয় করিতে চাহিয়াছিলেন। বস্তুত নিজেকে দিয়া তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ করা উচিত ছিল। নিজের মাথাই তাঁহার প্রথমে দেওয়া

উচিত ছিল। আমি যে এখানে পরশুরামের সমালোচনা করিতেছি, তাহার অর্থ এই নয় যে আমি তাঁহার অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ। আমি ত বালক মাত্র। কিন্তু আমি তাঁহার স্কন্ধে দাঁড়াইয়া আছি। সেই হেতু স্বভাবতই আমি অধিক দেখিতে পাইতেছি। পরশুরামের পরীক্ষার মূলেই ছিল ভুল। হিংসাময় হইয়া হিংসা দূর করা সম্ভব নয়। উল্টা উহার ফলে হিংসাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় মাত্র। কিন্তু সে সময় এ কথা ধরা পড়ে নাই। তখনকার ভাল ভাল মানুষের, মহান্ অহিংসাময় ব্যক্তিদের যেরূপ মনে হইয়াছিল তদনুযায়ী তাঁহারা পরীক্ষা চালাইয়াছিলেন। পরশুরাম সেই সময়কার মহান্ অহিংসাবাদী ছিলেন। হিংসার জন্য তিনি হিংসা করেন নাই। অহিংসার প্রতিষ্ঠার জন্যই হিংসা করিয়াছিলেন।

সেই পরীক্ষা অসফল হইয়াছিল। পরে রামের যুগ আসিল। তখন আবার ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হিংসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ঠিক করিয়াছিলেন তাঁহারা নিজেরা হিংসা করিবেন না। কিন্তু রাক্ষসদের আক্রমণ হইতে কি প্রকারে বাঁচা যায়? তাঁহারা ভাবিলেন ক্ষত্রিয়েরা ত হিংসা করেই। তাহাদের দ্বারা রাক্ষসদের সংহার করিতে হইবে। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হইবে। আমরা নিজেরা হিংসা হইতে দূরে থাকিব। বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার্থে রাম লক্ষ্মণকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের দ্বারা রাক্ষস সংহার করাইয়াছিলেন। আজ আমরা ভাবি—যে-অহিংসা স্ব-রক্ষিত নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে অক্ষম এমন খোঁড়া-খঞ্জ অহিংসা টিকিবে কিরূপে? কিন্তু বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের ন্যায় ব্যক্তিদের কাছে ক্ষত্রিয়ের বল দ্বারা আত্মরক্ষা করা দোষের মনে হয় নাই। কিন্তু রামের মত ক্ষত্রিয় যদি না মিলিত? বিশ্বামিত্র বলেন, "আমি মরব তবু হিংসা করব না।" হিংসক হইয়া হিংসা দূর করার পরীক্ষা তখন শেষ হইয়াছিল। নিজে অহিংসা ছাড়িব না ইহা সুনিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল। ক্ষত্রিয় না মিলে ত অহিংসভাবে বরং মরিয়া যাইব, এই পটভূমি তখন প্রস্তুত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে যাইতে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্তূপ কিসের?" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এ অস্থিস্তূপ ব্রাহ্মণদের। অহিংসক ব্রাহ্মণগণ আক্রমণকারী হিংসক রাক্ষসদের পাল্টা জবাব দেন

নাই। তাঁরা মরে শেষ হয়েছেন। তাঁদেরই অস্থির এই স্তূপ।” এই অহিংসায় ব্রাহ্মণদের ত্যাগ ত ছিলই কিন্তু সঙ্গে এই আশাও ছিল যে অন্যে তাহাদের রক্ষা করিবে। এইরূপ দুর্বলতার কারণে অহিংসা পূর্ণতা লাভ করে নাই।

সন্তপুরুষেরা পরবর্তীকালে তৃতীয় আর এক পরীক্ষা করেন। তাঁহারা স্থির করেন যে আত্মরক্ষার জন্য অপরের সহায়তা কদাপি লইবেন না। নিজেদের অহিংসাই তাঁহাদের রক্ষা করিবে আর সেই রক্ষাই হইবে যথার্থ রক্ষা। সন্তদের এই পরীক্ষা ব্যক্তিনিষ্ঠ ছিল। এই ব্যক্তিগত পরীক্ষাকে তাঁহারা পূর্ণতায় লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ব্যক্তিতেই নিবদ্ধ ছিল। সমাজের উপর যদি হিংসক লোকের আক্রমণ হইত আর সমাজ সন্তদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “এখন আমরা কি করিব?” সে ক্ষেত্রে সম্ভবত সন্তগণ উহার সঠিক উত্তর দিতে পারিতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ণ অহিংসার আচরণকারী সন্তগণ সমাজকে এই জবাব দিতেছেন দেখিতে পাইতাম, “ভাই, আমরা নিরুপায়।” সন্তদের আমি দোষ দেখাইতেছি, ইহা বালক-সুলভ সাহসিকতা। কিন্তু তাঁহাদের স্কন্ধে উপবিষ্ট হইয়া আমি যাহা দেখিতেছি তাহাই আমি বলিতেছি। তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করুন, আর ক্ষমা তাঁহারা করিবেনও। কারণ মহান্ তাঁহাদের ক্ষমা। অহিংসার পথে সমষ্টিগত প্রয়োগ করার প্রেরণা যে তাঁহাদের হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি তাঁহাদের তেমন অনুকূল মনে হয় নাই। তাঁহারা নিজেদের মত পৃথক পৃথক পরীক্ষা করিয়াছেন। এরূপ পৃথক পৃথক ভাবে কৃত পরীক্ষা হইতেই শাস্ত্র রচিত হয়। সম্মিলিত অনুভব হইতেই শাস্ত্রের উৎপত্তি।

সন্তদের ব্যক্তিগত পরীক্ষার পরে আজ আমাদের চতুর্থ পরীক্ষা চলিতেছে। সারা সমাজ মিলিয়া অহিংসাত্মক সাধন দ্বারা হিংসার প্রতিকার করার পরীক্ষা আজ আমরা করিতেছি। এইরূপে আজ পর্যন্ত চার বার পরীক্ষা হইয়াছে। প্রত্যেক পরীক্ষায় অপূর্ণতা ছিল এবং আছে। বিকাশের ক্রমে ইহা অপরিহার্যও বটে। কিন্তু একথা বলিতেই হইবে যে তৎ তৎ কালের পক্ষে সেই সেই পরীক্ষা পূর্ণই ছিল। আর দশ হাজার বৎসর পরে আজিকার আমাদের এই অহিংস যুদ্ধেও অনেক কিছু হিংসা দেখা যাইবে।

শুদ্ধ অহিংসার পরীক্ষা আরও হইতে থাকিবে। কেবল জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিরই নয়, সকল সদ্‌গুণেরই বিকাশ হইতেছে। পূর্ণ কেবল এক বস্তু। তাহা পরমাত্মা। ভগবদ্‌গীতার পুরুষোত্তম-যোগ পূর্ণ, কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে এখনও উহার পূর্ণ বিকাশ হইতে বাকী আছে। বচনেরও বিকাশ হইতে থাকে। ঋষিদের মন্ত্রের দ্রষ্টা মনে করা হইত, কর্তা নয়। মন্ত্রের অর্থ তাঁহাদের নিকট যেভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহাই যে উহার অর্থ এরূপ নহে। তাঁহাদের এক দর্শন হইয়াছিল। পরে উহাকে আমরা আরও বিকশিত অর্থে দেখিতে পারি। তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা যদি অধিক দেখি ত তাহা আমাদের কিছু বিশেষতা নয়। কেননা তাঁহাদের প্রয়োগ ভিত্তি করিয়াই আমরা আগাইয়া যাইতেছি। আমি যে এখানে অহিংসার বিকাশের কথাই বলিতেছি তাহার কারণ সদ্‌গুণসমূহের সাধারণভাবে সার বাহির করিতে গেলে সাররূপে 'অহিংসাই' বাহির হইবে। আর দ্বিতীয়ত আমরা এখন সেই অহিংসাত্মক যুদ্ধেই লিপ্ত আছি। সেইজন্য এই তত্ত্বের বিকাশ কি ভাবে হইতেছে তাহা দেখিয়া লইলাম।

॥ ৯১ ॥ অহিংসার এক মহান্‌ প্রয়োগ : মাংসাহার ত্যাগ

এ পর্যন্ত অহিংসার সেই দিক আমরা দেখিয়াছি যেখানে হিংসাকারীদের আক্রমণ হইতে অহিংসকেরা কি ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। মানুষে-মানুষে পারস্পরিক ঝগড়ায় অহিংসার বিকাশ কি ভাবে হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ঝগড়া ত মানুষে আর পশুতেও আছে। মানুষ আজ পর্যন্ত নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া মিটাইতে পারে নাই। পশু পেটে ঢুকাইয়া সে জীবন ধারণ করিতেছে। নিজের ঝগড়া আজ অবধি মিটাইতে পারে নাই, নিজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট দুর্বল পশু না খাইলে তাহার জীবন চলে না। হাজার হাজার বছর জীবন-যাপন করিয়াও কি ভাবে বাঁচিয়া থাকা উচিত সে চিন্তা আজ পর্যন্ত মানুষ করে নাই। মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার শিক্ষা এখনও তাহার হয় নাই। কিন্তু এই চিন্তারও বিকাশ হইতেছে। আদি মানব সম্ভবতঃ কন্দ ফলমূল আহার করিত। পরে দুর্মতিবশে বৃহৎ মানবসমাজ মাংসাহারী হয়। কিন্তু জ্ঞানী ও উত্তম লোকদের তাহা ভাল লাগে নাই।

তাঁহারা এই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিলেন যে, মাংস যদি খাইতেই হয় তবে যজ্ঞে বলি দেওয়া পশুর মাংসই খাওয়া উচিত। হিংসা নিয়ন্ত্রণই ছিল উহার উদ্দেশ্য। বহু লোক ত মাংসাহার পুরাপুরিভাবেই ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু যাহারা মাংস সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহাদের এই অনুমতি দেওয়া হইল যে তাহারা পশু ভগবানকে অর্পণ করিয়া কিছুটা তপস্যা করিয়া যজ্ঞশেষে সেই মাংস খাইতে পারে। তখন মনে করা হইয়াছিল যে মাংস খাইবে সে যজ্ঞের মাংসই খাইবে। ইহাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইবে। হিংসা বন্ধ হইবে। কিন্তু পরে যজ্ঞ এক সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ অবস্থা হইল যে মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হইলেই লোকে যজ্ঞ করিত আর মাংস খাইত। তখন ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন। তিনি বলিলেন, "মাংস খাবে ত খাও কিন্তু দেবতার নামে খেও না।" এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক, হিংসার নিয়ন্ত্রণ—সমাজ গাড়ীকে যে কোন উপায়ে সংযমের রাস্তায় আনা। যাগ-যজ্ঞ কর বা না কর—এই-দুই উপায় হইতেই আমরা মাংসাহার ত্যাগ করার শিক্ষা পাই। এই ভাবে ধীরে ধীরে আমরা মাংস খাওয়া ছাড়িতে থাকি।

জগতের ইতিহাসে এক ভারতবর্ষেই এই মহান্ পরীক্ষা হইয়াছে। কোটি কোটি মানুষ মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দেয়। এখন আমরা যে মাংস খাই না ইহাতে আমাদের কোন কৃতিত্ব নাই। পূর্বপুরুষদের পুণ্যবলে আমরা উহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। উপরন্তু প্রাচীন ঋষিরা মাংস খাইতেন একথা বলিলে বা পড়িলে আমাদের আশ্চর্য মনে হয়। "কি বাজে বক্‌ছ ? ঋষিরা মাংস খেতেন, কক্‌খনো নয়।" কিন্তু মাংসাহার করিতে করিতেই তাঁহারা সংযমপূর্বক মাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেয় তাঁহাদের। সেই কষ্টের অনুভূতি আজ আমাদের হয় না। বিনা আয়াসে তাঁহাদের পুণ্য আমরা লাভ করিয়াছি।

পূর্বকালে তাঁহারা মাংস খাইতেন আর আজ আমরা মাংস খাই না, সেই হেতু আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা বড় হইয়াছি তাহা নয়। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার শ্রেয় বিনা আয়াসে আমাদের লাভ হইয়াছে। তাঁহাদের এই জ্ঞানের বিকাশ আমাদের করিতে হইবে। আমাদের দুধ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রয়োগ করা উচিত। অন্য প্রাণীর দুধ খাওয়া মানুষের

শোভা পায় না। দশ হাজার বছর পরেকার লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে বলিবে, "আমাদের পূর্বজদের দুধ না খাওয়ার মত ব্রত গ্রহণ করতে হয়েছিল? ছিঃ ছিঃ দুধ তারা খেত কি করে? এমন জঙ্গলী ছিল তারা!" একথার তাৎপর্য এই যে, আমাদের নির্ভীকভাবে কিন্তু নম্রতা সহকারে নিজেদের পরীক্ষায় নিরন্তর অগ্রসর হইতে হইবে। সত্যের পরিধি দিন দিন বিশাল করিতে হইবে। বিকাশের জন্য এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে। কোন গুণেরই পূর্ণ বিকাশ হইয়া যায় নাই।

॥ ৯২ ॥ আসুরী সম্পদের ত্রিবিধ উচ্চাকাঙ্খা : সত্তা, সংস্কৃতি ও সম্পত্তি

আমাদের দৈবী সম্পদের বিকাশ করিতে হইবে এবং আসুরী সম্পদ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। আসুরী সম্পদের বর্ণনা ভগবান এইজন্য করিয়াছেন যে লোক যেন তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারে। ইহাতে তিনটি বিষয় মুখ্য। 'সত্তা, সংস্কৃতি ও সম্পত্তি'—এই তিন বস্তু অসুরচরিত্রের সারস্বরূপ। তাহারা বলে—আমাদের সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মনে এইরূপ উচ্চাকাঙ্খা হয় যে, উহা সমস্ত জগতের উপর চাপাইতে হইবে। তাহাদের সংস্কৃতিই কেন চাপানো হইবে? তদুত্তরে তাহারা বলে উহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন তাহা শ্রেষ্ঠ? কারণ উহা তাহাদের, তাই। আসুরী-সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তিই হোক বা তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যই হউক, এই তিন বস্তু তাহাদের চাই-ই চাই।

ব্রাহ্মণেরাও এই কথাই মনে করেন যে, তাঁহাদের সংস্কৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত জ্ঞান তাঁহাদের বেদে রহিয়াছে। কাজেই বৈদিক সংস্কৃতির বিজয় সারা জগতে হওয়া চাই। **'অগ্রতশ্চতুরো বেদান্ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ'** সম্মুখে চারি বেদ এবং পশ্চাতে শরযুক্ত ধনু,—এইরূপে সজ্জিত হইয়া পৃথিবীময় আপন সংস্কৃতির ধ্বজা উড্ডীন কর। কিন্তু পিছনে **'সশরং ধনুঃ'** থাকার অর্থ সম্মুখে ধৃত বেদ সমূহের ওখানেই শেষ। কোরাণে যাহা আছে তাহার সব কিছুই সত্য, মুসলমানগণ এরূপ মনে করেন। খ্রীস্টানদেরও ভাব তাহাই। অন্য ধর্মের লোক, যত উচ্চ স্তরেই পৌঁছিয়া থাকুন না কেন খ্রীস্টে বিশ্বাসী না হইলে তাঁহার উদ্ধার

নাই। ভগবানের মন্দিরের একটিই মাত্র দরজা তাঁহারা রাখিয়াছেন। উহার নাম খ্রীস্টদ্বার। সাধারণ মানুষ নিজেদের ঘরে বহু দরজা-জানালা রাখে। কিন্তু বেচারা ভগবানের মন্দিরে একটিমাত্র দরজা তাহারা রাখে।

"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।"

"আমি কুলীন, আমি শ্রীমান্, আমার সমান কেউ নয়।" ইহাই সকলের মনের অবস্থা। আমি কে? ভরদ্বাজ গোত্রের! আমার এই পরম্পরা বিনা বাধায় চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্যের অবস্থাও এইরূপ—আমার শিরায় নর্মান সর্দারদের রক্ত! আমাদের এখানে গুরুপরম্পরা আছে না? মূল আদিগুরু হইলেন শঙ্কর। তারপর ব্রহ্মদেব অথবা আর কেহ। তারপর নারদ, তারপর ব্যাস, তারপরে অন্য কোন ঋষি। তারপর মধ্যে আরও পাঁচ-দশটি নাম। তারপর আমার গুরু ও আমি—এইরূপ পরম্পরা বর্ণন করা হয়। এই বংশাবলী দ্বারা একথাই প্রমাণ করা হয় যে আমি শ্রেষ্ঠ, আমাদের সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ। তোমার সংস্কৃতি যদি উত্তমই হইবে ত তোমার কর্মে তাহা প্রকাশ কর! উহার প্রভা নিজের জীবনে প্রতিফলিত কর। কিন্তু তা হয় না। যে সংস্কৃতি আমাদের মনের মধ্যে নাই, আমাদের পরিবারে নাই, তাহা সারা জগতে বিস্তার করার আকাঙ্ক্ষা—এইরূপ বিচার-পদ্ধতিকে আসুরী বলে।

আমার সংস্কৃতি যেমন সুন্দর তেমনি জগতের সমস্ত সম্পত্তি রাখার যোগ্যও—আমিই। এই ভাব তাহাকে পাইয়া বসে। জগতের সমস্ত বিত্ত আমার চাই আর তাহা আমাকে পাইতেই হইবে। এই সম্পত্তি কেন পাওয়া চাই? সকলের মধ্যে সমানভাবে বাঁটিয়া দেওয়ার জন্য। এই জন্য আমরা সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে নিজেদের গাড়িয়া ফেলি। আকবর এ-কথাই বলিতেন না কি?—"রাজপুতেরা আজও আমার সাম্রাজ্যভুক্ত হচ্ছে না কেন? এক সাম্রাজ্য হলে শান্তি বিরাজ করবে!" আকবর সত্যই আন্তরিকভাবে একথা বিশ্বাস করিতেন। বর্তমান অসুরদের ধারণাও এইরূপ—সমস্ত সম্পদ একত্র করিতে হইবে। কেন? তাহা আবার সকলের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়ার জন্য।

তার জন্য আমার ক্ষমতা চাই। সকল ক্ষমতা এক হাতে কেন্দ্রীভূত

হওয়া চাই। সমস্ত জগৎ আমার শাসনাধীনে আসা চাই। আমার তন্ত্র অনুসারে স্ব-তন্ত্রের চলা চাই। যে আমার অধীন হইবে আমার তন্ত্র অনুসারে চলিবে, সে-ই স্ব-তন্ত্র (স্বাধীন)। এইরূপে সংস্কৃতি, সত্তা ও সম্পত্তি—এই তিন মুখ্য বিষয়ের উপর আসুরী সম্পদে জোর দেওয়া হয়।

এক সময়ে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব ছিল। তাঁহারা শাস্ত্র রচনা করিতেন, আইন প্রণয়ন করিতেন, রাজা তাঁহাদের মান্য করিত। সে যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের যুগ আসিল। ঘোড়া ছাড়া হইত। দিগ্বিজয় করা হইত। ক্ষত্রিয় সংস্কৃতি আসিল আর চলিয়াও গেল। ব্রাহ্মণ বলিত, "আমি শিক্ষাদাতা, অপর সকলে শিক্ষাগ্রহীতা। আমি ছাড়া গুরু কে?" ব্রাহ্মণদের আপন সংস্কৃতির অহংকার ছিল। ক্ষত্রিয়ের জোর ছিল ক্ষমতার উপর। "আজ একে মেরেছি, কাল ওকে মারব"—এইরূপ ছিল তাহার বড়াই। পরে বৈশ্যদের যুগ আসিল। "পিঠে মার, পেটে মেরো না"—এই ছিল বৈশ্যদের সমগ্র তত্ত্বজ্ঞানের মূল কথা। সব শিক্ষা পেটের শিক্ষা। "এ ধন আমার, আর ও ধনও পরে আমার হয়ে যাবে"—এই জপ আর এই ধ্যান। ইংরেজ কি বলিত না যে—স্বরাজ চাই ত নাও। কেবল আমাদের প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা আমাদের দাও। তারপর তোমরা তোমাদের সংস্কৃতির যেমন খুশি অধ্যয়ন কর। কৌপীন পর আর আপন সংস্কৃতি লইয়া বসিয়া থাক।" আজকাল যে যুদ্ধ হয় তাহা ব্যবসায়ের জন্যই। এ যুগও যাইবে—যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সব আসুরী সম্পদের রূপ।

॥ ৯৩ ॥ কাম-ক্রোধ-লোভ মুক্তির শাস্ত্রীয় সংযম-মার্গ

আসুরী সম্পদ দূর করার চেষ্টা করিতে হইবে। সংক্ষেপে আসুরী সম্পদ মানে "কাম, ক্রোধ, লোভ।" এই তিনটি জিনিস সারা সংসারকে নাচাইতেছে। এখন ঐ নাচ শেষ করিতে হইবে। উহা ছাড়িতেই হইবে। ক্রোধ ও লোভ কাম হইতে জন্মে। কামের অনুকূল পরিস্থিতিতে লোভ জন্মে এবং উহার প্রতিকূল অবস্থায় ক্রোধ জন্মে। গীতায় পদে পদে একথা বলা হইয়াছে যে এই তিন বিষয় হইতে দূরে থাক। ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে একথাই বলা হইয়াছে যে কাম ক্রোধ ও লোভ হইল

নরকের তিনটি সুবৃহৎ দরজা। এই দ্বারপথে অনেক গমনাগমন হয়। অনেক লোক যাতায়াত করে। নরকের রাস্তা খুব চওড়া। উহাতে মোটর চলে। পথে অনেক সঙ্গীও জুটে। কিন্তু সত্যের রাস্তা সংকীর্ণ।

এইরূপ যে কাম-ক্রোধ তাহা হইতে বাঁচার উপায় কি? সংযম মার্গ গ্রহণ করা। শাস্ত্রীয় সংযমের আশ্রয় লইতে হইবে। শাস্ত্র মানে সন্ত পুরুষদের অভিজ্ঞতা। প্রয়োগের দ্বারা সন্তগণ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহাই শাস্ত্র। সেই সংযম-সিদ্ধান্তের হাত ধর। ব্যর্থ শঙ্কা করিও না। কাম-ক্রোধ যদি জগৎ হইতে যায় ত জগতের কি হইবে? জগতের ত চলা চাই। অল্প হইলেও কাম-ক্রোধ রাখা দরকার নয় কি? অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ শঙ্কা করিতে যাইও না। কাম-ক্রোধ পুরামাত্রায় আছে। তোমার যতটা চাই তদপেক্ষা অনেক বেশী। তবে ব্যর্থ বুদ্ধিবিভ্রম সৃষ্টি করিতেছ কেন? কাম-ক্রোধ-লোভ তোমার যতটা চাই তাহা অপেক্ষা বেশীই আছে। কাম যদি যায় তবে সন্তান আসিবে কোথা হইতে—এইরূপ দুশ্চিন্তা করিও না। সন্তান যতই সৃষ্টি কর, একদিন আসিবে যখন মানুষের নাম পৃথিবী হইতে ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে। ইহা বৈজ্ঞানিকদের কথা। পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতেছে। এক সময় পৃথিবী অত্যন্ত গরম ছিল। তখন ইহাতে কোন জীব ছিল না। কোন প্রাণীর জন্মই হয় নাই। এক সময় আবার আসিবে যখন পৃথিবী অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং সারা জীব-সৃষ্টি লোপ পাইবে। ইহাতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগিবে। আপনারা যতই সন্তান সৃষ্টি করুন না কেন, অন্তিমে প্রলয় নিশ্চয় আসিবে। ভগবান যে অবতার গ্রহণ করেন তাহা ধর্মরক্ষার জন্য, সংখ্যা-রক্ষার জন্য নয়। যতদিন একজনও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি থাকিবে, যতদিন একজনও পাপভীরু ও সত্যনিষ্ঠ লোক থাকিবে, ততদিন চিন্তা নাই। তাহার উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি থাকিবে। যাহাদের সে ধর্ম মরিয়া গিয়াছে এইরূপ হাজার হাজার লোকের থাকা আর না-থাকা দুইই সমান।

এই সব কথা মনে রাখিয়া সৃষ্টিতে ঠিকমত থাক, সংযমে চল। খাম-খেয়ালী করিও না। লোক-সংগ্রহের অর্থ এই নয় যে লোকে যেমন বলে তেমনই চলিতে হইবে। মানুষের সংঘ বাড়াইয়া যাওয়া, সম্পত্তি রাশীকৃত করা—ইহাকে সংস্কার বলে না। বিকাশ সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়।

মানুষের সংখ্যা যদি অতি মাত্রায় বাড়িতে থাকে তবে মানুষ একে অন্যকে খুন করিতে থাকিবে। প্রথমে পশু-পক্ষী খাইয়া মানুষ মত্ত থাকিবে, পরে নিজের পুত্রকন্যাদের খাইতে আরম্ভ করিবে। কাম-ক্রোধে সার আছে একথা স্বীকার করিলে শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষকে ছিঁড়িয়া খাইবে তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। লোক-সংগ্রহের অর্থ লোককে সুন্দর ও বিশুদ্ধ নীতি-মার্গ প্রদর্শন করা। কাম-ক্রোধ আদি হইতে মুক্ত হওয়ার ফল পৃথিবী যদি মনুষ্য শূন্য হইয়া যায় ত মঙ্গলগ্রহে উহারা জন্মিবে—এই আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। অব্যক্ত পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি আমাদের ভাবনা ভাবিবেন। অতএব প্রথমে আমরা যেন মুক্ত হই। অনেক দূর-ভবিষ্যৎ দেখার দরকার নাই। সারা সৃষ্টি ও মানবজাতির চিন্তা করিও না। তুমি নিজের নৈতিক শক্তি বাড়াও। কাম-ক্রোধ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাও। "আপুলা তুঁ গলা ঘেঈ উগবুনি"—"আপন গলা ত আগে বাঁচাও। তোমার গলায় যে ফাঁস আঁটিতেছে তাহা হইতে আগে বাঁচ ত! এইটুকু করিতে পারিলে অনেক বড় কাজ হইবে।

সংসার-সমুদ্র হইতে অনেক দূরে তীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের মজা দেখিতে আনন্দ। যে সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে, যাহার নাকেমুখে জল ঢুকিতেছে, সমুদ্রে তাহার কি আনন্দ? সন্তপুরুষগণ সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আনন্দ উপভোগ করেন। সংসারে অলিপ্ত থাকার এই 'সন্তবৃত্তি' জীবনে গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোথাও আনন্দ নাই। অতএব পদ্মপত্রের মত অলিপ্ত থাক। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, "সন্ত পুরুষগণ পর্বতের উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া সেখান হইতে নীচেকার সংসার দেখেন। তাই এই সংসার তাঁহাদের নিকট ক্ষুদ্র মনে হয়।" আপনারাও উপরে উঠিয়া দেখুন, এই বিশাল বিস্তার তখন ক্ষুদ্র দেখাইবে। তখন সংসারে আর মনই বসিবে না।

সারাংশ, ভগবান এই অধ্যায়ে বলিতেছেন যে, আসুরী সম্পদ দূর করিয়া দৈবী সম্পদ্ লাভ কর। আসুন, আমরা সকলে সেইরূপ চেষ্টা করি।

রবিবার, ৫-৬-১৯৩২

সপ্তদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট ২—সাধকের কর্মসূচী

॥ ৯৪ ॥ সুনির্দিষ্ট আচরণে বৃত্তি মুক্ত থাকে

বন্ধুগণ,

আমরা ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ে আমরা জীবনের সম্পূর্ণ শাস্ত্র অবলোকন করিয়াছি। ষোড়শ অধ্যায়ে দেখিয়াছি এক পরিশিষ্ট। মানুষের মনে ও মনের প্রতিবিম্বস্বরূপ সমাজে দুই বৃত্তির বা দুই সংস্কৃতির বা দুই সম্পদের সংগ্রাম চলিতেছে। তার মধ্যে দৈবী সম্পদের বিকাশ করিতে হইবে এই শিক্ষা ষোড়শ অধ্যায়রূপ পরিশিষ্টে আমরা পাইয়াছি। আজ সপ্তদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিশিষ্টের আলোচনা করিব। একদিক হইতে এই অধ্যায়কে কর্মসূচী-যোগ বলা যাইতে পারে। গীতা এই অধ্যায়ে দৈনন্দিন কার্যসূচীর নির্দেশ করিতেছে। নিত্য-কর্ম আজিকার অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

যদি আমরা চাই যে আমাদের বৃত্তি মুক্ত ও প্রসন্ন থাকুক তাহা হইলে আমাদের ব্যবহারের এক ক্রম বাঁধিয়া লওয়া দরকার। আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম কোন এক নিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। মন তখনই মুক্ত রাখা যাইবে যখন সেই সীমার মধ্যে, সেই নির্দিষ্ট নিয়মে আমাদের জীবন চলিতে থাকিবে। নদী স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাহার প্রবাহ সীমায় বাঁধা। বদ্ধ না হইলে উহার মুক্তাবস্থা ব্যর্থ চলিয়া যাইত। জ্ঞানী পুরুষদের উদাহরণ চোখের সামনে আন। সূর্য জ্ঞানী পুরুষদের আচার্য। ভগবান প্রথমে সূর্যকে কর্মযোগ শিখান। সূর্য হইতে মনু অর্থাৎ বিচারশীল মানুষ তাহা পায়। সূর্য স্বাধীন ও মুক্ত। সে নিয়মে বদ্ধ, উহার মধ্যেই তাহার স্বতন্ত্রতার সার। ইহা আমাদের অভিজ্ঞতার কথা যে, কোন এক নির্দিষ্ট অভ্যস্ত রাস্তায় বেড়াইলে, রাস্তার দিকে নজর না দিয়া মনে চিন্তা করিতে করিতে চলা যায়। বেড়াইবার জন্য যদি নিত্য নতুন রাস্তা খোঁজা হয় তখন দৃষ্টি থাকে রাস্তার দিকে। মন তখন মুক্ত থাকিতে পারে না। সারাংশ, জীবন যাহাতে ভারস্বরূপ না হইয়া

আনন্দময় হয় সে জন্য আমাদের নিজেদের আচার-আচরণ নিয়মে বাঁধিয়া লওয়া কর্তব্য।

সেইজন্য ভগবান এই অধ্যায়ে কর্মসূচী নির্দেশ করিতেছেন। আমরা জন্মের সাথে সাথে তিন সংস্থা সঙ্গে লইয়া আসি। এই তিন সংস্থার কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া মানুষ যাহাতে সংসার সুখময় করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গীতা এই কর্মসূচী উপস্থিত করিতেছে। ঐ তিন সংস্থা কি কি? প্রথম সংস্থা আমাদের এই দেহ, দ্বিতীয় সংস্থা আমাদের চারিদিকে প্রসারিত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, এই অনন্ত সৃষ্টি, যার ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র আমি। আর তৃতীয় সংস্থা হইতেছে যে-সমাজে আমি জন্মিয়াছি সেই সমাজ। আমার জন্মের জন্য প্রতীক্ষাকারী আমার মা-বাবা, ভাইবোন, আশেপাশের পাড়া-প্রতিবেশিগণ। আমি প্রতিদিন আমার কাজে এই তিন সংস্থার ব্যবহার করি, উহাদের ক্ষীণ করি। গীতা চায় আমার দ্বারা এই সংস্থাত্রয়ের যে ক্ষয় হয় সতত চেষ্টা করিয়া আমি যেন তাহা পূরণ করি ও নিজের জীবন সার্থক করিয়া তুলি। এই সব সংস্থার প্রতি আমার যে জন্মজাত কর্তব্য তাহা নিরহঙ্কার ভাবনায় সম্পন্ন করা চাই।

এই সব কর্তব্য ত করিতে হইবে, কিন্তু উহা পূর্ণ করিবার যোজনা কি হইবে? যজ্ঞ, দান ও তপ—এই তিনের সংযোগে ঐ যোজনা প্রস্তুত করিতে হইবে। যদিও এই সকল শব্দের সহিত আমরা পরিচিত তবুও ইহাদের অর্থ আমরা ঠিক ঠিক বুঝি না। যদি অর্থ বুঝিয়া নিজেদের জীবনে সেইরূপ আচরণ করি তবে তিন সংস্থাই সফল হইবে এবং আমাদের জীবনও মুক্ত ও প্রসন্ন থাকিবে।

॥ ৯৫ ॥ উহার জন্য বিবিধ ক্রিয়াযোগ

এই অর্থ বুঝিবার জন্য প্রথমে আমরা দেখিব 'যজ্ঞ' বলিতে কি বুঝায়? সৃষ্টি-সংস্থা হইতে আমরা প্রতিদিন কাজ নেই। শত লোক কোন জায়গায় একত্র হইলে পরদিন দেখা যাইবে সেখানকার সম্পূর্ণ পরিবেশ দূষিত হইয়া গিয়াছে। সেখানকার হাওয়া আমরা দূষিত করিয়া ফেলি, স্থানটা নোংরা করিয়া ফেলি। খাদ্য গ্রহণ করি আর সঙ্গে

সঙ্গে সৃষ্টিরও ক্ষয় করি। সৃষ্টি-সংস্থার এই ক্ষয় অবশ্য পূরণ করিতে হইবে। আর সে জন্য যজ্ঞ ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি? সৃষ্টির যে হানি হইয়াছে তাহা পূরণ করাই 'যজ্ঞ'। হাজার হাজার বছর ধরিয়া আমরা চাষ-আবাদ করিয়া আসিতেছি। ফলে জমির উর্বরতা কমিয়া যাইতেছে। যজ্ঞ বলে, "পৃথিবীকে তার সামর্থ্য ফিরিয়ে দাও। জমি চাষ কর, তার মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করাও, সার দাও।" ক্ষয় পূরণ করা যজ্ঞের এক উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্যবহৃত জিনিসের শুদ্ধীকরণ। আমরা কূয়া ব্যবহার করি। আশপাশ নোংরা হইয়া যায়। কূয়ার ধারের এই নোংরা পরিবেশ শুদ্ধ করা চাই। সেখানকার নোংরা জল নিকাশ করা চাই। কাদা সরাইয়া ফেলা চাই। ক্ষতিপূরণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিছু নির্মাণ কার্যও করা চাই। এই তৃতীয় বিষয়ও যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। আমরা কাপড় পরি। আমাদের উচিত প্রতিদিন সুতা কাটিয়া তাহার পুনর্নিমাণ করা। কাপাস জন্মানো, ধান ফলানো, সুতা কাটা, এ সবই যজ্ঞক্রিয়া। যজ্ঞের জন্য যাহা প্রস্তুত হইবে তাহা স্বার্থের জন্য হইবে না। আমরা যাহা ক্ষয় করিয়াছি তাহা পূরণ করার কর্তব্য-ভাবনা হইতে উহা উৎপন্ন করিতে হইবে। ইহা পরোপকার নয়। আমরা ত আগে হইতেই ঋণী হইয়া আছি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ঋণ মাথায় চাপিয়া আছে। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য যাহা কিছু উৎপাদন করি তাহা যজ্ঞ অর্থাৎ সেবা। পরোপকার নয়। ঐ সেবার দ্বারা আমরা ঋণ পরিশোধ করি। আমরা পদে পদে সৃষ্টি-সংস্থার ব্যবহার করি। অতএব উহার ক্ষয় পূরণের জন্য, উহার শুদ্ধির জন্য ও নূতন উৎপাদনের জন্য যজ্ঞ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় সংস্থা হইল আমাদের মনুষ্য-সমাজ। মা-বাবা, গুরু, মিত্র— ইঁহারা সকলেই আমাদের জন্য খাটেন। সমাজের এই ঋণ পরিশোধের জন্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দানের অর্থ হইল সমাজের ঋণ পরিশোধের জন্য কৃত কর্ম। দানের অর্থ পরোপকার নয়। সমাজের নিকট হইতে আমি অপার সেবা লইয়াছি। যখন আমি পৃথিবীতে আসি তখন দুর্বল ছিলাম, অসহায় ছিলাম। এই সমাজ আমাকে ছোট হইতে বড় করিয়াছে। সেইজন্য সমাজের সেবা আমাকে করিতেই হইবে। কাহারও নিকট হইতে কিছু না লইয়া সেবা করাকে পরোপকার বলে। কিন্তু এ স্থলে ত

আমরা আগেই সমাজের নিকট হইতে পরিপূর্ণভাবে লইয়া রাখিয়াছি। সমাজের এই ঋণ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য যে সেবা করা হয় তাহা দান। মনুষ্য-সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করার নাম দান। সৃষ্টির ক্ষয় পূরণের জন্য কৃত শ্রমকে বলে 'যজ্ঞ'। সমাজের ঋণ পরিশোধের জন্য শরীর, মন, ধন ও অন্য সাধন দ্বারা সহায়তা করার নাম দান।

ইহা ছাড়া তৃতীয় এক সংস্থা আছে। তাহা হইতেছে শরীর। শরীরও দিন দিন ক্ষয় পাইতে থাকে। আমরা মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলের নিকট হইতে কাজ আদায় করি, ইহাদের ক্ষয় করি। এই শরীররূপী সংস্থায় যে বিকার, যে দোষ জন্মে তাহার শুদ্ধির জন্য তপের ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

সুতরাং সৃষ্টি, সমাজ ও শরীর এই তিন সংস্থার কাজ যাহাতে উত্তম-রূপে চলে সেই ভাবে আমাদের চলা কর্তব্য। অনেক প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সংস্থা আমরা নির্মাণ করি। কিন্তু এই তিন সংস্থা আমাদের সৃষ্ট নয়। এই তিনটি সংস্থা স্বভাব-প্রাপ্ত। ইহারা কৃত্রিম সংস্থা নয়। অতএব এই তিন সংস্থার হানি যজ্ঞ-দান-তপ এই সাধন দ্বারা পূর্ণ করা আমাদের স্বভাবপ্রাপ্ত ধর্ম। যদি আমরা এই ধর্ম অনুসরণ করি তবে আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে অজ্ঞাতেই সে সকল শক্তি তাহাতে নিয়োজিত হইবে, অন্য কাজের জন্য আর শক্তি অবশিষ্ট থাকিবে না। সৃষ্টি, সমাজ আর এই দেহ—এই তিন সংস্থাকে সুন্দর রাখার জন্য আমাদের সকল শক্তি নিঃশেষে ব্যয় করিতে হইবে। কবীরের মত আমরাও যদি বলিতে পারি, "প্রভু, যে চাদর তুমি দিয়েছিলে তা যেমন দিয়েছিলে তেমনই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ভাল করে দেখে নাও,—তবে তাহা অপেক্ষা মহান্ সাফল্য আর কি হইতে পারে! কিন্তু এরূপ সফলতা প্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞ-দান-তপরূপ ত্রিবিধ কার্যক্রম অনুসরণ করা চাই।

যজ্ঞ, দান ও তপের মধ্যে কার কি পার্থক্য তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু সত্য বলিতে কি কোন প্রভেদ নাই। কারণ সৃষ্টি সমাজ আর শরীর —এই তিন আদৌ ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা নয়। এই সমাজ সৃষ্টির বাহিরে নয়। এই শরীরও সৃষ্টির বাইরে নয়। তিনে মিলিয়া এক দিব্য সৃষ্টি-সংস্থা গড়িয়া উঠে। সেইজন্যই আমরা যে উৎপাদক শ্রম করি, যে দান করি, যে তপ করি

ব্যাপক অর্থে উহাদের 'যজ্ঞ' বলা যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে গীতা 'দ্রব্য-যজ্ঞ', 'তপোযজ্ঞ' ইত্যাদি যজ্ঞের কথা বলিয়াছে। গীতা যজ্ঞের অর্থ বিশাল করিয়া দিয়াছে।

এই তিন সংস্থার জন্য আমরা যত কিছু সেবা কর্ম করিব তাহা সবই যজ্ঞরূপে হওয়া চাই। ঐ সেবা নির্লিপ্ত থাকিয়া করিতে হইবে। এই সেবায় ফলের আকাঙ্ক্ষা করা চলিবে না, কারণ ফল ত আমরা পূর্বেই লইয়া রাখিয়াছি। ঋণ আগেই মাথায় চাপিয়া গিয়াছে। যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা ফেরৎ দিতে হইবে। যজ্ঞের দ্বারা সৃষ্টিসংস্থা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, দানের দ্বারা সমাজে সাম্যাবস্থা আসে, আর তপের দ্বারা শরীরের সাম্যাবস্থা রক্ষিত হয়। এইরূপে তিন সংস্থারই সাম্যাবস্থা রক্ষার জন্যই এই ত্রিবিধ কার্যক্রম। ইহাদ্বারা শুদ্ধি আসিবে, দূষিত ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে।

এই যে সেবা তাহা করার জন্য কিছু ভোগও গ্রহণ করিতে হইবে। ভোগও যজ্ঞেরই এক অঙ্গ। এই ভোগকে গীতা 'আহার' বলিয়াছে। এই শরীররূপী যন্ত্রে অন্নরূপ কয়লা দেওয়া আবশ্যক। যদিও এই আহার স্বয়ং যজ্ঞ নয় তবুও যজ্ঞ সিদ্ধ করার জন্য ইহা অবশ্যই এক অঙ্গ। আমরা তাই বলি—

উদরভরণ নোহে জাণিজে যজ্ঞকর্ম

'ইহা উদরপূর্তি নয়, ইহাকে যজ্ঞকর্ম বলিয়া জানিবে।' বাগান হইতে ফুল আনিয়া দেবতার পায়ে অর্পণ করা পূজা। কিন্তু ফুল উৎপন্ন করার জন্য বাগানে যে মেহমত করা হয় তাহাও পূজা-ই। যজ্ঞ পূর্ণ করার জন্য যে সব ক্রিয়া করা হয় তাহাও এক প্রকারের পূজা। দেহকে আহার দিলেই না সে কাজের উপযোগী থাকিবে। যজ্ঞের সাধনরূপ যে কর্ম তাহাও যজ্ঞ। গীতা এই সব কর্মকে "তদর্থীয় কর্ম"—যজ্ঞার্থ কর্ম বলে। সেবার জন্য এই শরীর সতত কার্যক্ষম থাকে সেই জন্য এই শরীরে আমি যে আহুতি দিই, সেই আহুতি যজ্ঞরূপ। সেবার নিমিত্ত আহার গ্রহণ করা পবিত্র কর্ম।

এই সব কথার মূলে আবার শ্রদ্ধা থাকা চাই। সকল সেবা পরমেশ্বরে

অর্পণ করার ভাব থাকা চাই। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধি ছাড়া সেবাময়তা আসে না। ঈশ্বরার্পণতাই প্রধান বস্তু একথা ভুলিলে চলিবে না।

॥ ৯৬ ॥ সাধনার সাত্ত্বিকীকরণ

কিন্তু আমরা কখন আমাদের সমস্ত ক্রিয়া ঈশ্বরে অর্পণ করার যোগ্য হইব? তখনই যখন উহারা সাত্ত্বিক হইবে। যখন আমাদের সকল কর্ম সাত্ত্বিক হইবে তখনই উহারা ঈশ্বরে অর্পণ করার যোগ্য হইবে। যজ্ঞ, দান ও তপ—সবই সাত্ত্বিক হওয়া চাই। ক্রিয়া কিভাবে সাত্ত্বিক করিতে হয় সেই তত্ত্ব আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখিয়াছি। এই অধ্যায়ে গীতা সেই তত্ত্ব বিনিয়োগের কথা বলিতেছে।

সাত্ত্বিকতার এই ব্যবস্থা গীতা দুই উদ্দেশ্যে করিয়াছে। বাহিরে যজ্ঞ-দান-তপরূপ যে বিশ্বসেবা চলিতেছে, তাহাকেই ভিতরের দিক হইতে আধ্যাত্মিক সাধনা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সৃষ্টির সেবা ও সাধনা এই দুইয়ের কার্যক্রম ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত নয়। সেবা ও সাধনা এই দুইটি ভিন্ন বস্তুই নয়। দুইয়ের জন্য একই প্রযত্ন, একই কর্ম! এই ভাবে যে কর্ম করা যায় তাহাও শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরার্পণ করিতে হইবে। সমাজ-সেবা+সাধনা+ঈশ্বরার্পণতা—এই যোগ একই ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া চাই।

যজ্ঞকে সাত্ত্বিক করার জন্য দুই বস্তু দরকার। নিষ্ফলতার অভাব ও সকামতার অভাব এই দুই বস্তু যজ্ঞে থাকা চাই। যজ্ঞে যদি সকামতা থাকে তবে তাহা রাজস হইবে, আর নিষ্ফলতা থাকে ত তাহা তামস হইবে।

সূতা কাটা এক যজ্ঞ। কিন্তু সূতা কাটার সময় যদি আমরা উহাতে হৃদয় ঢালিয়া না দিই, যদি চিত্তের একাগ্রতা না আসে তবে সেই সূত্রযজ্ঞ জড়বৎ হইবে। বাহিরে হাত কাজ করিতেছে তাহার সহিত ভিতর হইতে যদি মনের যোগ না হয় ত সেই কর্ম বিধিহীন হইয়া যাইবে। বিধিহীন কর্ম জড় কর্ম। বিধিহীন কর্মে তমোগুণ আসে। ঐ ক্রিয়া দ্বারা উৎকৃষ্ট বস্তুর নির্মাণ হইতে পারে না। উহা হইতে ফলের নিষ্পত্তি হইবে না। যজ্ঞে

সকামতা থাকিবে না তবুও তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হওয়া চাই। কর্মে যদি মন না থাকে, আত্মোৎসর্গ না থাকে, তবে সে কর্ম বোঝা-স্বরূপ হইবে। তবে আর তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ফল কিরূপে লাভ হইবে? বাহিরের কাজ যদি বিগড়াইয়া যায় তবে নিশ্চিত জানিবে যে ভিতরে মনের যোগ ছিল না। অতএব কর্মে নিজের আত্মা ঢালিয়া দাও। অন্তরের যোগ রাখো। সৃষ্টি-সংস্থার ঋণ পরিশোধ করার জন্য আমাদিগকে উৎকৃষ্ট ফলোৎপত্তি করিতে হইবে। কর্মে ফলহীনতা যেন না আসে, সে জন্য কর্মের সহিত অন্তরের বিধিসম্মত সহযোগ থাকা চাই।

এই ভাবে আমাদের অন্তরে যখন নিষ্কামতা আসিবে এবং বিধিপূর্বক সফল কর্ম নিষ্পন্ন হইতে থাকিবে তখনই আমাদের চিত্তশুদ্ধি আরম্ভ হইবে। চিত্তশুদ্ধির পরীক্ষা কি? বাহিরের কর্ম পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাহা যদি নির্মল ও সুন্দর না হয় তবে চিত্ত মলিন একথা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। কর্মে সৌন্দর্যই বা কখন আসে? শুদ্ধচিত্তে পরিশ্রম সহকারে কৃত কর্মের উপর ভগবান আপন অনুমোদনের, আপন প্রসন্নতার ছাপ আঁকিয়া দেন। তুষ্ট পরমেশ্বর কর্মের পিঠে যখন প্রেমের হাত বুলান তখন তাহাতে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। সৌন্দর্য মানে পবিত্র শ্রমের উপর প্রাপ্ত ঈশ্বরীয় প্রসাদ। মূর্তি গড়িতে গড়িতে শিল্পী যখন তন্ময় হইয়া যায় তখন তাহার মনে হয় এ মূর্তি আমি গড়ি নাই। মূর্তির আকার গড়িতে গড়িতে অন্তিম ক্ষণে কে জানে কোথা হইতে আপনা-আপনি মূর্তিতে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে! চিত্তশুদ্ধি ছাড়া এই ঈশ্বরীয় কলা প্রকট হইতে পারে কি? মূর্তিতে যে সরসতা, যে মাধুর্য—তাহা নিজ অন্তঃকরণের সমস্ত সৌন্দর্য নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়ারই ফল। মূর্তি মানে আমাদের চিত্তের প্রতিমা। আমাদের সকল কর্ম আমাদের মনেরই প্রতিমূর্তি। মন সুন্দর হইলে ঐ কর্মময় মূর্তিও সুন্দর হইবে। বাহিরের কর্মের শুদ্ধি মনের শুদ্ধি দিয়া আর মনের শুদ্ধি বাহিরের কর্ম দিয়া যাচাই করিতে হইবে।

আর একটি কথা। তাহা এই যে এই সব কর্মে মন্ত্রও থাকা চাই। মন্ত্রহীন কর্ম ব্যর্থ। সূতা কাটার সময় এই মন্ত্র মনে রাখিতে হইবে, এই সূতা কাটা দ্বারা আমি গরীব জনগণের সহিত যুক্ত হইতেছি। এই মন্ত্র যদি হৃদয়ে না থাকে তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সূতা কাটাও বৃথা যাইবে।

ঐ ক্রিয়া দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে না। কাপাসের পাঁজ হইতে অব্যক্ত পরমাত্মা সূত্ররূপে প্রকট হইতেছেন, এই মন্ত্র ক্রিয়াতে জুড়িয়া দাও এবং তারপর ঐ ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য কর। ঐ ক্রিয়া অতি সাত্ত্বিক ও সুন্দর হইবে। ঐ ক্রিয়া পূজা হইবে, যজ্ঞরূপ সেবা হইবে। ঐ সামান্য সূতা দ্বারা আমরা সমাজের সহিত, জনতার সহিত, জগদীশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া যাইব। বালকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখে মাতা যশোদা সারা বিশ্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রময় সূতার তারেও তুমি বিশাল বিশ্ব দেখিতে পাইবে।

॥ ৯৭ ॥ আহার-শুদ্ধি

এইরূপ সেবার জন্য আহারশুদ্ধিও প্রয়োজন। যেমন আহার তেমন মন। আহার পরিমিত হওয়া চাই। খাদ্য কি হইবে তাহা অপেক্ষা কতটা হইবে তাহার মূল্য অধিক। খাদ্য নির্বাচনের গুরুত্ব নাই তাহা নয়। কিন্তু যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহা উচিত মাত্রায় গ্রহণ করি কি-না তাহার গুরুত্ব অধিক।

আমরা যাহা খাই তাহার পরিণাম ত আছেই। আমরা খাই কেন? উৎকৃষ্ট সেবা করার জন্য। আহার যজ্ঞেরই অঙ্গ। সেবারূপ যজ্ঞকে ফলপ্রদ করার জন্য আহারের আয়োজন। এই দৃষ্টিতে আহারকে দেখ। আহার শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। ব্যক্তি নিজ জীবনে কতটাআহার-শুদ্ধি করিতে পারে তাহার কোন সীমা-রেখা নাই। কিন্তু আমাদের সমাজ আহার-শুদ্ধির জন্য যথেষ্ট তপস্যা করিয়াছে। আহার-শুদ্ধির জন্য ভারতে বিশাল প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ সব পরীক্ষা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। উহার জন্য কত যে তপস্যা করিতে হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই ভূমণ্ডলে একমাত্র ভারতবর্ষই সেই দেশ যেখানে এক-এক জাতির লোক সম্পূর্ণভাবে মাংসাহার হইতে মুক্ত হইয়াছে। যে সকল জাতির লোক মাংসাহার করে তাহাদের আহারেও মাংস নিত্যবস্তু অথবা মুখ্যবস্তু নয়। আর যাহারা মাংস খায় তাহারাও তজ্জন্য নিজেদের কিছুটা হীন মনে করে। মনে মনে তাহারাও মাংস ত্যাগ করিয়া বসিয়াছে। মাংসাহারের প্রবৃত্তি রোধ করার জন্য যজ্ঞের প্রচলন হয়। আবার যজ্ঞ বন্ধও

হইয়া যায় উহারই জন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত যজ্ঞের ব্যাখ্যাই বদলাইয়া দেন। তিনি দুধের মহিমা বাড়াইয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ কার্য কিছু কম করেন নাই, কিন্তু ভারতের জনসাধারণ কোন্ কৃষ্ণের আকর্ষণে পাগল ? ভারতের জনতার কাছে ত 'গোপাল কৃষ্ণ' নামই অধিক প্রিয়। সেই কৃষ্ণ, যাঁহার পাশে গাভী বসিয়া আছে, অধর-ওষ্ঠে যাঁহার মুরলী, এইরূপ যে গো-সেবক গোপালকৃষ্ণ আবাল-বৃদ্ধ তাঁহাকেই জানে। মাংসাহার বন্ধের ফলে গো-রক্ষার পথ সুগম হয়। গো-দুগ্ধের মহিমা বাড়ে এবং মাংসাহার কমিয়া যায়।

তাহা হইলেও পূর্ণ আহারশুদ্ধি হইয়াছে তা নয়। আমাদের তাহা অগ্রসর করিতে হইবে। বাঙালীরা মাছ খায় বলিয়া অনেকে আশ্চর্য হয়। কিন্তু ইহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া ঠিক নয়। বাংলায় কেবল ধান উৎপন্ন হয়। উহা দ্বারা শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টি লাভ হয় না। এদিকে গবেষণার আবশ্যকতা আছে। মাছের পরিবর্তে কি রকম শাকসব্জি খাইলে মাছের তুল্য পুষ্টি পাওয়া যায় সেই পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। ইহার জন্য অসামান্য ত্যাগী পুরুষের জন্ম হইবে আর এরূপ পরীক্ষা চলিবে। এইরূপ ব্যক্তিরাই কেবল সমাজকে আগে লইয়া যায়। সূর্য জ্বলিতে থাকে তাই না জীবন ধারণের উপযোগী আটানব্বই ডিগ্রী তাপ আমরা শরীরের জন্য পাইয়া থাকি। সমাজে যখন জ্বলন্ত বৈরাগ্য-সূর্যের আবির্ভাব হয় এবং তিনি যখন একান্ত শ্রদ্ধা সহকারে পরিস্থিতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিনা পাখায় ধ্যেয়াকাশে উড়িতে থাকেন কেবল তখনই সংসারোপযোগী অল্পস্বল্প বৈরাগ্য আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মাংসাহার বন্ধ করার জন্য ঋষিদের কতই না তপস্যা করিতে হইয়াছে, কতই না জীবন-দান করিতে হইয়াছে! সেই সব কথা আজ এই প্রসঙ্গে আমার মনে জাগিতেছে।

সারাংশ, আমাদের সমষ্টিগত আহারশুদ্ধি এ পর্যন্ত এতটা অগ্রসর হইয়াছে। অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যাহা উপার্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা যেন আমরা না খোয়াইয়া বসি। ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিশেষত্ব যেন আমরা না ডুবাই। যে কোন রকমে বাঁচিয়া থাকা ত কথা নয়। কোন রকমে যে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহার কাজ সোজা। পশুও ত কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে। আমরাও কি তবে

পশুরই সমান ? পশু ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান আছে। সেই ব্যবধানের প্রসারকেই সংস্কৃতির প্রসার বলা হয়। আমাদের দেশ মাংসাহার ত্যাগের খুব বড় প্রয়োগ করিয়াছে। তাহা আরও অগ্রসর করিয়া দাও। অন্ততঃ পক্ষে যে পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছি তাহার পিছনে যেন ফিরিয়া না যাই।

এই কথা বলার হেতু আজকাল অনেকেরই কাছে মাংসাহার ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। আজকাল পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতি একে অন্যের উপর প্রভাব ফেলিতেছে। আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ইহার পরিণাম ভালই হইবে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের জড়-শ্রদ্ধা নড়িয়া যাইতেছে। অন্ধ-শ্রদ্ধা নষ্ট হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। যাহা ভাল তাহা টিকিবে, মন্দ পুড়িয়া ছাই হইবে। অন্ধ শ্রদ্ধা গিয়া তাহার স্থলে অন্ধ-অশ্রদ্ধার উৎপত্তি বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রদ্ধাই যে কেবল অন্ধ হয় তাহা নয়। অন্ধ বিশেষণের ঠিকাদায়ী শ্রদ্ধাই কেবল লইয়াছে তাহা নয়। অশ্রদ্ধাও অন্ধ হইতে পারে।

মাংসাহারের বিষয়ে আজকাল আবার চিন্তন মনন আরম্ভ হইয়াছে। যাহাই হউক, কোন নবীন চিন্তা দেখা দিলে আমার আনন্দ হয়। মনে হয় লোক জাগ্রত হইতেছে আর ধাক্কা দিতেছে। জাগৃতির লক্ষণ দেখিলে আমার ভাল লাগে। কিন্তু জাগ্রত হইয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে তখনই চলিতে গেলে পতনের আশঙ্কা থাকে। তাই পূর্ণ জাগৃতি না হওয়া পর্যন্ত, চক্ষু পুরা না খোলা পর্যন্ত, হাত-পা সীমাবদ্ধ রাখা ভাল। খুব বিচার করুন। এদিক ওদিক সব দিক হইতে বিচার করুন। ধর্মের উপর বিচারের কাঁচি চালান। এই বিচাররূপী কাঁচিতে যে ধর্ম কাটা পড়িবে জানিবেন তাহার মূল্য কিছুই নয়। এভাবে যাহা কাটা-ছাঁটা যায় তাহা যাইতে দিন। আপনার কাঁচিতে যাহা কাটে না, উল্টা আপনার কাঁচি যাহাতে ভাঙ্গে সেই ধর্মই খাঁটি। ধর্মের বিচারে ভয় নাই। অতএব বিচার করিতে থাকুন কিন্তু কাজ হঠাৎ আরম্ভ করিবেন না। অর্ধজাগ্রত অবস্থায় কাজ করিতে গেলে পড়িয়া যাইবেন। চিন্তার মন্থন জোরে চলুক। কিন্তু আচার কিছুক্ষণ সামলাইয়া তারপর করুন। নিজের কাজে সংযম রক্ষা করুন। পূর্ব-পুণ্য খোয়াইয়া বসিবেন না।

॥ ৯৮ ॥ অবিরোধী জীবনে গীতার যোজনা

আহারশুদ্ধি হইতে চিত্তশুদ্ধি আসিবে। শরীরেও বল লাভ হইবে। সমাজসেবা উত্তমরূপে হইতে থাকিবে, চিত্তে সন্তোষ থাকিবে। সমাজে সন্তোষ বাড়িবে। যে সমাজে যজ্ঞ-দান-তপ ক্রিয়া বিধিমত ও মন্ত্র অনুযায়ী চলে সে সমাজে বিরোধ দেখা দেয় না। দুইখানি আয়না মুখামুখি রাখিলে যেমন ইহাতে উহা আর উহাতে ইহা দেখা যায়, সেইরূপ বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ন্যায় অনুসারে ব্যক্তি ও সমাজে সন্তোষ প্রতিফলিত হইবে। যাহাতে আমার সন্তোষ তাহাতে সমাজের সন্তোষ আর সমাজের সন্তোষে আমারও সন্তোষ। উভয় সন্তোষ পরীক্ষা করার সুযোগ হইবে, আর দেখা যাইবে যে উহারা একরূপই বটে। সর্বত্র অদ্বৈতের অনুভব হইবে। দ্বৈত এবং দ্রোহের অন্ত হইবে। এইরূপ সুব্যবস্থা যে যোজনা দ্বারা হইতে পারে তাহাই গীতা প্রতিপাদন করিতেছে। আমরা যদি আমাদের প্রতিদিনের কার্যক্রম গীতার নির্দেশ অনুযায়ী করিয়া লই তবে কতই না ভাল হয়!

কিন্তু আজ ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সেই বিরোধ কিরূপে দূর করা যাইবে সে চর্চা সর্বত্র চলিতেছে। ব্যক্তি ও সমাজ এই দুইয়ের সীমা কোথায়? ব্যক্তি গৌণ, কি সমাজ গৌণ? শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি? ব্যক্তিবাদে সমর্থক কিছু লোক সমাজকে জড় মনে করে। সেনাপতির কাছে কোন সৈনিক আসিলে সেনাপতি তাহার সহিত সৌম্য ভাষায় কথা বলে। তাহাকে 'আপনি' বলে। কিন্তু সৈন্যদলকে সে যেমন খুশি হুকুম করে। সৈন্যবাহিনী যেন অচেতন পদার্থ, যেন কাঠের গুঁড়ি—এখান হইতে সেখানে রাখে আর সেখান হইতে এখানে আনে। ব্যক্তি চৈতন্যময়। সমাজ জড়। এই অনুভব এখানেও হইতেছে। আমার সামনে আপনারা দুই-তিন শত লোক রহিয়াছেন। আপনাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক আমি বলিয়া যাইতেছি। মনে যাহা আসিতেছে বলিতেছি। আপনারা যেন জড় পদার্থ! কিন্তু আমার সামনে কোন এক ব্যক্তি আসিলে তাহার কথা আমার শুনিতে হইবে এবং বিচার করিয়া জবাবও দিতে হইবে। কিন্তু এখানে আমি আপনাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসাইয়া রাখিয়াছি।

"সমাজ জড় আর ব্যক্তি চৈতন্যময়"—এরূপ বলিয়া কেহ কেহ ব্যক্তি-

চৈতন্য-বাদ প্রতি-পাদন করে আবার কেহ কেহ সমাজকে গুরুত্ব দেয়। আমার চুল পড়িয়া গিয়াছে, হাত অসাড় হইয়াছে, চোখের দৃষ্টি গিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে, এমন কি একটি ফুসফুসও নষ্ট হইয়াছে, তবুও আমি বাঁচিয়া আছি। কেননা পৃথক পৃথকভাবে এক একটি অবয়ব জড়। উহাদের কোন একটি অঙ্গের নাশ হইলে সর্বনাশ হয় না। সব অঙ্গ মিলিয়া যে শরীর তাহা চলিতেই থাকে। এইরূপ এই দুই পরস্পরবিরোধী বিচারধারা রহিয়াছে। আপনারা যেমন দৃষ্টিতে দেখিবেন তেমনই আপনাদের নিকট উহা প্রতিভাত হইবে। যেমন দৃষ্টি তেমন প্রাপ্তি। যে রঙের চশমা, সেই রঙেরই এই সৃষ্টি।

কেহ ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয় আর কেহ সমাজকে। ইহার কারণ এই সমাজে জীবন-সংগ্রামের ভাবধারা বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু জীবন কি কলহের নিমিত্ত? তাহা অপেক্ষা আমরা মরিয়া যাই না কেন? কলহ ত মরণের জন্যই। সেই কারণেই স্বার্থে ও পরমার্থে আমরা ভেদ করি। স্বার্থে ও পরমার্থে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম ভেদ কল্পনা করিয়াছিল বলিহারী তাহার বুদ্ধির! যে বস্তুর আসলে অস্তিত্বই নাই তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করার সামর্থ্য যে বুদ্ধির হইয়াছিল তাহা লইয়া কৌতুক করিতে ইচ্ছা হয়। যে ভেদ নাই তাহা সে উপস্থিত করিল এবং লোককে শিখাইল, একথা ভাবিয়া অবাক হই। একাজ চীনের দেওয়ালের মতই। দিগন্তকে সীমাবদ্ধ করিয়া উহার ওদিকে আর কিছু নাই এরূপ মনে করার মতই এই ব্যাপার। এই সব কারণেই আজ যজ্ঞময় জীবনের অভাব ঘটিয়াছে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজে ভেদ দেখা দিয়াছে।

কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজে বাস্তবিক কোন ভেদ করা যায় না। কোন কামরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার জন্য যদি পর্দা ঝুলানো হয়, আর পর্দাটি যদি হাওয়ায় দুলিয়া আগে-পিছে করিতে থাকে তবে কখনও এই ভাগ বড় মনে হয়, কখনও ঐ ভাগ। হাওয়ায় পর্দার ঢেউ খেলানর উপর কোনটা কতটা তাহা নির্ভর করে। ঐ বিভাগ স্থায়ী নয়। গীতার শিক্ষা এই সব বিবাদের উর্ধ্বে। এই বিবাদ কাল্পনিক। গীতা অন্তঃশুদ্ধির নিয়ম পালন করিতে বলে। তাহা করিলে ব্যক্তি ও সমাজের হিতে কোন বিরোধ দেখা দিবে না। একে অপরের হিতের ঘাতক হইবে না। এই বাধা, এই বিরোধ

দূর করাই গীতার বিশেষত্ব। গীতার এই নিয়ম একজন লোকও যদি অনুসরণ করে ত সেই একের দ্বারাই সারা দেশ সমৃদ্ধ হইবে। দেশ মানেই দেশের মানুষ। যে দেশে এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ও আচারসম্পন্ন ব্যক্তি নাই সে দেশকে দেশ কিরূপে বলা যাইবে? ভারত মানে কি? ভারত মানে রবীন্দ্রনাথ, ভারত মানে গান্ধী বা তাঁদের মত পাঁচ-সাত-দশজন। বাহিরের জগৎ ভারতের ধারণা এই পাঁচ-সাত-দশ ব্যক্তি দ্বারা করিয়া থাকে। প্রাচীন-কালের দুই-চার ব্যক্তি, মধ্যযুগের পাঁচ-সাত জন ও বর্তমান কালের আট-দশ ব্যক্তি নিন আর তাঁহাদের সহিত হিমালয়, গঙ্গা আদি জুড়িয়া দিন—হইয়া গেল ভারতবর্ষ। ইহাই ভারতের ব্যাখ্যা। বাকী সব এই ব্যাখ্যার ভাষ্য। ভাষ্য মানে সূত্রের বিস্তার। দুধ হইতে দধি আর দধি হইতে ঘোল-মাখন! বিবাদ দুধ-দই, ঘোল-মাখন প্রভৃতির নয়। দুধের গুণাগুণ তার মাখনের পরিমাণে। সেইরূপ সমাজের গুণাগুণ সমাজের ব্যক্তি দ্বারা নির্ণীত হয়। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিরোধ থাকিবেই বা কি প্রকারে? ব্যক্তি-ব্যক্তির মধ্যেও বিরোধ হওয়া উচিত নয়। এক ব্যক্তি হইতে যদি অপর ব্যক্তি অধিক সম্পন্ন হয় ত তাহাতে কি ক্ষতি হয়? কেহ বিপন্ন অবস্থায় না থাকে আর বিত্তবানের বিত্ত সমাজের কাজে লাগে এইরূপ হইলেই ত হইল। পয়সা আমার ডান পকেটে থাকিলেই বা কি, আর বাম পকেটে থাকিলেই বা কি? দুই পকেটই ত আমার। কোন ব্যক্তি যদি সম্পন্ন হয় তার ফলে আমিই সম্পন্ন হই, দেশ সম্পন্ন হয়—এই যুক্তি সিদ্ধ করা যাইতে পারে।

কিন্তু আমরা ভেদ উপস্থিত করি। দেহ ও মুণ্ড পৃথক হইলে উভয়েই মরিবে। অতএব ব্যক্তি ও সমাজে ভেদ করিও না। একই ক্রিয়া কিরূপে স্বার্থ ও পরমার্থের পক্ষে অবিরোধী হইয়া উঠে ইহাই গীতার শিক্ষা। আমার ঘরের হাওয়ায় আর বাহিরের অনন্ত হাওয়ায় বিরোধ নাই। বিরোধের কল্পনা করিয়া আমি যদি ঘর বন্ধ করিয়া দিই তবে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইব। অবিরোধ কল্পনা করিয়া আমাকে ঘর খুলিতে দাও, অনন্ত হাওয়া ঘরে প্রবেশ করিবে। যে মুহূর্তে আমি নিজের জমি ও নিজের ঘর অপরের জমি ও ঘর হইতে আলাদা করিয়া লই, সেই মুহূর্তেই আমি জগতের অনন্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই। আমার সেই

ছোট ঘরখানি পুড়িয়া যায়, পড়িয়া যায় ত আমার সর্বস্ব গিয়াছে বলিয়া কাঁদিতে বসি। কিন্তু এরূপ কেন মনে করিতে যাই, কেন কান্নাকাটি করি? প্রথমে সংকীর্ণ কল্পনা করি, পরে তাহারই জন্ম কাঁদি। এই পাঁচ শত টাকা আমার, এইরূপ বলিয়াছি কি সৃষ্টির অপার সম্পত্তি হইতে আমি পৃথক হইয়া গিয়াছি। এই দুই ভাই আমার, এরূপ মনে করিয়াছি কি সংসারের অগণিত ভাই আমা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে—এই বোধ আমাদের থাকে না। মানুষ নিজেকে কত সংকীর্ণ করিয়া ফেলে! বস্তুতঃ মানুষের স্বার্থই তাহার পরমার্থ হওয়া চাই। গীতা এমনই সরল সুন্দর পথ দেখাইতেছে যাহা দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের উত্তম সহযোগ হয়।

জিভে ও পেটে কি বিরোধ আছে? পেটের যতটা খাদ্য দরকার জিভের ততটা দেওয়া উচিত। পেট 'আর না' বলিয়াছে ত জিভের থামা উচিত। পেট এক অঙ্গ, জিভ আর এক অঙ্গ। আমি এই সকল অঙ্গের সম্রাট। এই সকল সংস্থায় অদ্বৈত বিদ্যমান। কোথা হইতে এই অনর্থক বিরোধ আনা হয়? যে ভাবে এক দেহস্থিত এই সকল অঙ্গে যেমন বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, উপরন্তু আছে সহযোগ, সমাজ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সমাজে এই সহযোগ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই গীতা চিত্তশুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞ-দান-তপ ক্রিয়ার বিধান দিতেছে। এইরূপ কর্মের দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।

যাহার জীবন যজ্ঞময় সে সকলের হইয়া যায়। প্রত্যেক সন্তানই মনে করে মায়ের টান আমার উপরে। সেইরূপ এই প্রকার লোক সকলের নিকট আপন মনে হয়। সারা জগতের সে প্রিয় হয় ও সারা জগত তাহাকে আপন করিতে চায়। সকলেই মনে করে এ আমার প্রাণ, মিত্র, সখা।

ঐসা পুরুষ তো পহ্বাবা। জনাঁস বাটে হা অসাবা॥

"এইরূপ মানুষের জীবন ধন্য লোকে যাহাকে অনন্যভাবে কামনা করে।" সমর্থ রামদাস একথা বলিয়াছেন। গীতা এইরূপ জীবন গঠনের পথ দেখাইয়াছে।

॥ ৯৯ ॥ সমর্পণের মন্ত্র

গীতা একথাও বলে, জীবন যজ্ঞময় করিয়া তারপরে সব কিছু ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া দাও। জীবন সেবাময় হওয়ার পর আবার ঈশ্বরার্পণতা কেন? আমরা ইহা সহজভাবে বলিয়া ত ফেলি যে সমগ্র জীবন সেবাময় হওয়া চাই, কিন্তু তাহা করা বড় কঠিন। অনেক জন্মের পরে উহা কিছু পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। তা ছাড়া সর্বকর্ম সেবাময়, অক্ষরে অক্ষরে সেবাময় হইলেই যে জীবন পূজাময় হইবে তাহা বলা যায় না। সেই জন্য **'ওঁ তৎ সৎ'** এই মন্ত্র দ্বারা সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে।

সেবাকর্ম এমনিতে ষোল আনা সেবাময় হওয়া কঠিন। কেন না পরার্থেও স্বার্থ আসিয়াই পড়ে। কেবল পরার্থ সম্ভবই নয়। এমন কোন কর্ম হইতে পারে না যাহাতে আমার লেশমাত্রও স্বার্থ নাই। সেই জন্য আমাদের হাতে প্রতিদিন অধিকতর নিষ্কাম, অধিকতর নিঃস্বার্থ সেবা হউক—এই ইচ্ছা পোষণ করা চাই। যদি চাও যে সেবা উত্তরোত্তর অধিক শুদ্ধ হউক ত সকল ক্রিয়া ঈশ্বরে অর্পণ কর। জ্ঞানদেব বলিয়াছেন:

নামামৃতগোডী বৈষ্ণবাঁ লাধলী। যোগিয়াঁ সাধলী জীবন-কলা॥

"বৈষ্ণবের কাছে নাম মধুর, যোগী সাধেন জীবন-কলা," নামামৃতের মধুরতা ও জীবন-কলা ভিন্ন বস্তু নয়। হৃদয় ঢালিয়া নাম-কীর্তন ও বাহ্য জীবন-কলা একই জায়গায় আসিয়া মিলিত হয়। যোগী আর বৈষ্ণব একই। পরমেশ্বরে ক্রিয়া অর্পণ করিলে স্বার্থ, পরার্থ ও পরমার্থ সব একরূপ হইয়া যায়। প্রথমে যে 'আমি' আর 'তুমি' পৃথক পৃথক থাকে, তাহা এক করিতে হইবে। 'তুমি' ও 'আমি' মিলিত হইলে 'আমরা' হইল। এবার 'আমরা' ও 'সে' এই দুইকে এক করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে আমার নিজেকে এই সৃষ্টির সহিত মিলাইতে হইবে, তারপর পরমাত্মার সহিত। **'ওঁ তৎ সৎ'** মন্ত্রে এই ভাবই সূচিত হইয়াছে।

ভগবানের অনন্ত নাম। ব্যাসদেব ত ঐ নাম সমূহের 'বিষ্ণুসহস্রনাম' বানাইয়া দিয়াছেন। যে নামই কল্পনা করি না কেন তাহা তাঁহারই নাম।

যে নাম আমাদের মনে জাগে, সেই অর্থে উহাকে এই সৃষ্টির মধ্যে যেন দেখি এবং তদনুসারে জীবন গড়িয়া তুলি। ঈশ্বরের যে নাম আপনাদের মনে ভাল লাগে উহাই সৃষ্টিতে দেখা আর তদনুযায়ী আচরণ করা—ইহাকে আমি "ত্রিপদা গায়ত্রী" বলি। উদাহরণ স্বরূপ, ঈশ্বরের 'দয়াময়' এই নাম নিন। এইরূপ মনে করিয়া চলুন যে তিনিই রহিম। এবার চোখ মেলিয়া সেই দয়ার সাগর পরমেশ্বরকে এই সৃষ্টিতে দেখুন। ভগবান প্রত্যেক শিশুর সেবার জন্য মাতা দিয়াছেন, বাঁচিয়া থাকার জন্য হাওয়া দিয়াছেন। এইভাবে ঐ দয়াময় প্রভুর সৃষ্টিতে দয়ার যে ব্যবস্থা তাহা দেখুন আর নিজের জীবনও দয়াময় করিয়া তুলুন। ভগবদ্গীতার সময়ে ভগবানের যে নাম প্রসিদ্ধ ছিল সেই নামই ভগবদ্গীতা দিয়াছে—সেই নাম, 'ওঁ তৎ সৎ'।

'ওঁ'-এর অর্থ হাঁ, পরমাত্মা আছেন। এই বিংশ শতাব্দীতেও তিনি আছেন। "স এব অদ্য স উ শ্বঃ" তিনি আজ আছেন, কাল ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন। তিনি আছেন তাই সৃষ্টি আছে, আর সাধনার জন্য কোমর কবিয়া আমিও তৈরী আছি। আমি সাধক, তিনি ভগবান আর এই সৃষ্টি পূজা-দ্রব্য, পূজা-উপকরণ। এই ভাবনায় যখন আমি বিভোর হইয়া যাইব তখন বলা যাইবে যে 'ওঁ' আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি আছেন, আমি আছি আর আমার সাধনাও আছে—এইরূপে এই 'ওঁ'কার-ভাব মনের মধ্যে মিশিয়া যাওয়া চাই এবং সাধনায় প্রকট হওয়া চাই। সূর্যকে যখনই দেখিবেন, কিরণসমেত দেখিতে পাইবেন। কিরণ দূরে রাখিয়া সে কখনও থাকিতেই পারে না। কিরণ সে কখনও ছাড়ে না। তেমনি যখনই যে দেখুক আমাদের মধ্যে যেন সাধনা দেখিতে পায়। তখনই কেবল বলা যাইবে যে 'ওঁ'-কে আমরা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি।

ইহার পর 'সৎ'। পরমেশ্বর সৎ অর্থাৎ শুভ, মঙ্গল। এই ভাবনায় অভিভূত হইয়া সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার মাঙ্গল্য অনুভব করুন। দেখুন, ঐ জলের উপরিভাগ। উহা হইতে এক কলসী ভরিয়া লইলে যে গর্তের সৃষ্টি হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ ভরিয়া যাইবে। ইহা কিরূপ মাঙ্গল্য, ইহা কিরূপ প্রীতি! নদী গহ্বর সহ্য করিতে পারে না, তাই গহ্বর ভরিতে সে ছুটিয়া যায়।

নদী বেগেন শুদ্ধ্যতি।

সৃষ্টিরূপী নদী দ্রুত শুদ্ধ হইতে থাকে। যতদিন সৃষ্টি ততদিন সব শুভ ও মঙ্গল। আমাদের কর্মও সেইরূপ হইতে দাও। ভগবানের এই 'সৎ' নাম আত্মসাৎ করার জন্য আমাদের সকল কর্ম নির্মল ও ভক্তিময় করিতে হইবে। সোমরস যেমন শোধনকারী পবিত্রকের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করা হইত তেমনি আমাদের সর্বপ্রকার কর্ম ও সাধনও নিত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্দোষ করিতে হইবে।

বাকী থাকিল 'তৎ'। 'তৎ' মানে তিনি, কিছুটা পৃথক, এই সৃষ্টি হইতে অলিপ্ত। পরমাত্মা এই সৃষ্টি হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ অলিপ্ত। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম ফুল ফুটিতে থাকে, পাখীরা উড়িতে আরম্ভ করে, অন্ধকার দূর হইতে থাকে। কিন্তু সূর্য ত দূরেই থাকে। এই সকল পরিণাম হইতে সে সম্পূর্ণ আলগা হইয়া থাকে। আমরাও যদি নিজেদের কর্মে অনাসক্ত থাকি, অলিপ্ত থাকি, তবে বুঝিতে হইবে আমাদের জীবনে সেই 'তৎ' নাম প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই প্রকারে গীতা 'ওঁ তৎ সৎ' এই বৈদিক নাম আশ্রয় করিয়া সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখাইয়াছে। পূর্বে নবম অধ্যায়ে সর্ব কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। **'যৎকরোষি যদশ্নাসি'** এই শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে। সেই কথাই সপ্তদশ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হইল। পরমেশ্বরকে অর্পণ করার ক্রিয়া সাত্ত্বিক হওয়া চাই। তবেই তাহা পরমেশ্বরে অর্পণ করা যাইবে, এই কথা এখানে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

॥ ১০০ ॥ পাপহারী হরিনাম

এই সবই ঠিক। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে **'ওঁ তৎ সৎ'** এই নাম একমাত্র পবিত্র পুরুষই গ্রহণ করিতে পারে। পাপী কি করিবে? পাপীর মুখে শোভা পায় এমন কোন নাম আছে কি? 'ওঁ তৎ সৎ' এই নামে সে শক্তিও আছে। ঈশ্বরের যে কোন নামে অসত্য হইতে সত্যে নেওয়ার শক্তি আছে। উহা পাপ হইতে নিষ্পাপের

দিকে লইয়া যাইতে পারে। জীবনের শুদ্ধি ধীরে ধীরে করা উচিত। পরমাত্মা অবশ্য সাহায্য করিবেন। তোমার দুর্বলতার সময়ে তিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন।

যদি কেহ আমাকে বলে—একদিকে পুণ্যময় অথচ অহঙ্কারী জীবন আর অন্য দিকে পাপময় অথচ নম্র জীবন—এই দুইয়ের একটি বাছিয়া লও। ত মুখে বলিতে না পারিলেও অন্তরে আমি বলিব, "যে-পাপে আমার পরমেশ্বরের কথা স্মরণ থাকে সেই পাপই আমাকে দাও।" আমার মন একথাই বলিবে—পুণ্যময় জীবনে যদি পরমেশ্বরের বিস্মৃতি ঘটে তবে যে পাপময় জীবনে তাঁহার কথা মনে থাকিবে সেই জীবনই আমি চাই। এই কথার অর্থ এই নয় যে পাপময় জীবন আমি সমর্থন করিতেছি। কিন্তু পাপ ততটা পাপ নয় যতটা পাপ—পুণ্যের অহঙ্কার।

বহু ভিতোঁ জাণপণা। আড ন যো নারায়ণা॥

"বহুবিধ জ্ঞানের অহংকার যেন নারায়ণকেই ঢাকিয়া না ফেলে।" —তুকারাম এই কথা বলিয়াছেন। ঐরূপ জ্ঞানপনায় আমার কাজ নাই। তাহা অপেক্ষা পাপী থাকিব, দুঃখী থাকিব, তাহাই ভাল।

জাণতেঁ লেঁকরুঁ। মাতা লাগে দূরী ধরুঁ॥

"যে সন্তান জ্ঞানী তাঁহাকে মা-ও দূরে রাখেন।"

কিন্তু অজ্ঞান পুত্রকে মা নিজের কোলে তুলিয়া নেন। আমি 'স্বাবলম্বী পুণ্যবান' হইতে চাই না। 'পরমেশ্বরাবলম্বী পাপী' হওয়াই আমার কাছে প্রিয়। পরমাত্মার পবিত্রতা আমার পাপ জীর্ণ করার শক্তি রাখে। পাপ হইতে বাঁচার চেষ্টা আমাদের ত করিতেই হইবে। উহা যদি ঠেকান না যায় হৃদয় কাঁদিতে থাকিবে, মন ছটফট করিতে থাকিবে। তখন পরমেশ্বরের কথা মনে হইবে। তিনি ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছেন। চিৎকার করিয়া বল, "আমি পাপী, তাই তোমার দরজায় আসিয়াছি।' পুণ্যবানের ঈশ্বর-স্মরণের অধিকার আছে, কারণ সে পুণ্যবান। পাপীর ঈশ্বর-স্মরণের অধিকার আছে, কারণ সে পাপী।

রবিবার, ১২-৬-১৯৩২

অষ্টাদশ অধ্যায়

উপসংহার—ফলত্যাগের পূর্ণতা—ঈশ্বর প্রসাদ

॥ ১০১ ॥ অর্জুনের অন্তিম প্রশ্ন

বন্ধুগণ,

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ আমরা অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সর্বদা পরিবর্তনশীল জগতে কোনও সংকল্পকে পূর্ণতা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া জেলে প্রতিপদক্ষেপেই অনিশ্চয়তা। এখানে কোন কাজ আরম্ভ করিয়া এখানেই সম্পূর্ণ করার আশা খুবই কঠিন। আরম্ভ করার সময় এইরূপ আশা ছিল না যে আমাদের এই গীতা এখানেই শেষ করা যাইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমরা আজ সমাপ্তির কোঠায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

চতুর্দশ অধ্যায়ে জীবনের অথবা কর্মের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই তিনগুণ হইতে রাজস ও তামস ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। পরে সপ্তদশ অধ্যায়ে সেকথাই আর এক ভাবে বলা হইয়াছে। যজ্ঞ, দান, তপ কিংবা এক শব্দে বলিলে যজ্ঞই জীবনের সার। সপ্তদশ অধ্যায়ে আমরা এইরূপ নির্দেশ পাই—যজ্ঞোপযোগী যে আহারাদি কর্ম, উহাও সাত্ত্বিক ও যজ্ঞরূপে যেন গ্রহণ করা হয়। কেবল সেইসব কর্মই গ্রহণ করিবে যাহা যজ্ঞরূপ ও সাত্ত্বিক। অন্য সব ত্যাজ্য। ওঁ তৎ সৎ এই মন্ত্র কেন যে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। ওঁ মানে সাতত্য, তৎ মানে অলিপ্ততা এবং সৎ মানে সাত্ত্বিকতা। আমাদের সাধনায় সাতত্য, অলিপ্ততা ও সাত্ত্বিকতা থাকা চাই। তবেই তাহা পরমেশ্বরকে অর্পণ করার যোগ্য হইবে। এই সব কথা হইতে ইহা বুঝা যায় যে কোন কোন কর্ম আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে আর কোন কোন কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে।

গীতার সমস্ত শিক্ষায় পূর্বাপর দৃষ্টিপাত করিলে এই ধারণা জন্মে যে কোন ক্ষেত্রেই কর্ম ত্যাগ করিবে না। গীতা কর্মফল ত্যাগের কথা বলে। গীতার সর্বত্র এই শিক্ষা দেখা যায়। সর্বদা কর্ম করিবে কিন্তু ফলের

আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না। কিন্তু এ ত গেল এক দিক। অন্য দিক হইতেছে —কিছু কর্ম করিবে আর কিছু কর্ম করিবে না। সুতরাং শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন প্রশ্ন করিলেন, "একদিকে ত বলা হল—যে-কোন কর্ম ফলত্যাগপূর্বক করবে। আবার অন্যদিকে বলা হচ্ছে—কিছু কর্ম অবশ্যই ত্যাজ্য, এবং কিছু কর্ম করার যোগ্য। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কিভাবে করা যায়?" জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট জানার জন্য এই প্রশ্ন; ফলত্যাগের মর্ম বুঝার জন্য এই প্রশ্ন। যাহাকে শাস্ত্রে 'সন্ন্যাস' বলে তাহাতে স্বরূপতঃ কর্ম ছাড়িতে হয়। অর্থাৎ কর্মের স্বরূপ ত্যাগ করিতে হয়। ফলত্যাগে কর্ম ফলতঃ ত্যাগ করিতে হয়। এখানে প্রশ্ন উঠিবে—গীতার ফলত্যাগের জন্য প্রত্যক্ষ কর্মত্যাগের আবশ্যকতা আছে কি না। ফলত্যাগের কষ্টিপাথরে সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজন আছে কি? সন্ন্যাসের সীমা কোন্ পর্যন্ত? সন্ন্যাস ও ফলত্যাগ এই দুইয়ের সীমা কোন্ পর্যন্ত ও কতটা? ইহাই অর্জুনের প্রশ্ন।

॥ ১০২ ॥ ফল-ত্যাগ : সার্বভৌম কষ্টিপাথর

উত্তর দিতে গিয়া ভগবান স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ফল-ত্যাগের পরীক্ষাই সার্বভৌম বস্তু। ফল-ত্যাগের তত্ত্ব সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়। সর্ব কর্মের ফলত্যাগ করা চাই এবং রাজস ও তামস কর্ম ত্যাগ করা চাই। এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। কোন কোন কর্মের স্বরূপই এই যে ফলত্যাগের কৌশল প্রয়োগ করিলে তাহা আপনা হইতেই বাদ পড়িয়া যায়। ফলত্যাগপূর্বক কর্ম করার অর্থ এই যে কিছু কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে। ফল-ত্যাগপূর্বক কর্ম করার কথায় কিছু কর্মের প্রত্যক্ষ ত্যাগের প্রসঙ্গ আসিয়া যায়।

কথাটা একটু গভীরভাবে বিচার করা যাউক। যে কর্ম কাম্য অর্থাৎ যাহার মূলে কামনা রহিয়াছে তাহা ফলত্যাগপূর্বক কর—একথা বলামাত্র উহা খসিয়া পড়ে। ফল-ত্যাগের কাছে কাম্য (কামনা-যুক্ত) ও নিষিদ্ধ কর্ম টিকিতেই পারে না। ফলত্যাগপূর্বক কর্ম করার মানে ত কেবল কৃত্রিম, তান্ত্রিক বা যান্ত্রিক ক্রিয়া করা নয়। কোন্ কর্ম করিতে হইবে, আর কোন্ কর্ম করিতে নাই এই কষ্টিপাথরে কষিলে তাহা সহজেই ধরা

পড়িবে। কেহ কেহ বলেন, "গীতা ফলত্যাগপূর্বক কর্ম করার কথা বলে, কিন্তু কি রকম কাজ করবে তা বলে না।" এইরূপ মনে করা হইলেও বস্তুত তাহা ঠিক নয়। কারণ ফলত্যাগপূর্বক কর্ম কর, একথা বলামাত্র কোন্ কর্ম করার যোগ্য আর কোন্ কর্ম করার অযোগ্য তাহা স্পষ্ট হইয়া যায়। হিংসাত্মক কর্ম, অসত্যময় কর্ম, চৌর্যকর্ম ইত্যাদি ফলত্যাগপূর্বক করাই যায় না। ফলত্যাগের কষ্টিপাথরে কষা মাত্রই উহারা বাতিল হইয়া যায়। সূর্যের আলো পড়ামাত্র সব বস্তু উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু অন্ধকারও কি উজ্জ্বল দেখায়? উহা ত নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থা হয় নিষিদ্ধ ও কামনা-যুক্ত কর্মের। আমাদের সব কর্মই ফল-ত্যাগের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লওয়া উচিত। প্রথমে দেখিয়া লইতে হইবে আমি যে কর্ম করিতে যাইতেছি তাহা ফলের লেশমাত্র বাসনা না রাখিয়া অনাসক্তিপূর্বক করা সম্ভব কি-না। ফলত্যাগই কর্ম করার কষ্টিপাথর। এই পরীক্ষা অনুসারে কামনা-যুক্ত কর্ম আপনা হইতেই ত্যাজ্য প্রমাণিত হইবে। উহার সন্ন্যাসই বাঞ্ছনীয়। বাকী থাকে শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্ম। তাহা অনাসক্তভাবে অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে। কামনা-যুক্ত কর্মের ত্যাগও একপ্রকারের কর্মই হইল। তাহাতেও ফলত্যাগের কাঁচি চালাও। তখন কামনা-যুক্ত কর্মের ত্যাগ স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে।

এই ভাবে তিনটি বিষয় আমরা দেখিলাম। এক—যে কর্ম আমরা করি তাহা ফলত্যাগপূর্বক করা চাই। দুই—রাজস ও তামস কর্ম—নিষিদ্ধ ও কামনা-যুক্ত কর্ম—ফলত্যাগের কষ্টিপাথরে আপনা হইতেই বাতিল হইয়া যায়। তিন—এইভাবে যে ত্যাগ করা হইবে তাহার উপরও ফলত্যাগের কাঁচি চালাও। আমি এত ত্যাগ করিয়াছি এমন অভিমান যেন না জন্মে।

রাজস ও তামস কর্ম ত্যাজ্য কেন? কারণ উহারা শুদ্ধ নহে। শুদ্ধ নয় বলিয়াই উহাদ্বারা কর্তার চিত্তে সংস্কারের ছাপ পড়ে। কিন্তু আরও অধিক বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সাত্ত্বিক কর্মও দোষ-যুক্ত। প্রত্যেক কর্মেই কিছু না কিছু দোষ আছে। স্বধর্মরূপী চাষ-আবাদের কথাই ধরুন। ইহা এক শুদ্ধ সাত্ত্বিক ক্রিয়া। কিন্তু এই যজ্ঞময় স্বধর্মরূপ চাষেও হিংসা আছে। চাষ-আবাদের ক্রিয়ায় অসংখ্য জীব মারা যায়। কূপের ধারে কাদা না হয় এই জন্য উহা পাকা করিতে গেলেও বহু জীব নষ্ট হয়।

সকালে দরজা খুলিতেই সূর্যকিরণ ঘরে প্রবেশ করে, আর অগণিত প্রাণী মরে। যাহাকে আমরা শুদ্ধীকরণ বলি তাহাও মারণক্রিয়াই হইয়া দাঁড়ায়। সারাংশ : সাত্ত্বিক, স্বধর্মরূপ কর্মেও যদি দোষ স্পর্শ করে ত উপায় কি ?

আগেই বলিয়াছি যে, সকল গুণের বিকাশ হইতে এখনও বাকী আছে। জ্ঞান, ভক্তি, সেবা, অহিংসা এই সকলের কেবল বিন্দুমাত্র উপলব্ধিই আমাদের হইয়াছে। সম্পূর্ণ উপলব্ধি লাভ হইয়াছে তাহা নয়। উপলব্ধি করিতে করিতে জগৎ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মধ্যযুগে এইরূপ এক ভাব দেখা গিয়াছিল যে চাষ-আবাদের কাজে হিংসা আছে, অতএব অহিংসায় বিশ্বাসী লোকেরা তাহা করিতে পারে না, তাহারা যেন ব্যবসা করে। তাহারা বলিত—ফসল উৎপন্ন করা পাপ, বেচায় পাপ নাই। কিন্তু এভাবে কর্ম এড়াইয়া যাওয়ায় কোন কল্যাণ হইতে পারে না। লোকে যদি এভাবে কর্ম সংকোচ করিতে থাকে তবে শেষটায় আত্মনাশই ঘটিবে। মানুষ যতই কর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা ভাবিবে ততই কর্মের অধিক বিস্তার হইতে থাকিবে। আপনার ধানের ব্যবসায়ের জন্য কাহাকেও কি চাষ করিতে হইবে না ? তবে সেই চাষবাসের হিংসার ভাগ কি আপনাতেও বর্তাইবে না ? কাপাস উৎপাদন করা যদি পাপের কাজ হয় তবে সেই উৎপন্ন কাপাস বেচাও ত পাপ। কাপাস উৎপাদন করা দোষের বলিয়া সেই কর্ম ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে বুদ্ধির ভুল রহিয়াছে। সকল কর্ম বর্জন করা, এ কর্ম নয়, ও কর্ম নয়, কিছুই করিও না—দেখার এই যে ভঙ্গী তাহাতে যথার্থ দয়াভাবের লেশও থাকে না, বুঝিতে হইবে দয়াভাব মরিয়া গিয়াছে। পাতা ছাঁটিলে গাছ মরে না, বরং উহা নূতন করিয়া গজায়। ক্রিয়ার সংকোচ করিলে আত্মসংকোচ ঘটে।

॥ ১০৩ ॥ ক্রিয়ামুক্তির উত্তম উপায়

এখন প্রশ্ন হইল সব কর্মই যদি দোষ-যুক্ত হয় তবে সকল ক্রিয়া ছাড়িব না কেন ? পূর্বে একবার একথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সকল কর্মত্যাগের কল্পনা খুব সুন্দর। এই চিন্তা মনভুলানো। কিন্তু এই অসংখ্য ক্রিয়া ত্যাগ করার উপায় কি ? রাজস ও তামস কর্ম ত্যাগের যাহা উপায়, সাত্ত্বিক কর্ম ত্যাগেরও কি তাহাই উপায় ? দোষযুক্ত সাত্ত্বিক কর্ম হইতে

বাঁচার উপায় কি ? মজা হইতেছে এই যে, "ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহা" নীতি অবলম্বনে মানুষ যখন চলিতে থাকে তখন অমর বলিয়া ইন্দ্র ত মরেই না, আর তক্ষকও মরে না, উল্টা দৃঢ় হইয়া বসে। সাত্ত্বিক কর্মে পুণ্য আছে, আর দোষও কিছু আছে। কিন্তু কিছু দোষ আছে বলিয়া সেই দোষের সঙ্গে যদি পুণ্যকেও আহুতি দাও ত নাশ হওয়ার নয় বলিয়া পুণ্যক্রিয়া নষ্ট হইবে না, কিন্তু দোষক্রিয়া কেবল বাড়িয়া চলিবে। এরূপ গড়পড়তা নির্বিচার ত্যাগ দ্বারা পুণ্যরূপ ইন্দ্র ত মরেই না, আর দোষরূপ তক্ষক যে মরিতে পারিত সেও মরে না। অতএব তাহা ত্যাগ করার উপায় কি ? হিংসা করে বলিয়া বিড়াল ত্যাগ করিলে ইঁদুর হিংসা করিতে আরম্ভ করিবে। সাপ হিংসা করে বলিয়া সাপ দূর করিলে শত শত জীব ফসল নষ্ট করিবে। ফসল নষ্ট হইলে হাজার হাজার লোক মরিবে। কাজেই ত্যাগ বিবেক-সম্মত হওয়া চাই।

গোরখনাথকে মচ্ছীন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ বালককে ধুয়ে আন।" পা ধরিয়া গোরখ বালককে খুব আছড়াইল তারপর বেড়ার উপর শুকাইতে দিল। মচ্ছীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধুয়ে এনেছ বালককে ?" গোরখনাথ বলিল, "ধুয়ে শুকোতে দিয়েছি।" এই কি বালক ধোয়ার রীতি ? কাপড় ধোয়া আর মানুষ ধোয়ার রীতি এক নয়। এই দুই পদ্ধতিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তেমনই রাজস ও তামস কর্মের ত্যাগে আর সাত্ত্বিক কর্মের ত্যাগে পার্থক্য আছে। সাত্ত্বিক কর্মত্যাগের রীতি পৃথক।

বিচার বিবেচনা না করিয়া কাজ করিলে কিছুটা উল্টোপাল্টা কাজই হইবে। তুকারাম বলিয়াছেন : **ত্যাগেঁ ভোগ মাঝ্যা য়েতীল অন্তরা। মগ মী দাতারা কায় করূঁ।**

"ত্যাগের দ্বারা ভিতরে যে ভোগ জাগিয়া উঠে, তখন আমি কি করিব প্রভু!" ছোট ত্যাগ করিতে যাই ত বড় ভোগ আসিয়া মনে বাসা বাঁধে। তাই ঐ সামান্য ত্যাগও মিথ্যা হইয়া যায়। ছোটখাট ত্যাগের পূর্তির জন্য বড় বড় ইন্দ্রপুরী রচনা করি। তাহা অপেক্ষা ঐ কুঁড়েই ত ছিল ভাল, ছিল পর্যাপ্ত। নেংটি পরিয়া রাজ্যের বৈভব আশেপাশে জড় করা অপেক্ষা ধুতি-পাজামাই ছিল ভাল। সেইজন্য ভগবান সাত্ত্বিক কর্মত্যাগের পদ্ধতিই পৃথক একথা নির্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত সাত্ত্বিক কর্মই করিতে

হইবে, কিন্তু উহার ফল ফেলিয়া দিতে হইবে। কিছু কর্ম ত মূলেই ত্যাজ্য। আর কিছুর ফলত্যাগ করিতে হয়। শরীরে কোন দাগ লাগিলে তাহা ধুইয়া ফেলা যায়। কিন্তু চামড়ার রং যেখানে কালো সেখানে গায়ে হোয়াইট ওয়াশ লাগাইয়া কি লাভ? কালো রং আছে থাকিতে দাও। উহার দিকে দৃষ্টিই দিও না। উহাকে অমঙ্গলজনক মনে করিও না।

একটি লোক ছিল। নিজের ঘর অশুভ মনে হওয়ায় সে ঘর ছাড়িয়া অন্য এক গ্রামে গেল। সেখানেও সে আবর্জনা দেখিতে পাইল। তারপর গেল বনে। বনে এক আম গাছের নীচে সে বসিয়াছে, একটা পাখী উপর হইতে তাহার মাথায় মলত্যাগ করিয়া দিল। জঙ্গলও অশুভ একথা বলিয়া সে নদীর জলে গিয়া দাঁড়াইল। নদীতে গিয়া দেখিল যে বড় মাছ ছোট মাছকে খাইতেছে, ইহাতে তাহার ঘৃণার অবধি রহিল না। তাহার মনে হইল সারা সংসারই অমঙ্গলে ভরা। কাজেই সে ঠিক করিল মরা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। জল হইতে উঠিয়া আসিয়া সে আগুন জ্বালাইল। ওদিক হইতে কোন এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "আরে জীবন দেবে নাকি?" লোকটি বলিল, "কি আর করি! এ জগৎটাই অমঙ্গলে ভরা।" গৃহস্থ বলিল, "তোমার এ দুর্গন্ধময় শরীর, এ চর্বি এখানে পোড়ালে মহা দুর্গন্ধ ছড়াবে। আমরা পাশেই থাকি। আমরা তখন যাব কোথায়? একটা চুল জ্বালালেই কত না দুর্গন্ধ! আর তোমার ত সব চর্বি পুড়বে। ভেবে দেখ কত দুর্গন্ধ ছড়াবে।" লোকটি নিরুপায় হইয়া বলিল, "এ জগতে বেঁচে থাকার সুযোগ নেই, মরারও সুবিধে নেই, কি করি!"

তাৎপর্য: অশুভ, অমঙ্গল বলিয়া সব কিছু ছাড়িলে ত চলে না। ছোট কর্ম হইতে বাঁচিতে যাইবে ত অন্য বড় কর্ম কাঁধে চাপিয়া বসিবে। কর্ম স্বরূপতঃ বাহির হইতে ত্যাগ করিলেই ছাড়িয়া যায় না। প্রবাহ-প্রাপ্ত কর্মের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য যদি কেহ শক্তি ক্ষয় করে, প্রবাহের উল্টা দিকে যাইতে চেষ্টা করে ত শেষে ক্লান্ত হইয়া সে প্রবাহের সঙ্গেই ভাসিয়া যাইবে। প্রবাহের অনুকূল ক্রিয়া দ্বারাই তাহাকে আত্মোদ্ধারের পথ বাহির করিতে হইবে। ইহার ফলে মনের মলিনতা কমিতে থাকিবে, চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকিবে। তারপর ধীরে ধীরে আপনা হইতেই ক্রিয়া

সমাপ্ত হইতে থাকিবে। কর্মত্যাগ না হইয়াও ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে। কর্ম যাইবে না, ক্রিয়া লোপ পাইবে।

কর্ম ও ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। মনে করুন কোথাও খুব গোলমাল চলিতেছে আর তাহা বন্ধ করিতে হইবে। কোন সিপাহী আসিল আর চিৎকার করিয়া বলিল—"গোলমাল বন্ধ কর।" গোলমাল বন্ধ করার জন্য তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা-রূপ তীব্র ক্রিয়া করিতে হইল। অপর একজন আসিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিবে আর অঙ্গুলি তুলিয়া ইশারা করিবে। তাহাতেই লোক শান্ত হইয়া যাইবে। তৃতীয় একজনের উপস্থিতিমাত্রই শান্তি বিরাজ করিবে। একজনের করিতে হইল তীব্র ক্রিয়া, দ্বিতীয়ের ক্রিয়া কতকটা সৌম্য, আর তৃতীয়ের ক্রিয়া সূক্ষ্ম। ক্রিয়া ক্রমশঃ কম হইতে লাগিল। কিন্তু লোকদের শান্ত করার কাজ সমান ভাবে হইল। যেমন যেমন চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকিবে, তেমন তেমন ক্রিয়ার তীব্রতা কমিতে থাকিবে। তীব্র হইতে সৌম্য, সৌম্য হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে শূন্য হইতে থাকিবে। কর্ম ও ক্রিয়া ভিন্ন পদ। কর্তার যাহা অত্যন্ত ইষ্ট তাহাই কর্ম। ইহাই কর্মের ব্যাখ্যা। কর্মে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয় কিন্তু ক্রিয়ার জন্য এক স্বতন্ত্র পদ ব্যবহার করিতে হয়।

কর্ম ও ক্রিয়ার মধ্যে যে পার্থক্য তাহা বুঝিয়া লউন। চটিয়া গেলে কেহ খুব চিৎকার করিয়া আবার কেহ আদৌ কিছু না বলিয়া রাগ প্রকাশ করে। জ্ঞানী পুরুষ লেশমাত্রও ক্রিয়া করেন না, কিন্তু অনন্ত কর্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার অস্তিত্বমাত্রই অপার লোকসংগ্রহ করিতে সক্ষম। জ্ঞানী পুরুষের ত কেবল উপস্থিতিই যথেষ্ট। শরীর দ্বারা কোন কর্ম না করিলেও তিনি অবিরত কর্ম করিতে থাকেন। ক্রিয়া সূক্ষ্ম হইতে থাকে কিন্তু কর্ম বাড়িয়া যাইতে থাকে। বিচারের এই ধারা আরও অগ্রসর হইলে এবং চিত্ত পরিপূর্ণ শুদ্ধ হইলে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়া শূন্যরূপ হইয়া অনন্ত কর্ম নিষ্পন্ন হইতে থাকে একথা বলা যায়। প্রথমে তীব্র, তারপর তীব্র হইতে সৌম্য, সৌম্য হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে শূন্য—এই ক্রম অনুসারে স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়া শূন্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তখন স্বতঃই অনন্ত কর্ম হইতে থাকিবে।

বাহ্যিক ভাবে কর্ম ছাড়িয়া দিলে উহা দূর হইবে না। নিষ্কামতাপূর্বক কর্ম

করিতে থাকিলে ক্রমে উহা অনুভবে আসিবে। কবি ব্রাউনিং 'কপটাচারী পোপ' নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। উহাতে পোপকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি নিজেকে এত সাজাও কেন? এই সব চোগা চাপকান কিসের জন্য? ওপরের এত সাজ-সজ্জা কেন? কেনই বা এত গম্ভীর ভাবে থাক?" পোপ উত্তরে বলিলেন, "আমি এসব কেন করি, তবে শোন—এই নাটক, এই অভিনয় করতে করতে অজ্ঞাতেই হয়ত কোন দিন শ্রদ্ধার ছোঁয়াচ লেগে যাবে।" সেইজন্য নিষ্কাম ক্রিয়া করিয়া যাইতে হইবে। ক্রমে নিষ্ক্রিয়ত্বও লাভ হইবে।

॥ ১০৪ ॥ সাধকের পক্ষে স্বধর্মের সমাধান

সারাংশ এই, রাজস ও তামস কর্ম ত সম্পূর্ণভাবেই ত্যাগ করিতে হইবে আর সাত্ত্বিক কর্ম করিয়া যাইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে এই বিবেক-বুদ্ধি রাখিতে হইবে যে, যে-সাত্ত্বিক কর্ম সহজ প্রবাহে আসিয়া যাইবে তাহা সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নহে। দোষ হয় হউক। ঐ দোষ ছাড়াইতে গিয়াছ ত অন্য দোষ আসিয়া তোমার ঘাড়ে চাপিবে। নিজের না-কাটা নাক যেমন আছে থাকিতে দাও। কাটিয়া সুন্দর করিতে যাইবে ত আরও বেশী বিশ্রী ও ভয়ানক দেখাইবে। তাহা যেমন আছে তেমনই ভাল। সাত্ত্বিক কর্ম দোষ-যুক্ত হইলেও স্বাভাবিক রূপে প্রাপ্ত বলিয়া ত্যাগ করা উচিত নয়। ঐ কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু উহার ফল ত্যাগ করিতে হইবে।

আর একটি কথা বলার আছে। যে কর্ম সহজে, স্বাভাবিকরূপে প্রাপ্ত নয় তাহা উত্তমরূপে করা যাইবে মনে হইলেও করিতে নাই। ততটুকুই কর্ম কর যতটা সহজ-প্রাপ্ত। ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়-ঝাঁপ করিয়া অন্য নূতন কর্মের বোঝা মাথায় লইও না। যে কাজ স্পষ্টতঃই জোর জবরদস্তি করিয়া করিতে হয়, তাহা যতই ভাল মনে হউক না কেন তাহা হইতে দূরে থাক। উহার মোহে পড়িও না। যে কর্ম সহজ প্রাপ্ত কেবল তাহারই ফলত্যাগ হইতে পারে। যে মানুষ এই কাজটা ভাল, ঐ কাজটাও ভাল এইরূপ লোভে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে সে ফলত্যাগ করিবে কি করিয়া? উহাতে ত সারা জীবনই নষ্ট হইয়া যাইবে। ফলের আশায়ই সে পরমধর্মরূপ এই সব কর্ম করিতে চাহিবে, আর ফলও খোয়াইয়া বাসবে। জীবনে কোথাও

তাহার কোনরূপ স্থিরতা লাভ হইবে না। চিত্তে ঐ কর্মের আসক্তি জড়াইয়া যাইবে। সাত্ত্বিক কর্মেরও যদি লোভ জন্মে ত সে লোভ ত্যাগ করিতে হইবে। ঐরূপ নানাবিধ সাত্ত্বিক কর্ম যদি করিতে যাও ত তাহাতে রাজসিকতা ও তামসিকতা আসিবে। কাজেই তুমি সেই কাজই কর যাহা তোমার নিকট সাত্ত্বিক, স্বাভাবিক ও সহজ-প্রাপ্ত স্বধর্ম।

স্বধর্মের মধ্যে স্বদেশী ধর্ম, স্বজাতীয় ধর্ম ও স্বকালীন ধর্মের সমাবেশ হয়। এই তিনের সংযোগে স্বধর্ম গড়িয়া উঠে। কোন্ কর্ম আমার বৃত্তির অনুকূল ও অনুরূপ এবং কিরূপ কর্তব্য আমার উপর বর্তাইয়াছে স্বধর্ম নির্ধারণ করার সময় তাহা দেখা যায়। তোমার মধ্যে যে 'তুমিত্ব' আছে, তাহারই জন্য তুমি—'তুমি'। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব কিছু বিশেষত্ব আছে। ছাগলের বিকাশ ছাগল হইয়া থাকার মধ্যেই নিহিত। ছাগল থাকিয়াই তাহাকে আপন বিকাশ করিয়া লইতে হইবে। ছাগল যদি গরু হইতে চায় ত উহা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সে স্বয়ংপ্রাপ্ত ছাগত্ব ত্যাগ করিতে পারে না। সে জন্য উহাকে শরীর ত্যাগ করিতে হইবে। নবধর্ম ও নবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এ জন্মে ত ছাগত্বই উহার পক্ষে পবিত্র। বলদ ও ব্যাঙের গল্প আছে না? ব্যাঙের বড় হওয়ার একটা সীমা আছে। ব্যাঙ যদি বলদের সমান বড় হইতে চেষ্টা করে ত সে মরিয়া যাইবে। অপরের রূপ নকল করিতে যাওয়া ঠিক নয়। সেইজন্য পরধর্মকে ভয়াবহ বলা হইয়াছে।

স্বধর্মের আবার দুই ভাগ। একটি বদলায় আর একটি বদলায় না। আজিকার আমি আগামী কালের আমি নই। আগামী কালের আমি পরশু দিনের আমি নই। আমি নিরন্তর বদলাইতেছি। বাল্যকালের স্বধর্ম ত কেবল বৃদ্ধি-সাধন। যৌবনে আমার মধ্যে পরিপূর্ণ কর্মশক্তি থাকিবে এবং তাহা দ্বারা আমি সমাজসেবা করিব। প্রৌঢ়াবস্থায় আমার জ্ঞানের দ্বারা অন্যে লাভবান হইবে। এইভাবে কোন কোন স্বধর্ম বদলাইতে থাকে, আর কতকগুলি আদৌ বদলায় না। ইহাকে যদি পুরাতন শাস্ত্রীয় নামে অভিহিত করিতে হয় তবে বলিব, "মানুষের স্বধর্ম দ্বিবিধ—বর্ণ-ধর্ম ও আশ্রম-ধর্ম।" বর্ণ-ধর্ম বদলায় না। আশ্রম-ধর্ম বদলায়।

আশ্রম-ধর্ম বদলায় মানে ব্রহ্মচারী-পদ সার্থক করিয়া আমি গৃহস্থাশ্রমে

প্রবেশ করিতেছি। গৃহস্থাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ আশ্রমে এবং বানপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস জীবনে যাইতেছি। এইভাবে আশ্রমধর্ম বদলাইতে থাকে। তবুও বর্ণ-ধর্ম বদলানো যায় না। আপন প্রাকৃতিক সীমা আমার পক্ষে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। এইরূপ প্রযত্নই মিথ্যা। তোমার মধ্যে যে 'তুমিত্ব' রহিয়াছে তাহা তুমি ছাড়িতে পার না। এই চিন্তাধারার উপর বর্ণ-ধর্মের পরিকল্পনা খাড়া করা হইয়াছে। বর্ণ-ধর্মের বিচার ধারা অত্যন্ত রমণীয়। উহা কি একেবারেই অপরিবর্তনীয়? ছাগলের ছাগত্ব ও গাভীর গাভীত্ব যেমন, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্বও কি তেমন? আমি মনে করি বর্ণ-ধর্ম এরূপ অনড় নহে। কিন্তু ইহার মর্ম আমাদের বুঝিতে হইবে। 'বর্ণ-ধর্মের' ব্যবহার সমাজ ব্যবস্থার উপায় স্বরূপ যখন গৃহীত হয়, তখন উহার ব্যতিক্রম অবশ্যই হইবে। এরূপ ব্যতিক্রম মানিতেই হইবে। গীতা এই ব্যতিক্রম মানিয়া লইয়াছে। তাৎপর্য, এই দুই প্রকারের ধর্ম বুঝিয়া লওয়ার পর অন্য অবান্তর ধর্ম সুন্দর ও মনোহর মনে হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

॥ ১০৫ ॥ ফলত্যাগের সমগ্র ফলিতার্থ

ফলত্যাগ-কল্পনার যে ব্যাখ্যা আমরা এ পর্যন্ত করিয়াছি তাহা হইতে নিম্ন অর্থ সমূহ পাওয়া যায়:

১। রাজস ও তামস কর্মের সম্পূর্ণ ত্যাগ।

২। ঐ ত্যাগেরও ফলত্যাগ অর্থাৎ উহার জন্য যেন অহঙ্কার না জন্মে।

৩। সাত্ত্বিক কর্ম কার্যতঃ ত্যাগ না করিয়া কেবল উহার ফল ত্যাগ।

৪। সাত্ত্বিক কর্ম সদোষ হইলেও তাহা ফলত্যাগপূর্বক করণীয়।

৫। সতত ফলত্যাগপূর্বক ঐ সব কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং তীব্র হইতে সৌম্য, সৌম্য হইতে সূক্ষ্ম আর সূক্ষ্ম হইতে শূন্য—এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সর্বপ্রকার ক্রিয়া লোপ পাইবে।

৬। ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু কর্ম—লোক-সংগ্রহরূপী কর্ম—চলিতে থাকিবে।

৭। সাত্ত্বিক কর্মেরও যাহা স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত তাহাই করিতে হইবে। যাহা সহজপ্রাপ্ত নয়, তাহা যতই ভাল হউক না কেন, তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে—তাহার মোহে যেন না পড়ি।

৮। সহজ-প্রাপ্ত স্বধর্মও দুই প্রকারের—একটি বদলায়, আর একটি বদলায় না। বর্ণ-ধর্ম বদলায় না, আশ্রম ধর্ম বদলাইতে থাকে। পরিবর্তনশীল স্বধর্মের পরিবর্তন হইতে থাকা চাই। উহা দ্বারা প্রকৃতি বিশুদ্ধ থাকে।

প্রকৃতি প্রবাহিত হইতে থাকা চাই। ঝরনা যদি বহিতে না থাকে তবে তাহাতে দুর্গন্ধ জন্মে। আশ্রমধর্ম সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রথমে মানুষ পায় পরিবার। আত্মবিকাশের জন্য সে নিজেকে পরিবারের বন্ধনে বাঁধে। তাহা হইতে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু পারিবারিক বন্ধনে যদি সে বরাবরের মত জড়াইয়া যায় ত তাহার বিনাশ হয়। পরিবারের মধ্যে থাকা যাহা প্রথমে ধর্মরূপ থাকে তাহাই পরে অধর্মরূপ প্রাপ্ত হয়। কারণ তখন উহা বন্ধনের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। আসক্তিহেতু পরিবর্তনশীল ধর্ম যদি না ছাড় ত তাহার পরিণাম ভয়ানক হইবে। ভাল জিনিসেও আসক্তি না আসা চাই। আসক্তি হইতে ঘোর অনর্থ ঘটে। যক্ষ্মার জীবাণু ভুলক্রমেও যদি ফুসফুসে প্রবেশ করে তবে সারা দেহ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করিয়া দেয়। সেইরূপ আসক্তির জীবাণু যদি অসাবধানতাবশতঃ সাত্ত্বিক কর্মে প্রবেশ করিতে দাও ত স্বধর্মে পচন ধরিবে। ঐ সাত্ত্বিক স্বধর্মেও রাজস ও তামসের দুর্গন্ধ আসিতে থাকিবে। তাই পরিবর্তনশীল গার্হস্থ্য স্বধর্মও সময়মত খসিয়া পড়া চাই। দেশসেবারূপ ধর্ম সম্বন্ধেও ঐ কথা। দেশসেবার ধর্মে যদি আসক্তি আসে আর যদি কেবল নিজ দেশের কথাই আমরা ভাবিতে থাকি তবে দেশভক্তি ভয়ঙ্কর এক বস্তু হইয়া পড়িবে। উহার ফলে আত্মবিকাশ বন্ধ হইয়া যাইবে। চিত্তে আসক্তি ঘর বাঁধিবে আর অধঃপতন শুরু হইবে।

॥ ১০৬ ॥ সাধনায় পরাকাষ্ঠাই সিদ্ধি

সারাংশ, জীবনের সঠিক প্রতিফলন পাইতে চাও ত ফলত্যাগরূপী চিন্তামণির আশ্রয় লও। উহাই তোমার পথ প্রদর্শক হইবে। ফলত্যাগের তত্ত্ব নিজের সীমাও নির্দেশ করে। এই দীপ কাছে থাকিলে কোন্ কাজ করিতে হইবে, কোন্ কাজ করিতে হইবে না এবং কখন কি বদলাইতে হইবে সব আপনা হইতেই বুঝা যাইবে।

কিন্তু এখন আর একটি বিষয়ের বিচার করিব। সম্পূর্ণ ক্রিয়ালোপ-রূপী যে অন্তিম স্থিতি সেদিকে সাধকের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক নয় কি? সাধকের

কি জ্ঞানী পুরুষের ঐ স্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার যে অবস্থায় কোন কাজ না করিলেও অসংখ্য কর্ম হইতে থাকে?

না, এখানেও ফলত্যাগের কষ্টিপাথর ব্যবহার করা চাই। আমাদের জীবনের স্বরূপ এমনই সুন্দর যে যাহা আমাদের প্রয়োজন তাহার দিকে দৃষ্টি না রাখিলেও তাহা আমাদের লাভ হইয়া যায়। জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ফল মোক্ষ, ঐ মোক্ষ ঐ অকর্মাবস্থার প্রতিও যেন আমাদের লোভ না জন্মে। ঐ স্থিতি অজ্ঞাতেই নিজে নিজেই লাভ হইয়া যাইবে। সন্ন্যাস বস্তুটি ত এমন নয় যে দুইটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট হইল আর উহা অকস্মাৎ হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাস যান্ত্রিক বস্তু নয়। উহা কিভাবে তোমার জীবনে বিকশিত হইতে থাকিবে তাহা তুমি জানিতেও পারিবে না। অতএব মোক্ষের চিন্তাও ছাড়।

ভক্ত ভগবানকে সর্বদা এই কথাই বলে, "এই ভক্তিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ঐ অন্তিম ফল মোক্ষ, আমি চাই না।" মুক্তিও ত এক প্রকারের ভুক্তিই বটে। মোক্ষও এক প্রকারের ভোগ। এক প্রকারের ফলই বটে। এই মোক্ষরূপ ফলের উপরও ফলত্যাগের কাঁচি চালাও। কিন্তু তাহাতে মোক্ষ হাতছাড়া হওয়ার নয়। কাঁচি ভাঙ্গিবে এবং ফল অধিক দৃঢ় হইবে। যখন মোক্ষের বাসনা ছাড়িবে তখন অজ্ঞাতেই মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সাধনায় এমন তন্ময় হইয়া যাও যে মোক্ষের কথা যেন মনেই না থাকে আর মোক্ষ তখন তোমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। সাধক ত আপন সাধনাতেই তন্ময় থাকিবে।

মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি। "কর্ম না করিতে যেন তোমার আগ্রহ না হয়।" ভগবান একথা আগেই বলিয়াছেন যে, অকর্ম-দশার, মোক্ষের আসক্তি রাখিও না। এখন অন্তে আবার বলিতেছেন:

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

"আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।"

আমি মোক্ষদানে সমর্থ, তুমি মোক্ষের চিন্তা করিও না। তুমি কেবল সাধনার কথাই ভাব।

মোক্ষের কথা ভুলিয়া গেলে সাধনায় উৎকর্ষতা লাভ হইবে আর

মোক্ষই মোহিত হইয়া তোমার নিকটে চলিয়া আসিবে। মোক্ষ-নিরপেক্ষ বৃত্তিতে আপন সাধনায় রত থাকিলে মোক্ষলক্ষ্মী ঐ সাধকের গলায় জয় মাল্য দান করেন।

যেখানে সাধনার পরাকাষ্ঠা সেখানে সিদ্ধি হাত জোড় করিয়া দণ্ডায়-মান। যাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে, সে যদি গাছতলায় বসিয়া 'বাড়ী বাড়ী' বলিতে থাকে তবে বাড়ী দূরেই থাকিয়া যাইবে এবং তাহাকে পথিমধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে। বাড়ীর কথা ভাবিতে ভাবিতে যদি রাস্তায়ই বিশ্রাম করিতে লাগিয়া যাও তবে ঐ অন্তিম বিশ্রামস্থান হইতে দূরে থাকিবে। আমাদের চলার চেষ্টা ত নিরলস ভাবে করিতেই হইবে। ইহার ফলে বাড়ী একেবারে সামনে আসিয়া পড়িবে। মোক্ষের অলস কল্পনায় আমাদের প্রযত্নে, আমাদের সাধনায় শিথিলতা দেখা দিবে এবং উহার ফলে মোক্ষ দূরে চলিয়া যাইবে। মোক্ষ উপেক্ষা করিয়া নিরন্তর সাধনা করিয়া যাওয়াই মোক্ষ লাভের উপায়। অকর্ম-স্থিতি, বিশ্রামের লোভ করিও না। সাধনার প্রেমে তন্ময় থাক, মোক্ষ আসিবেই আসিবে। 'উত্তর-উত্তর' করিয়া চিৎকার করিলে প্রশ্নের উত্তর মিলে না। উহার সমাধানের যে পদ্ধতি সেই কার্যদ্বারাই ক্রমশঃ উত্তর পাওয়া যাইবে। ঐ পদ্ধতির যেখানে সমাপ্তি সেখানেই উত্তর তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সমাপ্তির পূর্বে সমাপ্তি কিরূপে হইবে? পদ্ধতি অনুসরণের পূর্বে উত্তর কি করিয়া পাইবে? সাধকের অবস্থায় সিদ্ধির অবস্থা কিরূপে লাভ হইবে? জলে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অপর পারে পৌঁছিবার মজায় মশগুল হইলে চলিবে কেন? সে সময় ত এক-এক হাত করিয়া জল কাটিয়া আগে যাওয়ার চেষ্টায় সমস্ত লক্ষ্য, সমস্ত শক্তি লাগাইতে হইবে। প্রথমে সাধনা পূর্ণ কর, সমুদ্র লঙ্ঘন কর, মোক্ষ আপনা হইতে আসিয়া হাজির হইবে।

॥ ১০৭ ॥ সিদ্ধপুরুষের ত্রিবিধ ভূমিকা

জ্ঞানী পুরুষের অন্তিম অবস্থায় সকল ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যায়, শূন্যরূপ হইয়া যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ঐ অন্তিম অবস্থায় ক্রিয়া হইবেই না। তাহা দ্বারা ক্রিয়া হইবে, আবার হইবেও না। এই অন্তিম স্থিতি অতীব রমণীয় ও উদাত্ত। এই অবস্থায় যাহা কিছু হইবে তাহার সেজন্য কোন

ভাবনা থাকে না। যাহা কিছু হইবে, সবই শুভ ও সুন্দর হইবে। সাধনার পরাকাষ্ঠায় সে তখন উপনীত। এই অবস্থায় সব কিছু করিয়াও সে কিছু করে না। সংহার করিয়াও সংহার করে না। কল্যাণ করিয়াও কল্যাণ করে না।

এই অন্তিম মোক্ষ অবস্থাই সাধকের সাধনার পরাকাষ্ঠা। সাধনার পরাকাষ্ঠার অর্থ সাধনার সহজ অবস্থা। তখন এই কথা কল্পনায়ও আসে না যে "আমি কিছু করিতেছি।" অথবা এই দশাকে আমি সাধকের সাধনার "অনৈতিকতা" বলিব। সিদ্ধাবস্থা নৈতিক অবস্থা নয়। শিশু সত্য কথা বলে। কিন্তু উহা নৈতিক কর্ম নহে। কারণ অসত্য যে কি তাহা সে জানেই না। অসত্যের জ্ঞান হওয়ার পরে যখন সত্য বলা হয় তখন তাহা নৈতিক কর্ম। সিদ্ধাবস্থায় অসত্য বলিয়া কিছু থাকে না। তখন একমাত্র সত্যই থাকে, সেইজন্য সেখানে নীতি নাই। নিষিদ্ধ কোন কিছুর প্রবেশ সেখানে নাই। যাহা শোনার মত নয় তাহা কানে প্রবেশই করে না। যাহা দেখার যোগ্য নয় তাহা চোখ দেখেই না। যাহা হওয়া উচিত হাতদ্বারা তাহাই কেবল নিষ্পন্ন হয়, চেষ্টা করিতে হয় না। যাহা করার অযোগ্য তাহা বর্জন করিতে হয় না। আপনা হইতেই তাহা দূর হইয়া যায়। এইরূপ এই নীতিশূন্য অবস্থা। সাধনার এই যে পরাকাষ্ঠা ইহাই সাধনার সহজ অবস্থা। অনৈতিকতা বা অতি-নৈতিকতা যাহাই বলুন, অতিনৈতিকতার মধ্যেই নীতির চরমোৎকর্ষ রহিয়াছে। 'অতিনৈতিকতা' শব্দ আমার যোগ্য মনে হইয়াছে। এই অবস্থাকে 'সাত্ত্বিক সাধনার নিঃসত্ত্বতা'ও বলা যাইতে পারে।

এই দশার বর্ণনা কিরূপে করা যায়? গ্রহণের পূর্বে যেমন বেধ লাগে তেমনই দেহান্তের পরে যে মোক্ষদশা লাভ হইবে তাহার আভাস দেহপাতের পূর্বেই দেখা দেয়। দেহাবস্থাতেই ভাবী মোক্ষ উপলব্ধি হইতে থাকে। এই অবস্থার বর্ণনা করিতে বাণী অক্ষম। যত ইচ্ছা হিংসা করিলেও সে কিছু করে না। তাহার ক্রিয়া এখন কোন্ মাপকাঠিতে মাপা যাইবে? সে যাহা কিছু করিবে তাহা সবই হইবে সাত্ত্বিক কর্ম। সকল ক্রিয়া ক্ষয় হইয়া গেলেও সে সারা বিশ্বের লোক-সংগ্রহ করিবে। এই অবস্থার বর্ণনা করার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এই অন্তিম অবস্থার তিন দশা। এক ত বামদেবের দশা। "এ বিশ্বে

যা কিছু আছে, তা আমি"—তাঁহার এই প্রসিদ্ধ উক্তির কথা ধরুন। জ্ঞানী পুরুষ নিরহঙ্কার হইয়া যায়। তাঁহার দেহাভিমান থাকে না, সকল ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া যায়। তখন সে এক ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থা এক দেহে আঁটে না। ভাবাবস্থা ক্রিয়াবস্থা নহে। ভাবাবস্থার অর্থ ভাবনার উৎকট অবস্থা। অল্প মাত্রায় এই ভাবাবস্থার উপলব্ধি আমাদের সকলেরই হইতে পারে। সন্তানের দোষে মাতা দোষী হয়, আর গুণে গুণী হইয়া থাকে। সন্তানের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইয়া থাকে। মায়ের এই ভাবাবস্থা সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সন্তানের দোষ সে নিজের দোষ বলিয়া মানিয়া লয়। জ্ঞানী পুরুষও ভাবনার তীব্রতা হেতু সারা জগতের দোষ নিজের উপর লইয়া থাকে।

সে ত্রিভুবনের পাপে পাপী, আর পুণ্যে পুণ্যবান হয়; তাহা সত্ত্বেও ত্রিভুবনের পাপ-পুণ্যের লেশমাত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। রুদ্র-সূক্তে ঋষি বলিয়াছেন: **যবাশ্চ মে তিলাশ্চ মে গোধুমাশ্চ মে।** আমাকে যব দাও, তিল দাও, গম দাও—এরূপ অনুক্ষণ চাহিতেছেন। তাঁহার পেট তবে কত বড়? কিন্তু যাচ্ঞাকারী সাড়ে তিন হাত দেহধারী নহেন। তাঁহার আত্মা বিশ্বাকার হইয়া বলিতেছে। ইহাকে আমি "বৈদিক বিশ্বাত্মভাব" বলি। বেদে এই ভাবনার পরমোৎকর্ষ দেখা যায়।

গুজরাটের সাধু নরসী মেহতা কীর্তন গাহিতে গাহিতে বলিতেছেন:

বাপজী পাপ মে কবণ·কীধঁা হশে,নাম লেতা ভারুঁ নিদ্রা আবে।

"হে ভগবান, আমি এমন কি পাপ করেছি যে কীর্তনের সময় আমার নিদ্রা আসে?" ঘুম কি নরসী মেহতার আসিত? ঘুম ত আসিত শ্রোতাদের। কিন্তু নরসী মেহতা শ্রোতাদের সহিত একরূপ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা তাঁহার ভাবাবস্থা। জ্ঞানী পুরুষদের এইরূপই ভাবাবস্থা হয়। এই ভাবাবস্থায় সকল পাপ-পুণ্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে এরূপ দেখা যাইবে। সে নিজেও এইরূপই বলিবে। ঋষি বলেন নাই কি, "করার অযোগ্য কত কর্মই না আমি করেছি, করছি আর করব?" এই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হইলে আত্মা পাখীর মত উড়িতে থাকে। পার্থিবতার ঊর্ধ্বে তাহা উঠিয়া যায়।

এই ভাবাবস্থার মত জ্ঞানী পুরুষের এক ক্রিয়াবস্থাও আছে। জ্ঞানী

পুরুষ স্বভাবতঃ কি করিবেন? তিনি যাহাই করিবেন সাত্ত্বিক হইবে। যদিও দেহের সীমায় আজও তিনি আবদ্ধ তথাপি তাঁহার সমস্ত শরীর, সকল ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক হইয়া গিয়াছে। ফলে তাঁহার সকল ক্রিয়া সাত্ত্বিকই হইবে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিবেন সাত্ত্বিকতার পরাকাষ্ঠা তাঁহার ব্যবহারে দেখা যাইবে। বিশ্বাত্মভাবের দিক হইতে দেখেন ত মনে হইবে ত্রিভুবনের সকল পাপ-পুণ্য যেন তিনি করিতেছেন এবং তৎসত্ত্বেও তিনি সব কিছু হইতে অলিপ্ত। কারণ আবরণ-রূপ এই দেহ তিনি পৃথক করিয়া ফেলিয়া দেন। ক্ষুদ্র দেহ খুলিয়া ফেলিয়া দিলেই তিনি বিশ্বরূপ হইবেন।

ভাবাবস্থা ও ক্রিয়াবস্থা ছাড়া জ্ঞানী পুরুষদের তৃতীয় আর এক অবস্থা আছে। তাহা জ্ঞানাবস্থা। এই অবস্থায় তিনি পাপও সহ্য করেন না, পুণ্যও সহ্য করেন না। সব কিছু ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। এই অখিল বিশ্বকে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া ফেলিতে তিনি প্রস্তুত হইয়া যান। কোনও কর্মের দায়িত্ব লইতে তিনি প্রস্তুত নহেন। উহার স্পর্শ পর্যন্ত তাঁহার কাছে অসহ্য। জ্ঞানী পুরুষের মোক্ষদশায়, সাধনার পরাকাষ্ঠা-দশায়—এই তিন প্রকারের অবস্থা হওয়া সম্ভবপর।

এই অক্রিয়াবস্থা এই অন্তিম দশা, লাভ করার উপায় কি? উপায় হইল—যে কর্মই আমরা করি না কেন, তাহার কর্তৃত্ব নিজে মাথায় না লওয়ার অভ্যাস করা। মনে করিতে হইবে "আমি নিমিত্তমাত্র, কর্মের কর্তৃত্ব আমার নয়।" প্রথমে এই অকর্তৃত্ববাদের ভূমিকা নম্রভাবে গ্রহণ কর। কিন্তু ইহা দ্বারাই সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লোপ পাইবে তাহা নয়। আস্তে আস্তে এই ভাবনার বিকাশ হইতে থাকবে। প্রথমে ত আমি অতি তুচ্ছ, তাঁহার হাতের পুতুল, তিনি যেমন নাচান তেমন নাচি এই ভাব জন্মিতে দাও। তারপরে একথা মনে করার প্রযত্ন কর যে যত কিছু কর্ম তাহা এই দেহের। তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। এই সকল ক্রিয়া এই শবের। আমি শব নই, আমি শিব। এইরূপ ভাবনা করিতে থাক। দেহরূপ আবরণের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত হইও না। তাহা হইলে দেহের সহিত যেন সম্পর্কই নাই—জ্ঞানী পুরুষের এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ঐ অবস্থা হইলে পর তখন উপরে বর্ণিত তিন অবস্থা হইবে। প্রথমে উহার ক্রিয়াবস্থা। সে অবস্থায় তাঁহাদ্বারা অত্যন্ত নির্মল ও আদর্শ কর্ম নিষ্পন্ন

হইবে। দ্বিতীয়, ভাবাবস্থা। সে অবস্থায় ত্রিভুবনের সকল পাপ-পুণ্য 'আমি করি' এরূপ অনুভব হইবে, অথচ উহার লেশমাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। তৃতীয়, তাঁহার জ্ঞানাবস্থা। যে অবস্থায় লেশমাত্র কর্মেরও তিনি ধার ধারেন না। সকল কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া দেন। এই তিন অবস্থা দ্বারা জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করা যাইতে পারে।

॥ ১০৮ ॥ তুহী...তুহী...তুহী...তুহী

এত সব বলার পরে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—অর্জুন, "আমি তোমাকে এই যে সব বললাম, তা তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছ ত? এখন সম্পূর্ণ বিচার করে যা তোমার ভাল মনে হয় তা কর।" এইভাবে ভগবান অর্জুনকে অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে স্বাধীনতা দিলেন। ভগবদ্গীতার ইহাই বিশেষত্ব কিন্তু পুনরায় ভগবানের দয়া হইল। তিনি অর্জুনকে ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য দিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া লইলেন। বলিলেন, "অর্জুন, তুমি তোমার ইচ্ছা, তোমার সাধনা—সব কিছু ফেলে দাও, আমার শরণ নাও।" এইভাবে নিজের শরণ লইতে বলিয়া যে ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য তিনি দিয়াছিলেন তাহা স্বয়ং কাড়িয়া লইলেন। ইহার অর্থ এই যে, "তুমি নিজের মনে কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা আসতে দিও না। আমার ইচ্ছা নয়, তাঁর ইচ্ছা চলুক এইভাব অবলম্বন কর।" আমার স্বাধীনভাবে এই অনুভব আসুক যে আমি স্বতন্ত্রতা চাই না। এরূপ আমায় ভাবিতে দাও। আমি নই সব কিছু তুমি, এরূপ হোক। ছাগশিশু জীবিত অবস্থায়—"মেঁ মেঁ মেঁ..." করে, অর্থাৎ "আমি আমি আমি" বলে। কিন্তু দাদু বলেন মরার পর উহার তাঁত যখন পিঞ্জনে ব্যবহার করা হয় তখন সে "তুহী তুহী তুহী" বলে—"তু হী তু হী তু হী।" এখন ত সব "তু হী...তু হী...তু হী!"

রবিবার ১৯-৬-'১৯৩২

সমাপ্ত